# নির্বাচিত সংস্কৃত 'গল্পসাহিত্যে' হাস্যরস : একটি সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের

পিএইচ.ডি উপাধির জন্য উপস্থাপিত গবেষণাসন্দর্ভ

**জুবিন ইয়াসমিন**

নিবন্ধ সংখ্যা-A00SA0400916

বর্ষ- ২০১৬-২০১৭

**তত্ত্বাবধায়িকা - ডঃ শিউলি বসু**

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২২

Certified that the Thesis entitled

**নির্বাচিত সংস্কৃত ‘গল্পসাহিত্যে’ হাস্যরস : একটি সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ**

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Shiuli Basu, Department of Sanskrit And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Candidate:

Supervisor: Dated:

Dated:

# কৃতজ্ঞতা

এই গবেষণা কর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, আশুতোষ কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতা লাভ করেছি। এই সকল গ্রন্থাগারের একনিষ্ঠ ও সহৃদয় কর্মীগণের প্রতি আমার বিনম্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মুদ্রিত গ্রন্থ ব্যতীত আন্তর্জালিক উপাদান, পুস্তক এবং সামাজিক তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এই গবেষণা কর্মের বাস্তব রূপায়ণে তথা প্রযুক্তিগত সহায়তায় আমি ড: ফরিদ সেখের সহযোগিতা লাভ করেছি। তাঁর প্রতি রইলো অকুণ্ঠ প্রীতি। তাঁর ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হোক। আমার গবেষণার সমাপ্তিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা ড: শিউলি বসুর কাছে আমি চিরঋণী। তাঁর অনুপ্রেরণা ব্যতীত এই গবেষণা সম্ভব হতো না। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ড: কাকলি ঘোষ এবং অধ্যাপক তপনশঙ্কর মহাশয়কে। যাঁরা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড: ঋতা চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপিকা বিজয়া গোস্বামী, প্রাক্তন অধ্যাপক ড: প্রদ্যুৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁদের সান্নিধ্য আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমি তাঁদের সকলের নীরোগ সুস্থ জীবন প্রার্থনা করি।

আমার মা, বাবা, ভাই, দিদি, সহধর্মীর অকুণ্ঠ সমর্থন, সহযোগিতা ও উৎসাহ ছাড়া এই গবেষণা সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিল। আমি শ্রদ্ধা জানাই আব্দুল হাবিব মহাশয়, আমার ছোট মামাকে। ইনি স্নাতক জীবনে ভবিষ্যতে চলার পথে আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করতেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ইজহান ওয়াফী এবং নাজিমা বেগমের প্রতি। এদের সহযোগিতা ছাড়া গবেষণা কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না।

দীর্ঘ কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হলো। ইতিহাস গবেষণা, সাংস্কৃতিক চর্চা, প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের মেলবন্ধন তথা সারস্বত সাধনার পথে এই গবেষণা যদি সামান্যতমও কোন চিহ্ন রাখে, তা-ই হবে এর প্রাপ্তি। গবেষণার যাবতীয় ভুল ত্রুটির দায় আমার। যা কিছু সাফল্য সবই শুভাকাঙ্ক্ষী-গণের একান্ত প্রেরণা, উৎসাহের ফল।

## সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

**প্রথম অধ্যায়** **১-৩০**

১:১ ভূমিকা

১:২ বৈদিক সাহিত্যে নির্বাচিত সংবাদ, আখ্যান, আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, কথা, কাহিনীর নিদর্শন

১:২:১ সংহিতায় নির্বাচিত সংবাদ ও আখ্যানের পরিচয়

১:২:২ ব্রাহ্মণে নির্বাচিত উপাখ্যান, কথা ও কাহিনীর পরিচয়

১:২:৩ উপনিষদে নির্বাচিত উপাখ্যান, আখ্যায়িকা, সংবাদ ও কাহিনীর পরিচয়

১:৩ আগম গ্রন্থে নির্বাচিত আখ্যান, কাহিনীর নিদর্শন

১:৪ *বাল্মীকিরামায়ণ* ও *বৈয়াসিকমহাভারতে* নির্বাচিত আখ্যান, উপাখ্যান ও কাহিনীর নিদর্শন

১:৪:১ *বাল্মীকিরামায়ণে* নির্বাচিত আখ্যান, উপাখ্যান ও কাহিনীর পরিচয়

১:৪:২ *বৈয়াসিকমহাভারতে* নির্বাচিত আখ্যান, উপাখ্যান ও কাহিনীর পরিচয়

১:৫ মহাপুরাণে নির্বাচিত আখ্যান, উপাখ্যান কথা ও কাহিনীর নিদর্শন

১:৬ জাতক সাহিত্যে আখ্যান, উপাখ্যানের নিদর্শন

১:৭ অবদান সাহিত্যে আখ্যান, উপাখ্যানের নিদর্শন

**দ্বিতীয় অধ্যায় - ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রানুসারে হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য এবং পাশ্চাত্ত্যে হাস্যরসের ধারা** **৩১-৯০**

১:১ হাস্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১:২ ভাব ও রস

১:৩ তত্ত্ব গ্রন্থে হাস্যরস

১:৪ তত্ত্ব গ্রন্থে হাস্যরসের ভেদ

১:৫ হাস্যরস সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য কারণ

১:৫:১ অসঙ্গতি

১:৫:২ কৌতূহল

১:৫:৩ অনৌচিত্য

১:৬ তত্ত্ব গ্রন্থে হাস্যরসের নিদর্শন

১:৭ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে হাস্যরসের নির্বাচিত কয়েকটি নাম সমীক্ষা

১:৭:১ কমেডি (Comedy)

১:৭:২ হিউমার (Humour)

১:৭:৩ উইট (Wit)

১:৭:৪ ফান (Fun)

১:৭:৫ পুন (Pun)

১:৭:৬ স্যাটায়ার (Satire)

১:৭:৭ ল্যামপূণ বা প্যারোডি বা বারলেসকিউ (Lampoon or parody or Burlesque)

১:৮ প্রাচ্যের হাস্যরসের সাথে প্রতীচ্যের হাস্যরসের মেলবন্ধন

**তৃতীয় অধ্যায়- সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য** **৯১-১১৩**

১.১ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস অবলম্বনে 'গল্প' শব্দটির ব্যাখ্যা

১:২ গল্পসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

১:৩ গল্পসাহিত্যে নীতিশিক্ষা

১:৪ গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের পরিচয়

১:৪:১ বৈদিক সাহিত্যে হাস্যরসের উৎস

১:৪:২ *বাল্মীকিরামায়ণে* হাস্যরসের নিদর্শন

১:৪:৩ *বৈয়াসিকমহাভারতে* হাস্যরসের নিদর্শন

১:৪:৪ বৌদ্ধদের জাতকের গল্পে হাস্যরসের নিদর্শন

১:৪:৫ পালি গ্রন্থে হাস্যরসের নিদর্শন

**চতুর্থ অধ্যায় - গল্পসাহিত্য ও সমকালীন সমাজ** **১১৪-১৫১**

১:১ সংস্কৃত সাহিত্যে গল্পসাহিত্য

১:১:১ *পঞ্চতন্ত্র*

১:১:২ *বেতালপঞ্চবিংশতি*

১:১:৩ *শুকসপ্ততি*

১:১:৪ *বিক্রমাঙ্কচরিত বা সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা*

১:১:৫ *হিতোপদেশ*

১:১:৬ *পুরুষপরীক্ষা*

১:১:৭ *ভোজপ্রবন্ধ*

১:২ তৎকালীন সমাজে সাহিত্যের প্রভাব

১:২:১ *পঞ্চতন্ত্রে* তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

১:২:২ *বেতালপঞ্চবিংশতিতে*, *শুকসপ্ততিতে*, *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকাতে*, *হিতোপদেশে* তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

১:২:৩ *পুরুষপরীক্ষাতে* তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

১:২:৪ *ভোজপ্রবন্ধে* তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

১:২:৫ অনান্য সাহিত্যে হাস্যরসের প্রতিফলন

**পঞ্চম অধ্যায়- নির্বাচিত গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ** **১৫২-১৯৪**

১:১ *পঞ্চতন্ত্রে* হাস্যরস

১:২ *বেতালপঞ্চবিংশতিতে* হাস্যরস

১:৩ *শুকসপ্ততিতে* হাস্যরস

১:৪ *বিক্রমাঙ্কচরিত বা সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকাতে* হাস্যরস

১:৫ *হিতোপদেশে* হাস্যরস

১:৬ *পুরুষপরীক্ষাতে* হাস্যরস

১:৭ *ভোজপ্রবন্ধে* হাস্যরস

**উপসংহার** **১৯৫-১৯৭**

# প্রথম অধ্যায়

## ১.১ ভূমিকা

গল্পের প্রতি মানুষের কৌতূহল চিরন্তন। গল্প বলা আর গল্প শোনার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই শুরু হয় গল্প বলার রীতি। প্রকৃতির অনুকূল আর প্রতিকূল শক্তিকে নিয়েই গল্পের সূচনা। হিংস্র শক্তির উপরে জয়, কল্যাণ শক্তির কাছে বরাভয়, সাহস আর বুদ্ধির জোরে হিংস্র প্রতিবেশীদের উপরে প্রভুত্ব বিস্তারের কাহিনী প্রাচীন গল্পের উপকরণ মাত্র। মানুষের গল্প বলার আদিম স্পৃহাই গল্পসাহিত্য উদ্ভবের মূল কারণ। গল্পসাহিত্য উদ্ভবের পশ্চাতে সত্য ঘটনা বা কাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের চিন্তা শক্তির সঙ্গে কল্পনা শক্তির ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়, সেই সঙ্গে গল্পসাহিত্যের পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রাচীনকালে জনপদের বয়সী বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা গল্প বা কাহিনী বলতেন আর জনপদের অন্য সদস্যরা তা শ্রবণ করতেন। আধুনিককালে সেই ধারা অব্যাহত। প্রাত্যহিক জীবনে ঠাকুরমা-ঠাকুরদা কিংবা দাদি-নানিরা বিভিন্ন গল্প বলে শিশুদের মন ভোলাতেন কখনো বা ঘুম পাড়াতেন। বিচিত্র সেইসব গল্প, কোন গল্প রাজপুত্র বা রাজকন্যার, কোন গল্প কিন্নর ও গন্ধর্বদের, কোন গল্প রাক্ষস-খোক্ষসের কিংবা দৈত্য-দানবের, কোন গল্প পক্ষীরাজ ঘোড়ার কিংবা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর। সেই সব গল্পের জগতে শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য পশুপক্ষীর চরিত্র সকলের প্রবেশ লক্ষণীয়। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে গল্পের রীতি-নীতির পরিবর্তনের হাত ধরে বিষয়বস্তুর মধ্যে নানা বৈচিত্র্য যুক্ত হয়েছে। রূপকথায় এসমস্ত গল্প মানুষের জয় এবং জয় করার ইচ্ছার সঙ্কেত বহন করে। সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে মানুষের আশঙ্কা আর স্বপ্নের সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি ঘটেছে

এসব রূপকথার গল্পের মাধ্যমে। প্রেম, বীরত্ব আর নিয়তির কাহিনী নানা রূপে রসে মণ্ডিত হয়ে রূপকথার গল্পগুলি আত্মপ্রকাশ করে। রূপকথার গল্পে জীবন সত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। লেখক বা কবি বাস্তব জীবনের বিষয়বস্তু বা কাহিনীর বিভিন্ন অপূর্ণতা, অতৃপ্তি, কল্পলোকের সাথে সমন্বয় সাধন করে গল্পসাহিত্যের প্রতিস্থাপন করেন। সুতরাং গল্পসাহিত্য সৃষ্টি বা উদ্ভবের মূলে তিনটি কারণ বিদ্যমান- অবসর যাপন, চিত্তবিনোদন, শিক্ষাদান।

**সংস্কৃত সাহিত্যে 'গল্প' শব্দটির পারিভাষিক শব্দের উৎস**

'গল্প' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ আখ্যান, উপাখ্যান। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অর্থবাদ অংশে আখ্যান, উপাখ্যান জাতীয় রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। *শতপথ ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় আরণ্যক* ও *বৃহদারণ্যকে* ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক যাগযজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ডে বেদমন্ত্রের সঙ্গে ইতিহাস-পুরাণের আবৃত্তি ও পাঠ ব্যবহৃত হত। যেমন *ঋগ্বেদের* দানস্তুতি সূক্তে প্রাচীন রাজবংশের যৎকিঞ্চিৎ তথ্য এবং অক্ষসূক্তে (১০/৩৪) তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের উপাদান লিপিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়া বৈদিক সাহিত্যে ‘গল্প’ অর্থে ইতিহাস, পুরাণ, বাকোবাক্য, গাথা, শ্লোক, নারাশংসী, আখ্যায়িকা, সংবাদ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত Max Müller বলেছেন-

The several parts of the Brāhmaṇas and *Ā*raṇyakas, where an account is given of the literature known to the ancient Hindus, we meet with the names of Gāthā, Nārāśaṃsī, Itihāsa and Ākhyāna (songs, legends, epic poems and stories) as parts of the Vedic literature.[১]

প্রতীচ্যের পণ্ডিত Max Müller *মহাভারত*কে ইতিহাস, পুরাণ এবং আখ্যান নামেও অভিহিত করেছেন। *বাল্মীকিরামায়ণ, বৈয়াসিকমহাভারতের* গল্পকে আখ্যান, উপাখ্যান, কাহিনী, গাথা নামে অভিহিত করা হয়েছে। পুরাণ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ 'প্রাচীন কথা' বা 'পুরাকালীন'। যার দ্বারা সুদূর অতীতকে বোঝানো হয়ে থাকে। সেইসব অতীতের কাহিনী বা গল্পকে পুরাণসাহিত্যে আখ্যান, উপাখ্যান ও গাথা নামে অভিহিত করা হয়েছে। *বায়ুপুরাণে* আখ্যান বলতে দৃষ্ট বিষয়ের কথনকে, উপাখ্যান বলতে শ্রুতি বিষয়ের কথনকে এবং গাথা বলতে পিতৃপুরুষ মনের কথা বা পুরাতন ঘটনা, কোন কিছুকে স্মরণে রাখবার জন্য লোকমুখে প্রচারিত শ্লোক নিবন্ধকে বোঝানো হয়ে থাকে। লোকোত্তর বীরপুরুষগণের কার্যকলাপ ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হলে তাকে ইতিহাস বলা হয়। *বায়ুপুরাণে* বলা হয়েছে যে আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা দ্বারা পুরাণার্থবিশারদ মহর্ষিব্যাস পুরাণ রচনা করেছিলেন-

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসত্তমা।

পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।।[২]

*মৎসপুরাণে* এ বিষয়ে বলা হয়েছে-

পুরাণেষ্বিতিহাসোঽয়ং পঠ্যতে বেদবাদিভিঃ।[৩]

অর্থাৎ বেদবাদিগণ পুরাণসমূহে এই ইতিহাস পাঠ করে থাকেন। আবার নিরুক্তকার যাস্কাচার্য ইতিহাসকে বেদ এবং পুরাণের সমতুল্য মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি আখ্যান যুক্ত ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রাচীন আচার্যদের মত এবং ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যান গুলিকে ইতিহাস নামে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

তত্র ব্রহ্মেতিহাসমিশ্রম্ ঋঙ্মিশ্রমং গাথামিশ্রমং ভবতি। তয়োর্বিভাগস্তত্র

ইতিহাসমাচক্ষতে।[৪]

*ছান্দোগ্যোপনিষদে* দেবর্ষি নারদ তাঁর অধীত বিদ্যাসমূহের মধ্যে ইতিহাস-পুরাণকে *পঞ্চমবেদ* নামে অভিহিত করেছেন-

ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।[৫]

তাই ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে প্রাচীন ঘটনা বা আখ্যান, কাহিনী, লোককথা কিংবদন্তি পরম্পরাক্রমে ইতিহাস নামে খ্যাত। তাই *অমরকোষে* বলা হয়েছে-

ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তম্।[৬]

বৌদ্ধ যুগে বিভিন্ন গল্প বা কাহিনী জাতক নামে এবং জৈন যুগে বিভিন্ন গল্প বা কাহিনী কথা বা কথানক নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'গল্প' শব্দটি পারিভাষিক ভাবে আখ্যান, উপাখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, জাতক, কথা, কথানক যে নামই দেয়া হোক না কেন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে 'গল্প' শব্দটির প্রয়োগ প্রচলিত ছিল না। বৈদিক যুগ থেকেই আখ্যান, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, কথা, কথানক, সংবাদ ইত্যাদি শব্দের সূত্রপাত পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত M. Winternitz বলেছেন-

We have already seen the first traces of epic poetry in Indian in Vedic literature- in the dialogue hymns of the *Ṛgveda* as well as in the *Ākhyāna*, *Itihāsa* and *Purāṇa* of the B*rāhmaṇas.*[৭]

বৈদিকযুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ভারতবর্ষের জীবনধারার বহুমুখী প্রবাহকে কেন্দ্র করে যেসব আখ্যান, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, কথা, কথানক রচিত হয়েছিল

সেসবের সাথে পরবর্তী যুগে বিভিন্ন জনপ্রিয় উপাদানের সমন্বয়ে গল্প বা কথাসাহিত্যকে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে।

## ১.২ বৈদিক সাহিত্যে নির্বাচিত সংবাদ, আখ্যান, আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, কথা, কাহিনীর নিদর্শন

সুদূর অতীতে আর্যদের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারত ভূমিতে এক পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের উদ্ভব হয়। এই সাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। *ঋক্ সংহিতার* কাল থেকে বেদাঙ্গের কাল পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে যে সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল তা বৈদিক সাহিত্য নামে খ্যাত। এই সাহিত্যকে প্রাচীন সাহিত্য বলা হয়। বৈদিক সাহিত্যে *ঋক-যজু-সাম-অথর্ব* এই চারটি বেদ। বেদের মূলত দুটি অংশ একটি মন্ত্র এবং দ্বিতীয়টি ব্রাহ্মণ। বেদের মন্ত্রভাগ মূলত পদ্যে রচিত, তবে কিছু কিছু অংশ গদ্যে নিবন্ধ এবং ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত। বৈদিক মন্ত্রের সংগ্রাহক গ্রন্থ সংহিতা নামে খ্যাত। ব্রাহ্মণের আবার দুটি অংশ একটি বিধি দ্বিতীয়টি অর্থবাদ। মন্ত্র ভাগ হলো বেদের জ্ঞানকাণ্ড এবং ব্রাহ্মণভাগ হলো কর্মকাণ্ড। প্রতিটি সংহিতা- ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদ এই চারটি ভাগে বিভক্ত। সংহিতায় বিভিন্ন দেবতাদের স্তব-স্তুতি ও মহিমা, ধর্ম, কর্মফল, দেবতার আহ্বান, অভীষ্ঠ বস্তুর প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞের বিবরণ, মন্ত্রের বিনিয়োগ, যজ্ঞের ফল, ইতিহাস, পুরাকীর্তি, দেবতা ইত্যাদির বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান। বেদের ব্রাহ্মণভাগ তিনভাগে বিভক্ত- ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ। ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়াংশ আরণ্যক নামে পরিচিত। আরণ্যকে যজ্ঞেতর তাৎপর্য ও রহস্যময়তা, দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা এবং কর্ম অনুষ্ঠানের বিধান বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। সমস্ত আরণ্যক গদ্যে লিপিবদ্ধ। বেদের শেষ অর্থাৎ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে শেষ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত।

উপনিষদের অপর নাম *বেদান্ত* (বেদ-অন্ত)। উপনিষদ সমূহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ব্রহ্ম ও আত্মা। উপনিষদে দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। বৈদিক যুগে বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন বীরপুরুষগণের ও দেবগণের কাহিনী বর্ণনা করা হতো। আর সেইসব কাহিনী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে ভারতবর্ষের সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতিকে রূপদান করেছে। বৈদিক পরবর্তী যুগে যে কাব্য গুলির রচিত হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৈদিক সাহিত্যের কাছে ঋণী। বৈদিক যুগে ভারতের জাতিভেদ, বিভিন্ন জাতির জীবিকা ও বৃত্তি, বিবাহ-সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা, কৃষি বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, অভিষেকবিধি, তৎকালীন পঞ্জিকা, সৎকারবিধি প্রভৃতি আর্য সমাজ ব্যবস্থার বহুতথ্য ও উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। পরবর্তী যুগে কাব্যে যেসব অলৌকিক কাহিনী বা রহস্যের অবতারণা করা হয়েছে তার সূচনা হলো *ঋগ্বেদ*। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত M. Winternitz বলেছেন-

What renders these hymns so valuable for us is that we see before us in them a mythology in the making.[৮]

অর্থাৎ পরবর্তী যুগে সূর্য, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম, অগ্নি, অদিতি, পৃথিবী প্রভৃতি দেবতাদেরকে নিয়ে যেসকল মনোরম উপাখ্যান সৃষ্টি হয়েছিল, তার আবির্ভাব ঘটেছিল বৈদিক যুগে। বৈদিক যুগের আবির্ভাব কাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতকে। সংস্কৃত সাহিত্যের পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A. A. Macdonell এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

The history of ancient Indian literature naturally falls into main periods. The first is the Vedic, which beginning perhaps as early as 1500 B.C, extends in its latest phase to about 200B.C. [৯]

### ১:২:১ সংহিতায় নির্বাচিত সংবাদ ও আখ্যানের পরিচয়

বৈদিক মন্ত্রের সংগ্রাহক গ্রন্থ সংহিতা নামে পরিচিত। সংহিতার সংখ্যা হলো চারটি- *ঋক্, সাম, যজুঃ* (*কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা, শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা*) এবং *অথর্ব* ইত্যাদি। *ঋগ্বেদ সংহিতায়* যেসব সংবাদ সূক্তগুলি বর্তমান, তারমধ্যে আখ্যান-উপাখ্যানের বীজ নিহিত আছে সেগুলি হলো নিম্নরূপ-

- বিশ্বামিত্র-নদী সংবাদ (*ঋগ্বেদ* ৩/৩৩)- মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং নদী বিপাশা ও শতুদ্রীর মধ্যে কথোপকথন এই সংবাদের বিষয়বস্তু।

- যম-যমী সংবাদ (*ঋগ্বেদ* ১০/১০)- যম ও তার ভগিনী যমীর মধ্যে কথোপকথনই প্রধান উপজীব্য বিষয়।

- অক্ষসূক্ত (*ঋগ্বেদ* ১০/৩৪)- জুয়াখেলায় সর্বস্বান্ত জুয়ারীর অনুতপ্ত হৃদয়ের গ্লানিকে কেন্দ্র করে অক্ষসূক্ত রচিত হয়।

- অগ্নি-সংবাদ (*ঋগ্বেদ* ১০/৫১, ১০/৫২)- এই সূক্তে বিষয়বস্তু অগ্নি এবং দেবতাগণের কথোপকথন।

- ইন্দ্র-বৃষাকপি সংবাদ (*ঋগ্বেদ* ১০/৮৬)- দেবতার উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট হবি বানরের দ্বারা লেহন করার বিষয়কে কেন্দ্র করে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা হলো এই সংবাদে মূল বিষয়বস্তু।

- পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ (*ঋগ্বেদ* ১০/৯৫)- পৃথিবীর অধিপতি পুরূরবার সঙ্গে স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী চার বছর অতিক্রম করার পর যখন স্বামীকে পরিত্যাগ করতে চলেছেন তখন পুরূরবা ও উর্বশীর মধ্যে যে কথোপকথন এই সংবাদের মূল বিষয়বস্তু।

- সরমা-পণি সংবাদ (*ঋগ্বেদ* ১০/১০৮)- এই সংবাদে এগারোটি মন্ত্র বিদ্যমান। দেবলোকের ইন্দ্রের গাভীগুলি অপহরণ করে পণিনামক দস্যুরা নিয়ে গেলে দেবরাজ ইন্দ্র দূতীরূপে সরমাকে প্রেরণ করেন। এই প্রসঙ্গে সরমা এবং পণিগণের উক্তিপ্রত্যুক্তি বর্ণিত হয়েছে।

- অগস্ত্য-লোপামুদ্রা সংবাদ (*ঋগ্বেদ* ১০/১৭৯)

- সুপর্ণাখ্যান (*ঋগ্বেদের* খিলসূক্তে)- বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ণকে প্রদত্ত *যজুর্বেদ* শুক্ল ও কৃষ্ণ দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার আখ্যান ইত্যাদি।

## ১:২:২ ব্রাহ্মণে নির্বাচিত উপাখ্যান, কথা ও কাহিনীর পরিচয়

ব্রাহ্মণ সাহিত্য মূলত গদ্যে রচিত তবে মাঝে মাঝে পদ্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক ক্রিয়াকর্ম, যাগযজ্ঞাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে সংশিষ্ট একাধিক ব্রাহ্মণ বিদ্যমান। *ঋগ্বেদের ঐতরেয়* এবং *কৌষীতকি ব্রাহ্মণ*। *সামবেদ সংহিতার* সঙ্গে যুক্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক। উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণগুলি হলো- *প্রৌঢ়* বা *পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ* বা *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, সামবিধান, আর্ষেয়, দৈবত, মন্ত্রব্রাহ্মণ, সংহিতোপনিষদ* এবং *বংশব্রাহ্মণ*। *কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ, অর্থবেদের গোপথ ব্রাহ্মণ* ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক কথা ও কাহিনীর, উপাখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কথা, কাহিনী এবং উপাখ্যানের নিদর্শন হলো-

- নাভানেদিষ্ঠোপাখ্যান (*ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*)- নাভানেদিষ্ঠের সত্যভাষণের দ্বারা উচ্চতর জীবনাদর্শ ও ঐহিক ফললাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

- শুনঃশেপাখ্যান (*ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*)- অপুত্রক রাজা হরিশচন্দ্র মনুষ্য ও প্রাণীর পুত্রেচ্ছা লাভের হেতু প্রসঙ্গে ঋষি নারদ ও বরুণ দেবের উক্তি, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উপদেশে অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ বরুণদেবের পূজা দ্বারা নিজের প্রাণ রক্ষার কাহিনী বর্ণিত।

- ইন্দ্র-ভরদ্বাজ উপাখ্যান (*কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*)

- মনু-ঋষভ উপাখ্যান (*শতপথ ব্রাহ্মণ*)- দর্শপূর্ণমাসযাগের হবির্নির্বাপ কর্মের অঙ্গ হিসাবে মনু-ঋষভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

- ত্বষ্টা-বিশ্বরূপ উপাখ্যান (*শুক্লযজুর্বেদের* মাধ্যন্দিনশাখার *শতপথ ব্রাহ্মণ*)- দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা বৃত্রবধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

- মনু-মৎস্যকথা (*শুক্লযজুর্বেদের* মাধ্যন্দিন শাখার *শতপথ ব্রাহ্মণ*)- প্রলয় অবস্থায় মৎস্য দ্বারা মনুকে রক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে।

- চ্যবনের কাহিনী (*শুক্লযজুর্বেদের* মাধ্যন্দিন শাখার *শতপথ ব্রাহ্মণ*)- ভৃগুর পরমপ্রিয় ঋষি চ্যবনের যুবত্বলাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

- কদ্রু ও বিনতার উপাখ্যান (*শুক্লযজুর্বেদের* মাধ্যন্দিন শাখার *শতপথ ব্রাহ্মণ*)

## ১:২:৩ উপনিষদে নির্বাচিত উপাখ্যান, আখ্যায়িকা, সংবাদ ও কাহিনীর পরিচয়

সুবৃহৎ বৈদিক সাহিত্যের শেষ ভাগ উপনিষদ। এটি বেদের শেষ কাণ্ড তথা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। উপনিষদ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গুরুর নিকটে বসে আলোচনা। পাশ্চাত্যের পণ্ডিত M. Winternitz উপনিষদ শব্দের অর্থ করেছেন গুরুর নিকটে বসে দার্শনিক বিদ্যা আয়ত্ত করার নাম উপনিষদ-

The world "*Upaniṣad* " is, in that, derived from the verb "upo-ni-sad", "to sit down near same one", and it originally meant the sitting down of the pupil near the teacher for the purpose of confidential communication, therefore a "confidential" or "secret session".[১০]

প্রতীচ্যের জার্মান দার্শনিক Paul Jakob Deussenর মতে উপনিষদ শব্দের অর্থ হলো রহস্য। উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মবিদ্যাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় নির্বিচারে সর্বত্র প্রকাশ করা হতো না। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এই বিদ্যা কেবল সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতো। তাই এই বিদ্যার নাম রহস্যবিদ্যা। *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে* এ বিষয়ে বলা হয়েছে-

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রোচোদিতম্।[১১]

আবার *কঠোপনিষদে* এর একই প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়-

য ইমং পরমং গুহ্যম্।[১২]

আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, সমুন্নত দার্শনিক চিন্তাধারা, পরাবিদ্যা, জ্ঞান অন্বেষণ তত্ত্বের অন্যতম গ্রন্থ উপনিষদ। প্রত্যেক বেদের সঙ্গে যুক্ত একাধিক উপনিষদ বর্তমান। উপনিষদের সংখ্যা বহুবিধ। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বারোটি উপনিষদকে প্রামাণ্য বলে উল্লেখ করেছেন। *ঋক্ সংহিতার* অন্তর্গত

*ঐতরেয়* এবং *কৌষীতকি উপনিষদ*। *সাম সংহিতার* অন্তর্গত *ছান্দোগ্য* এবং *কেন* বা *তলব্‌কার উপনিষদ। কৃষ্ণযজুর্বেদের* তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত *তৈত্তিরীয় উপনিষদ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিততার* অন্তর্গত *ঈশোপনিষদ, কঠ সংহিতার* অন্তর্গত *কঠোপনিষদ, মৈত্রায়ণী* উপনিষদ, *অথর্ববেদের* পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত *প্রশ্নোপনিষদ,* শৌনকীয় শাখার অন্তর্গত *মুণ্ডকোপনিষদ* এবং *মাণ্ডুক্যোপনিষদ*। প্রত্যেকটি উপনিষদই চিন্তার উৎকর্ষে, ভাবের গাম্ভীর্যে এবং মননশীলতায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। উপনিষদে বর্ণিত গল্পগুলির মধ্যে নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য আখ্যান, উপাখ্যান, সংবাদ, কাহিনী গুলি হলো-

- যম-নচিকেতা উপাখ্যান (*কঠোপনিষদ,* প্রথম অধ্যায়)- যম ও নচিকেতার কথোপকথনের মাধ্যমে আত্মতত্ত্বের উপদেশের বাণী বর্ণিত হয়েছে।
- উষস্তি-চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা (*ছান্দোগ্যোপনিষদ,* প্রথম অধ্যায়)- চক্রের পুত্র উষস্তি দেশ ভ্রমণের সমর্থা পত্নীর সঙ্গে ইভ্য গ্রামে বসবাস কালীন কুরুদেশ শিলাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হলে, দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।
- জানশ্রুতি ও রৈক্কের আখ্যায়িকা (*ছান্দোগ্যোপনিষদ,* চতুর্থ অধ্যায়)
- সত্যকাম জাবালের কাহিনী (*ছান্দোগ্যোপনিষদ,* চতুর্থ অধ্যায়) হরিদ্রুমানের পুত্র গৌতমের নিকটে জাবালের পুত্র সত্যকামের অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ করার কাহিনী বর্ণিত রয়েছে।
- উপকোসল-কামলায়ন উপাখ্যান (*ছান্দোগ্যোপনিষদ,* চতুর্থ অধ্যায়)
- শ্বেতকেতু-প্রবাহণ সংবাদ (*ছান্দোগ্যোপনিষদ,* পঞ্চম অধ্যায়)
- অশ্বপতি-ষড়্‌ব্রাহ্মণ সংবাদ (*ছান্দোগ্যোপনিষদ,* পঞ্চম অধ্যায়)

- প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরচন সংবাদ (*ছান্দোগ্যোপনিষদ*, অষ্টম অধ্যায়)- প্রজাপতির উপদেশে আত্মাকে অনুসন্ধানের জন্য দেবতার মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরদের মধ্যে বিরচন, প্রজাপতির নিকটে তাদের মধ্যে কথোপকথন এই সংবাদে বর্ণিত হয়েছে।
- বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদ (*বৃহদারণ্যকোপনিষদ*, দ্বিতীয় অধ্যায়)
- যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ (*বৃহদারণ্যকোপনিষদ*, দ্বিতীয় অধ্যায়)- অমৃততত্ত্ব বিষয়ে মৈত্রেয়ী প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ বর্ণিত হয়েছে।
- জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ (*বৃহদারণ্যকোপনিষদ*, তৃতীয় অধ্যায়-চতুর্থ অধ্যায়)- বিদেহরাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যজ্ঞে কুরু ও পাঞ্চালদেশ থেকে আগত বহুবিধ ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান ব্রাহ্মণকে, তা নিয়ে পরস্পরের কথোপকথনকে কেন্দ্র করে আলোচ্য সংবাদ রচিত হয়েছে ।
- গার্গ্য-অজাতশত্রু সংবাদ (*বৃহদারণ্যকোপনিষদ*, তৃতীয় অধ্যায়)।
- আরুনি-প্রবাহণ সংবাদ (*বৃহদারণ্যকোপনিষদ*, ষষ্ঠ অধ্যায়) - আরুনি ও প্রবাহণের মধ্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বিষয়ক কথোপকথন হলো এই সংবাদের বিষয়বস্তু।

## ১:৩ আগম গ্রন্থে নির্বাচিত আখ্যান, কাহিনীর নিদর্শন

জৈনদের আগমগ্রন্থে প্রাকৃত ভাষা মানব জীবনের আদর্শগুলি পরিপালনের উপদেশ প্রসঙ্গে বিভিন্ন গল্প কথা বা কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তীর্থঙ্করদের মুখ নিঃসৃত বাণী, তাঁদের শিষ্যগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে আগম সাহিত্যের উৎপত্তি। আগম সাহিত্যকে সিদ্ধান্ত নামেও

অভিহিত করা হয়ে থাকে। জৈনধর্মে প্রথম তীর্থঙ্করের নাম ঋষভ এবং অন্তিম তীর্থঙ্করের নাম মহাবীর। আগমের আবির্ভাব কাল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক এবং এই আগম সাহিত্যের কাল খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছিল। আগমের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক Dr. S. Radhakrishnan বলেছেন –

There is evidence to show that sofa back as the first century B. C. there were people who were worshipping Ṛśabhadeva, the first tirthankara.[১৩]

জৈন সাহিত্যে এই ধরনের কাহিনী বা গল্প কথানক নামে পরিচিত। জৈন আগমগ্রন্থে ন্যায় ধর্মকথার অন্তর্গত লোকপ্রিয় গল্প বা কথার মাধ্যমে মানব জীবনের আদর্শ গুলি প্রতিফলিত হয়েছে। জৈন সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো

- *বসুদেবহিণ্ডী* বা *বসুদেবচরিত* - বসুদেবের ভ্রমণ কাহিনী, বিভিন্ন শলকাপুরুষদের কাহিনী, কুবের দত্তচরিত, মহেশ্বর দত্তচরিত প্রভৃতি আখ্যান পাওয়া যায়।
- *শমরাইচচকহা* বা *সমরাদিত্য কথা* - উজ্জয়িনী রাজা সম্রাটের নয়জন্মের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে।
- *ধূত্তক্খাণ* বা ধূর্তাখ্যান
- *আখ্যানমণিকোশ* - শীলমাহাত্ম্যের বর্ণনায় দময়ন্তী, সীতা, সুভদ্রা, রোহিণী প্রভৃতি আখ্যান বর্ণিত হয়েছে।
- *কথারত্নকোশ* - হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবী, বুদ্ধ, জিন ও শলাকা পুরুষদের সম্পর্কিত বিভিন্ন আখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

- *কুমারপাল প্রতিবোধ* নামান্তরে *জিনধর্মপ্রতিবোধ* - চালুক্য রাজ কুমারপালের জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের কাহিনী ও চুয়ান্নটি বিবিধ আখ্যান বর্ণিত।

## ১:৪ *বাল্মীকিরামায়ণ* ও *বৈয়াসিকমহাভারতে* নির্বাচিত আখ্যান, উপাখ্যান ও কাহিনীর নিদর্শন

মানুষের মনে প্রাচীন নৃপতিগণের, লোকোত্তর বীরপুরুষগণের, দেবতাগণের কাহিনী শোনার শাশ্বত প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে যে সকল কাহিনী বা গল্পের সৃষ্টি হয়েছিল তার সুসম্পন্ন সঙ্কলন হলো *বাল্মীকিরামায়ণ* এবং *বৈয়াসিকমহাভারত*। এই সকল মহাকাব্যের বীজ বপ্ত হয়েছিল বৈদিক যুগের জনপ্রিয় আখ্যান, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা, ইতিহাস, গাথা থেকে। *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* বিভিন্ন জনপ্রিয় বীরত্বগাথা আখ্যান, উপাখ্যান, কাহিনীসমূহ সূত ও চারণগণের দ্বারা জনসাধারণের নিকট পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে কিংবা সভা-সমিতিতে সহযোগে আবৃত্তি করা হত। এইসব জনপ্রিয় আখ্যান বীরত্বগাথা কাহিনী পরবর্তীকালে সাহিত্যে উপনিবন্ধ হয়। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যের ও রূপের পরিবর্তন লক্ষণীয়। ফলে সাহিত্যতত্ত্ব জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হৃদয়গ্রাহী ও সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

### ১:৪:১ *বাল্মীকিরামায়ণে* নির্বাচিত আখ্যান, উপাখ্যান ও কাহিনীর পরিচয়

বৈদিক অনুষ্ঠানে লোকপূজ্য বীর ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের আখ্যান কাহিনী রূপে সর্বসমক্ষে কিংবা সভা-সমিতিতে পাঠ করার রীতি প্রচলন ছিল। সেই বীরত্ব গাথা অলৌকিক ঘটনাশ্রিত ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ্য প্রধান কাহিনীকে কেন্দ্র করে বাল্মীকি মহাকাব্য *রামায়ণ* রচনা করেন। বিষয়গতভাবে, *বাল্মীকিরামায়ণে* যে সমস্ত উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে তাতে প্রাচীন ভারতের ধর্মচেতনা এবং মানব

সমাজের বিবিধ দিক পরিস্ফুট হয়েছে । ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম এবং সাহিত্যে এই মহাকাব্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আসলে মহাকবি বাল্মীকি তাঁর রচিত মহাকাব্যের মধ্যে ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ এবং হৃদয়াবেগকে প্রতিফলিত করেছেন। *বাল্মীকিরামায়ণের* আবির্ভাব কাল নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ বর্তমান। *বাল্মীকিরামায়ণের* পূর্ণ সঙ্কলন হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বে এবং এই মহাকাব্যের আবির্ভাব সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A. A. Macdonell খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক এবং তার পরবর্তী সময়েকে নির্ধারণ করেছেন-

.... the *Rāmāyaṇa* was composed before 500B.C., while the more recent portions where probably not added till the 2nd century B.C. and later.[১৪]

*বাল্মীকিরামায়ণে* উল্লেখযোগ্য আখ্যান সমূহ-

*বাল্মীকিরামায়ণ* সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। যথা: *আদিকাণ্ড বা বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড* বা *যুদ্ধকাণ্ড* ও *উত্তরকাণ্ড*। এই সপ্তকাণ্ডে রামের জীবনকথা কালানুক্রমিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। *আদিকাণ্ডে* বর্ণিত হয়েছে রামের জন্ম, শৈশব ও সীতার সহিত বিবাহের কথা। *অযোধ্যাকাণ্ডে* বর্ণিত হয়েছে রামের রাজ্যাভিষেক প্রস্তুতি ও তাঁর বনগমনের কথা। তৃতীয়খণ্ড *অরণ্যকাণ্ডে* বর্ণিত হয়েছে রামের বনবাসের কথা ও রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের বৃত্তান্ত। চতুর্থখণ্ড *কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে* বর্ণিত হয়েছে হনুমান ও রামের মিলন, রামের সহায়তায় বানররাজ বালী হত্যা এবং বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যাভিষেক। পঞ্চমখণ্ড *সুন্দরকাণ্ডে* বর্ণিত হয়েছে হনুমানের বীরত্বগাথা, তার লঙ্কাগমন ও সীতার সহিত সাক্ষাতের কথা। রাম ও রাবণের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে ষষ্ঠখণ্ড *লঙ্কাকাণ্ডে* ঋষির কথা সর্বশেষখণ্ড *উত্তরকাণ্ডের* মূল উপজীব্য রাম ও সীতার পুত্র লব ও কুশের জন্মবৃত্তান্ত, তাঁদের রাজ্যাভিষেক ও

রামের ধরিত্রী ত্যাগ। মূলকাহিনীর প্রসঙ্গক্রমে বিবিধ আখ্যান ও উপাখ্যানের সন্নিবেশ লক্ষিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ঋষ্যশৃঙ্গের আখ্যান (ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাদের জামাতার দ্বারা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের বিবরণ বর্ণিত আছে), গঙ্গা অবতার আখ্যান (রাজা সগরের প্রপৌত্র ভগীরথের মহৎ তপস্যার দ্বারা গঙ্গা অবতরণের কাহিনী বর্ণিত), সগর রাজার উপাখ্যান (সগর রাজার কাহিনী বর্ণিত), অহিল্যোধারার আখ্যান (ভগবানরাম শাপগ্রস্থ মহর্ষি গৌতমের প্রথম অহিল্যার উদ্ধারের কাহিনী বর্ণিত), শুনঃশেপাখ্যান বা হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান (মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উপদেশে অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ বরুণদেবের পূজা করে নিজের প্রাণ রক্ষার কাহিনী বর্ণিত), কার্তিকের উৎপত্তি উপাখ্যান, মৈত্রাবরূণ আখ্যান, অষ্টাবক্র আখ্যান, ত্রিশংক্বাখ্যান, মেনকা-বিশ্বামিত্র আখ্যান, নৃগাখ্যান, যযাতির আখ্যান, পুরূরবা আখ্যান ইত্যাদি।

### ১:৪:২ *বৈয়াসিকমহাভারতে* নির্বাচিত আখ্যান, উপাখ্যান ও কাহিনীর পরিচয়

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধ হলো *মহাভারতের* আখ্যানভাগের মূল বিষয়বস্তু। কালক্রমে মূল আখ্যানভাগের সঙ্গে বিভিন্ন উপাখ্যান, ইতিহাস, নীতি, ধর্ম ও ভক্তিমূলক রচনা সংযুক্ত হয়েছে। *বৈয়াসিকমহাভারতে* বর্ণিত বিভিন্ন জীবন কাহিনীর মধ্যে দিয়ে জীবন দর্শনের মূলতত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। এই মহাকাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যানের মাধ্যমে জীবে দয়া, বিষয়ে অনাসক্তি, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয় প্রভৃতি সর্বমানবীয় নীতি ও ধর্মবোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। *বৈয়াসিকমহাভারতের* আবির্ভাব কাল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A. A. Macdonell বলেছেন-

We may, then, perhaps assume that the original form of our epic came into being about the fifth century BC.[১৫]

এই মহাকাব্যের আখ্যান ও উপাখ্যানের মধ্যে প্রাচীনতম নীতিমূলক কল্পকাহিনীর নিদর্শন লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত M. Winternitz বলেছেন-

The oldest Indian fables are to be found, indeed, already in the actual epic, and they serve for the inculcation of rules of *Nīti*, i.e., worldly wisdom as well as *Dharma* or morality.[১৬]

*বৈয়াসিকমহাভারতে* উল্লেখযোগ্য কাহিনী ও উপাখ্যান সমূহ হলো-

- *আদিপর্ব্বের* অন্তর্গত কদ্রুবিনতার উপাখ্যান (দক্ষ প্রজাপতির দুই কন্যা কদ্রু ও বিনতের বিবাহ মহর্ষি কশ্যপের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে), দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন উপাখ্যান (নাগরাজ বাসুকিকে রজ্জু রূপে এবং মন্দার পর্বতকে মন্থন দণ্ডরূপে দেব এবং অসুরের মধ্যে অমৃতকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে), রুরুর উপাখ্যান (দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনের ফলে তা থেকে চন্দ্র , লক্ষ্মী, সুর ও অমৃতের উদ্ভব, সর্পবংশ ধ্বংস করতে তৎপর রুরুর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে), জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ আখ্যান, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যান (শকুন্তলা ও রাজাদুষ্মন্তের প্রণয় কথা বর্ণিত হয়েছে), যযাতির উপাখ্যান (যযাতির যৌবন প্রাপ্তির কাহিনী উপনিবন্ধ হয়েছে)।
- *সভাপর্ব্বের* অন্তর্গত শিশুপাল উপাখ্যান (শিশুপালের বধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে)
- *বনপর্ব্বের* অন্তর্গত মনু-মৎস্য উপাখ্যান (প্রলয় অবস্থায় মৎস্য দ্বারা মনুকে রক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে), নল-দময়ন্তী উপাখ্যান (নিষধ দেশের রাজা নল ও দময়ন্তীর প্রণয় কাহিনী

মূল বিষয়বস্তু), শিব উপাখ্যান (মহারাজ শিবি শ্যেনার হাত থেকে রক্ষার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে), রামোপাখ্যান, ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান, সাবিত্রী-সত্যবান উপাখ্যান (সাবিত্রী সত্যবানের পতিব্রত ধর্মের কাহিনী বর্ণিত), নহুষোপাখ্যান ।

- *উদ্যোগপর্বের* অন্তর্গত অম্ব উপাখ্যান।
- *শান্তিপর্বের* অন্তর্গত রাম কাহিনী।
- *হরিবংশ পুরাণের* অন্তর্গত মহিমা কীর্তনের আখ্যান, বেণ-পৃথু-ধ্রুব-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-চন্দ্র বংশ প্রভৃতির উপাখ্যান।

## ১:৫ মহাপুরাণে নির্বাচিত আখ্যান, উপাখ্যান কথা ও কাহিনীর নিদর্শন

ভারতবর্ষে দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন, রাজ শক্তির কার্যকলাপ, রাজবংশের উত্থান পতনের ইতিহাস, ব্রাহ্মণ্য প্রভাব মুক্ত জনগণের ইতিহাস সংরক্ষিত আছে পুরাণ সাহিত্যে। মহামতি ব্যাস পুরাকালীন আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, কল্প সমন্বয়ে পুরাণ সংহিতার রচনা করেছিলেন। পুরাণ সংহিতায় আঠারোটি মহাপুরাণ- *ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব* বা *বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য* বা *ভবিষ্যৎ, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড* ইত্যাদি। আঠারোটি উপপুরাণ বিদ্যমান। পুরাণের আবির্ভাব কাল নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত বলেছেন-

It is difficult to determine the exact position of the *Purāṇa*s in the history of literature, both according to contents and chronology.[১৭]

সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত *সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা* গ্রন্থে পুরাণের কাল হিসাবে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ পঞ্চম শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করেন। কারণ বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহের অনেক কাহিনী পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। *মহাভারতের* অনেক অংশ *হরিবংশপুরাণের* আকারে রচিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। *রামায়ণের* অন্তিম অংশ পুরাণের আকারে রচিত। এছাড়া কল্পসূত্রের অন্তর্গত ধর্ম সূত্রে (গৌতমের ধর্মসূত্র ১১/১৯, আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্র ২/২৬/৬) ইত্যাদি গ্রন্থে পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে রচিত বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থগুলির সঙ্গে পুরাণের সাদৃশ্য বর্তমান থাকায় পুরাণগুলিকে খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের নিকটবর্তী কালের রচনা রূপে মনে করা হয়। অন্যদিকে বিশিষ্ট সমালোচক শিবশংকর শাস্ত্রী এবং বিনয় সরকার তাঁদের রচিত *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের রূপরেখা* গ্রন্থে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত Max Müller এর মতের উল্লেখ করে বলেছেন অধিকাংশ পুরাণ খ্রিস্টিয় দশম শতক থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে লেখা হয়েছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে পুরাণের আবির্ভাবকাল প্রসঙ্গে বলেছেন যে সূত্র সাহিত্যে পুরাণের উল্লেখ আছে সেহেতু খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল। তবে যে আঠারোটি মহাপুরাণ রয়েছে তারমধ্যে *মৎস্যপুরাণের* প্রাচীনতম মৌলিক অংশটি আনুমানিক তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে। পুরাণ সংহিতায় উল্লেখযোগ্য নির্বাচিত কথা, কাহিনী ও আখ্যান সমূহ হলো-

- ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কথা, দেবগণের উৎপত্তির ইতিহাস, চন্দ্র-সূর্য-মনু বংশের ইতিহাস (*ব্রহ্মপুরাণ* বা *আদিপুরাণের* অন্তর্গত)।
- প্রহ্লাদের বিষ্ণু ভক্তির কাহিনী, *পাতালখণ্ডে* ধর্মীয় আখ্যান-উপাখ্যান, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা কাহিনী, ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী (*পদ্মপুরাণের* অন্তর্গত)।

- বিষ্ণুর দশাবতারের কাহিনী, ভরতমুনি ও হরিণ শিশুর গল্প (*বিষ্ণুপুরাণের* অন্তর্গত)।
- জনকের অশ্বমেধ কাহিনী, দক্ষযজ্ঞ কাহিনী, পুরূরবা-উর্বশী কাহিনী, পৃথুচরিত কাহিনী, দেবাসুরের যুদ্ধ কাহিনী (*বায়ুপুরাণের* অন্তর্গত)।
- গোপালক কৃষ্ণের জীবন কাহিনী, জড়ভারতের কথা, অজামিলের কথা, মৎস্য অবতার কথা, হরিশচন্দ্র ও শহরের উপাখ্যান, অবধূত ও পিঙ্গলার উপাখ্যান, শিব মার্কণ্ডেয়সংবাদ (*ভাগবতপুরাণের* অন্তর্গত)।
- দানশীল রাজাহরিশচন্দ্র, রাজাবিপশ্চিত, রাণীমদলাসার কাহিনী (*মার্কণ্ডেয়পুরাণের* অন্তর্গত)।
- গণেশের মহিমা কীর্তনের কাহিনী, রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী (*ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের* অন্তর্গত)।
- কৃষ্ণাবতার কথা, শিব-পার্বতী কাহিনী, শিবের মাহাত্ম্য বিষয়ক পুরাবৃত্ত (*লিঙ্গপুরাণের* অন্তর্গত)।
- মহিষাসুর ও দুর্গার উপাখ্যান, শিব-গৌরী কাহিনী, তারক উপাখ্যান (*বামনপুরাণের* অন্তর্গত)।
- *সনদ কুমারীয়* সংহিতায় মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা আখ্যান উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে, *বৈষ্ণবী সংহিতায়* বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ও তৎসম্পর্কিত নানান বর্ণিত হয়েছে, *শঙ্করী সংহিতায়* বিষ্ণু ও শঙ্করের একত্ব ও মাহাত্ম প্রতিপাদিত হয়েছে (*স্কন্দপুরাণের* অন্তর্গত)।
- কূর্মরূপী ভগবান বিষ্ণু ও রাজা ইন্দ্রদ্রুম্নের কাহিনী (*কূর্মপুরাণের* অন্তর্গত)।
- মৎস্য রূপী ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক মনুকে রক্ষার কাহিনী (*মৎস্যপুরাণের* অন্তর্গত)।
- ললিতা উপাখ্যান (*ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের* অন্তর্গত)।

## ১:৬ জাতক সাহিত্যে আখ্যান, উপাখ্যানের নিদর্শন

ভারতের প্রাচীনতম গল্প সংগ্রহের নাম জাতক। পালি ভাষায় যাকে *জাতকত্থবন্ননা* বলা হয়। জাতকের গল্পগুলির মধ্যে ভগবান শাক্য মুনি বুদ্ধের পূর্বজন্মের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। কাহিনীগুলি বুদ্ধের মুখে বর্ণিত হয়েছে যার মাধ্যমে জনগণকে উপদেশ প্রদান করতেন। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত A. A. Macdonell বলেছেন-

They were ascribed to Buddha, and their sanctity increased by identifying the best character in any story with Buddha himself in a previous birth. Hence such tales were called *Jātakas*, or "Birth Stories".[১৮]

মানবজাতির জ্ঞান ও নৈতিকতা অর্জনের জন্য জাতকের কাহিনী অন্যতম। জাতকের কাহিনী গুলি মূলত ধর্মীয় আদর্শ ও নীতির দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত। জাতকের সব কথাই উপদেশমূলক। এর বাণী কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এগুলি সর্বজনীন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই জাতক থেকে উপদেশাবলী গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া জাতকে পুরাকালের আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-আচার ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়। জাতকের রচনার কৌশলও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে জাতকের অবদান অনস্বীকার্য। জাতকে অন্যতম গ্রন্থের নাম জনৈক আর্যাশূর রচিত *জাতকমালা* নামান্তরে *বোধিসত্ত্বাবদানমালা*। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

Closely connected with the *Jātaka-mālā*, which is also entitled *Bodhisattvāvadāna-mālā*, are the works belonging to what is called the Avadāna literature; for the Jātaka is nothing more than an Avadāna (Pali

Apadāna) or tale of great deed, the hero of which is the Bodhisattva himself.[১৯]

জাতক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে *জাতকমালার* নাম সর্বজনবিদিত। এই গ্রন্থের আবির্ভাব কাল খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী হিসেবে গণ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে ভারত তত্ত্ববিদ S. N. Dasgupta & S. K. DE বলেছেন -

*Ārya Śūra's* date is unknown, but as another work of his was translated into Chinese in 434 A.D., he cannot be dated later than the 4th century A.D.[২০]

প্রতিটি জাতক আবার কয়েকটি অংশে বিভক্ত যেমন কাহিনীর প্রাককথন অংশ (*পচ্চুপ্পন্নবত্থু*), গদ্য বর্ণনাত্মক অংশ , গাথা, বেয্যাকরণ ও সংযোগ (সমোধান) অংশ। এই গ্রন্থটির মধ্যে চৌত্রিশটি জাতকের সঙ্কলন পরিলক্ষিত হয়। যেমন-*ব্যাঘ্রীজাতক, শিবিজাতক, কুন্মাষপিণ্ডীজাতক, শ্রেষ্ঠীজাতক, অবিসহ্যশ্রেষ্ঠীজাতক, শশজাতক, অগ্যস্তজাতক, মৈত্রীবলজাতক, বিশ্বম্ভরজাতক, যজ্ঞজাতক, শক্রজাতক, ব্রাহ্মণজাতক, উন্মাদয়ন্তীজাতক, সুপরাগজাতক, মৎস্যজাতক, বর্ত্তকাপোতকজাতক, কুম্ভজাতক, অপুত্রজাতক, বিসজাতক, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠীজাতক, চুল্লবোধিজাতক, হংসজাতক, মহাবোধিজাতক, মহাকপিজাতক, শবভজাতক, দ্বিতীয়মহাকপিজাতক, ক্ষান্তিজাতক, ব্রহ্মজাতক, হস্তীজাতক, সুতসোমজাতক, অযোগৃহজাতক,* মহিষজাতক, *শতপত্রজাতক* ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্য জাতক আখ্যায়িকা গুলি হলো -*অপন্নজাতক* আখ্যায়িকা, *ন্যগ্রোধমৃগজাতক* আখ্যায়িকা, *তৈলপাত্রজাতক* আখ্যায়িকা, *নক্ষত্রজাতক* আখ্যায়িকা, *মহাশিনলবজ্জাতক* আখ্যায়িকা। পালি জাতকের অন্তর্গত *লাঙ্গলেষাজাতক, অসিলক্ষণজাতক, উভতোভ্রষ্টজাতক, দদ্দভজাতক,*

*পুপ্ফবগ্গে* সিরিদত্ত ও গরহদিনের উপাখ্যান, *জরাবগ্গের* উপাখ্যান ইত্যাদি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই সমস্ত জাতকের মধ্যে বিভিন্ন কাহিনী, পরীরগল্প, অভিযানাত্মক কাহিনী, হাস্যরসাত্মক কাহিনী, নীতিকথা ও ধর্মকাহিনীর নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতক সাহিত্য ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের সাহিত্যকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করেছে। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতকের অবদান অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত M. Winternitz বলেছেন-

The *Jātakas* are of inestimable value, not only as regards literature and art, but also from the point of view of the history of civilization. Though they cannot serve as documents for the social conditions at the time of Buddha, -yet the narrators of *Jātaka* book offered us a glimpse into the life of classes of Indian people of which other books of Indian literature only early give us any information.[২১]

অর্থাৎ শুধু সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, সভ্যতার ইতিহাসের দিক থেকেও জাতক সাহিত্য অনস্বীকার্য।

## ১:৭ অবদান সাহিত্যে আখ্যান, উপাখ্যানের নিদর্শন

জাতকের গল্পের ন্যায় অবদান গ্রন্থসমূহে বোধিসত্ত্বের বিগত জীবনের মহীয়সী কীর্তির বিবরণ পাওয়া যায়। 'অবদান' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী বলেছেন -

The word 'Avadāna' signifies a great religious or moral achievement as well as the history of a great achievement.[২২]

বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা* গ্রন্থে 'অবদান' শব্দের অর্থ হিসাবে শ্রেষ্ঠ কার্যকে উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে নৈতিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট কীর্তিজনক কর্মই হলো অবদান। অবদান গ্রন্থগুলির মধ্যে মহৎ গুণাবলীর প্রশংসা এবং শুভ কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা বুদ্ধত্ব অর্জনের মর্মবাণী প্রতিফলিত হয়েছে। মানব জীবনের বিভিন্ন কর্মফল, বুদ্ধ এবং তন্মতাবলম্বী মহাপুরুষের প্রতি ভক্তি দ্বারা কঠোর থেকে অব্যাহতির উপায় অবদান গ্রন্থগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। অবদান সাহিত্যের রচনাকাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে এই সাহিত্যে 'দীনার' শব্দের উল্লেখ আছে এর থেকে অনুমিত হয় যে খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের পূর্বে এটি রচিত হয়নি। খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকে প্রাচীনতম *অবদানশতক* নামক অবদান সাহিত্যের দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয় সুতরাং এই অবদান সাহিত্য খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের পরে রচিত হয়নি। এ সম্পর্কে ভারত তত্ত্ববিদ S. N. Dasgupta & S. K. De বলেছেন-

The date of the work is uncertain, but while the mention of the Dinara as a current coin (Roman Denarius) is supposed to indicate 100 A.D. is the upper limit, the lower limit is supplied more convincingly by its translation into Chinese in the first half of the 3rd century.[২৩]

অবদান সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো-

- *অবদানশতক* (মহৎ গুণাবলীর প্রশংসা এবং শুভকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা বুদ্ধত্ব অর্জনের কাহিনী বিদ্যমান। এই গ্রন্থটি দশটি বগ্গে বা বর্গে বিভক্ত)
- *দিব্যাবদান* (আটত্রিশটি উপাখ্যান বর্তমান)।

- *বোধিসত্ত্বাবদানকল্পতা* (একশ আশিটি উপাখ্যান বিদ্যমান)।
- *মহাবস্তু অবদান* (*বিনয়পিটকের* মহৎ আখ্যান গুলিকে অবলম্বন করে গ্রন্থটি রচিত)।
- *সুবর্ণবর্ণাবদান* (সুবর্ণবর্ণের মহৎ আখ্যান অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত)।
- এছাড়া *মণিচূড়া অবদান, অবদান সারসমুচ্চয়, অশোকাবদান, কর্মশতক* ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কবিমনের বহুবিধ প্রশ্ন, অনুভূতি, পাণ্ডিত্য ও শিল্পচেতনার সমন্বয়ে সাহিত্য বাঙ্ময় রূপ লাভ করে। সাহিত্যে উল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পটভূমি বহুলাংশে প্রতিভাত হয়। তাই সাহিত্যের মধ্যে সমাজের প্রতিফলন লক্ষণীয়। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের ও পরিবর্তন ঘটে। বিদ্যা চর্চা নদীর মতো প্রবহমান। বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী যুগে যে সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য রচিত হয়েছিল তা প্রত্যক্ষভাবে বৈদিক সাহিত্যের কাছে ঋণী। সেই সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ভারতীয় সাহিত্যিকগণের জ্ঞান অত্যন্ত গভীর এবং বাস্তব অনুরাগী সম্মত। মানব জীবনই সাহিত্যের এক এবং অদ্বিতীয় ভিত্তিভূমি। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে যে সৃজনী ব্যক্তিত্ব তা নিছক বিমূর্ত কোন সত্ত্বা নয়, আত্মপ্রকাশ ও মানবিক সংযোগ ও বিনিময়ের বাসনায় অনুপ্রাণিত সে সত্ত্ব তাঁর ভাব, ভাবনাকে এক আশ্চর্য প্রতিভার দ্বারা জনসমক্ষে প্রকাশ করে। ব্যবহারিক জীবনের বস্তুগত সত্য যখন কাব্যে ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে তখন সেই সত্যের উপলব্ধি সঞ্চার করে এক অপূর্ব আনন্দ। অপূর্ব আনন্দ সঞ্চারের উপলব্ধির মাধ্যমে সাহিত্যে রসের আগমন ঘটে। কল্পনাপ্রবণ আদর্শবাদী ভারতীয় জনসমাজ ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়গণ বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি বর্জিত ছিলেন  না একথা যেমন সত্য তেমনি প্রয়োজনবোধে তাঁরাও চাতুর্য ও রসিকতার

মাধ্যমে জগৎ বিষয়ে সচেতনতা পরিচয় দিতেন। বৈদিক যুগে জনসাধারণ পার্থিব জগতের ভোগের প্রতি আসক্তি থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে দেবস্তুতি গুলির মাধ্যমে যে উপদেশের সঞ্চার করা হয়েছে, তার মধ্যে চাতুর্য ও রসিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেই রসিকতা কখনো চরিত্রের মাধ্যমে আবার কখনো আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, ইতিহাস, পুরাণ, শ্লোক, সংবাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে যে গল্পসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তার আবির্ভাব যে বৈদিক যুগে হয়েছিল এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A. B. Keith স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন-

> We may safely assume that from the earliest times of the life off the Vedic Indians in India tales of all sorts passed current among the people..... When the didactic fables became a definite mode of inculcating useful knowledge.[২৪]

প্রাচীনের হাত ধরেই তো নবীনের আগমন। বৈদিক সাহিত্যের সূত্র ধরে সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গল্পসাহিত্যগুলির আবির্ভাব। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী বলেছেন-

> The origin of Indian fable literature must be traced back to the earliest times in the life of Vedic Indians.[২৫]

সেই সমস্ত গল্পগুলিকে কাল অনুযায়ী ক্রমপর্যায় বর্ণনা করা হলো-

- *পঞ্চতন্ত্র* (তিনশো খ্রিস্টপূর্ব)
- *বৃহৎকথা* (আনুমানিক প্রথম শতক)
- *শ্লোকসংগ্রহ* (অষ্টম থেকে নবম শতকের মধ্যে)

- *বৃহৎকথামঞ্জরী* (দশম শতকের মধ্যে)
- *কথাসরিৎসাগর* (একাদশ শতকে)
- *বেতালপঞ্চবিংশতি* (একাদশ শতকে)
- *শুকসপ্ততি* (দ্বাদশ শতকে)
- *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* (দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে)
- *হিতোপদেশ* (ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে)
- *পুরুষপরীক্ষা* (চতুর্দশ শতকে)
- *ভোজপ্রবন্ধ* (ষোড়শ শতকে)

গ্রন্থগুলিতে মনোরম গল্পের সমাবেশে জনসমাজে উপদেশ, বাণী, নীতি কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। গল্পসাহিত্য নীতিকথা মূলক হলেও তার মধ্যে হাস্যরস বিদ্যমান। গ্রন্থগুলির মধ্যে নির্বাচিত নির্দিষ্ট কয়েকটি গল্পসাহিত্যে (*পঞ্চতন্ত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, হিতোপদেশ, পুরুষপরীক্ষা, ভোজপ্রবন্ধ*) হাস্যরসের সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ করাই হলো গবেষণাপত্রের মূল বিষয়বস্তু।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে আচার্য ভরতমুনি *নাট্যশাস্ত্রের* ষষ্ঠ অধ্যায়ে তত্ত্বগত দিক দিয়ে হাস্যরস প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে আচার্য ভরতের মতকে অনুসরণ করে আচার্য বিশ্বনাথ, শারদাতনয়, আচার্য মম্মট, রামচন্দ্র, গুণচন্দ্র, সাগরনন্দী, আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁরা সকলেই তত্ত্বগত দিক দিয়ে হাস্যরসের আলোচনা করেছেন। হাস্যরসের আলোচনায় প্রতীচ্যের অবদান উল্লেখযোগ্য। গ্রিক দার্শনিক Aristotle, ইতালি দার্শনিক B. Croce, পাশ্চাত্ত্যের লেখক

A. W. Blomfield, পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্ববিদ W. Mcdougall, পাশ্চাত্ত্যের লেখক M. B. Bohm, পাশ্চাত্ত্যের লেখক O. H Haug, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত M Winternitz, ফরাসি দার্শনিক H. Bergson, পাশ্চাত্ত্যের ঔপন্যাসিক G. Meredith, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সমালোচক W. Hazlitt, N. Jefferds ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে পরিচিত। প্রতীচ্যে যাঁরা হাস্যরস নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা প্রাচীনের পথ ধরেই আচার্য ভরতের মতকে অনুসরণ করে আলোচনা করলেও তত্ত্বগত দিক দিয়ে সেই ভাবে আলোচনা করেননি। তাঁরা সকলেই কেউ মনস্তাত্ত্বিক, কেউ অনুভূতি, কেউ শারীরিক পরিবর্তন, কেউ নান্দনিক দিক দিয়ে হাস্যরসের স্বরূপ বিচারে তৎপর হয়েছেন এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন রেখে গেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বিশিষ্ট সাহিত্যিক S.K. De *Aspects of Sanskrit Literature গ্রন্থের* " Wit Humour and Satire in Sanskrit Literature" প্রবন্ধে, আচার্য শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের স্থান, হাস্যরস ও রসাভাসের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। পণ্ডিত শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল *সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস* গ্রন্থে হাস্যরসের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের নিদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যমূলক এবং বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। আচার্য গোপালচন্দ্র মিশ্র মহাশয় বিরচিত *সংস্কৃত সাহিত্যের সমোলচনা: বিবিধ প্রসঙ্গ* গ্রন্থের "সংস্কৃত হাস্য : কিছু কথা" প্রবন্ধে হাস্যরসের নিদর্শন লিপিবদ্ধ করেছেন।

**উল্লেখপঞ্জি**


১. M. Müller, *A History of Ancient Sanskrit Literature,* pp-40, 41

২.*বায়ুপুরাণ*

৩. *মৎস্যপুরাণ*

৪. *নিরুক্ত* ৪/৬

৫. *ছান্দোগ্যোপনিষদ* ৭/২

৬. *অমরকোষ*১/৬

৭. M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, Vol., pp-310

৮. H. L. Hariyappa, *Rigvedic Legends through the ages*, pp-75

৯. A. A. Macdonell, *A History of Sanskrit Literature*, pp-07

১০. M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, Vol.1, pp-243

১১. *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ*

১২. *কঠোপনিষদ*

১৩. S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, vol. 1, pp-287

১৪. A. A. Macdonell, *A History of Sanskrit Literature,* pp-269

১৫. *তদেব*, pp-240

১৬. M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, Vol. 1, pp-406

১৭. *তদেব,* pp-517

১৮. A. A. Macdonell, *A History of Sanskrit Literature*, pp-313

১৯. S. N. Dasgupta & S. K. DE, A *History of Sanskrit literature classical period,* vol. 1, pp- 81

২০. *তদেব*, pp- 80, 81

২১. M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, Vol.2, pp-156

২২. G. Sastri, *A Concise History of Classical Sanskrit Literature*, pp-73

২৩. S. N. Dasgupta & S. K. DE, A *History of Sanskrit literature classical period,* vol. 1, pp-82

২৪. A. B. Keith, *A History of Sanskrit Literature*, pp-242

২৫. G. Sastri, *A Concise History of Classical Sanskrit Literature*, pp-131

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রানুসারে হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য এবং পাশ্চাত্ত্যে হাস্যরসের ধারা

### ১:১ হাস্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

হাসি-কান্না, কাম-ক্রোধ, লোভ-লালসা এইগুলি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। খুব সাধারণভাবে হাস্যের বহিঃপ্রকাশ মুখমণ্ডলের নরম মাংস পেশী প্রসারিত করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। মুখমণ্ডলের সাথে সাথে চোখের মাধ্যমে হাস্যের বহিঃপ্রকাশ দৃশ্যমান হয়। পশুপক্ষী প্রভৃতি মানবেতর প্রাণীর মধ্যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হলেও হাস্যের বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয় না। কারণ হাস্যের মধ্যে যে মানসিক বৃত্তি প্রয়োজন তা পশুপক্ষীর মধ্যে সেটি দৃশ্যমান নয়। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যার মাধ্যমে হাস্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হাস্যের বহিঃপ্রকাশের জন্য যে মানসিক বৃত্তি প্রয়োজন তা পূর্ণ মাত্রায় মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তাই বলা যেতে পারে মানুষ হাস্যময় প্রাণী। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত H. Bergson এ প্রসঙ্গে বলেছেন –

.... man as an animal which laughs.[১]

মানুষ কখনো বাক্যের মাধ্যমে আবার কখনো বাহ্য আচরণের মধ্যে দিয়ে হাস্যের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। হাস্য ব্যাপারটি দীর্ঘস্থায়ী নয় তা স্বভাবত ক্ষণস্থায়ী ভাবসম্পন্ন। হাস্যের প্রকাশ তার আবেদন ব্যক্তিভেদে, বিষয়ভেদে ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষ কথা বলার পূর্বে হাসতে শেখে। যেমন শিশু তার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে হাস্যের মাধ্যমে। এই কথা বলা যেতে পারে যে, আদিম যুগ থেকে বাক্য সৃষ্টির পূর্বে শরীরের স্বাভাবিক চেষ্টার অভিব্যঞ্জকরূপে মানসিক বৃত্তিগুলি হাস্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শুধু আনন্দই নয় মানুষের চিত্তে সুখ-দুঃখ, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি

অনুভূতির প্রকাশ হাস্যের মাধ্যমে ঘটে থাকে। হাস্যের জন্য সহজাত প্রবৃত্তির পাশাপাশি অনুভূতি ও তার অনুভব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। এই অনুভূতি একমাত্র চেতন প্রাণীতে বিদ্যমান থাকে। হাস্য সকল সময়ে চেতন মানবসত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে যে অবস্থায় মানুষ সাধারণত হেসে ওঠে সেই লক্ষণীয় বিষয়গুলি হলো- সাবলীল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ, অদ্ভুত, উদ্ভট ও বিস্ময় জনক ঘটনা দর্শন হেতু, অসঙ্গতি, বিসদৃশ ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা দর্শন হেতু, অন্যের দৈহিক বিকৃতি দেখে কিংবা চরিত্রের দোষ ত্রুটি, কিংবা মানুষের কার্যাবলীর পৌনঃপুনিকতা ও বিপরীত স্বভাব দর্শন হেতু ব্যক্তির চিত্তে হাস্যের উদ্রেক ঘটে। তবে প্রাত্যহিক জীবনে হাস্য ও সাহিত্যে হাস্যরস কিন্তু এক নয়। লৌকিক হাস্যের অনুভূতির সঙ্গে সাহিত্যে অভিহিত হাস্যের প্রবল ব্যবধান বর্তমান। সাহিত্যের হাস্য রস যুক্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রাত্যহিক জীবনে হাস্য কাব্যে স্থান পায় তখনি যখন লৌকিক হাস্য অলৌকিক হাস্যতে পরিণত হয়। মানুষের অন্তরে স্থায়ীভাব রূপে থাকা লৌকিক হাসভাব যখন কাব্যের আস্বাদ্যমানতা প্রাপ্ত হয়, তখনই প্রাত্যহিক জীবনের হাসভাব হাস্যরসে পরিণত হয়। হাস্যের প্রকৃত স্বরূপকে শারীরিক বৈশিষ্ট্য, কেউ মনস্তাত্ত্বিক, কেউ তত্ত্বগত, কেউ নান্দনিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হাস্যের প্রকৃত স্বরূপ কেমন তা বিশ্লেষণ করা খুব অসম্ভব। এছাড়া বর্ণলিপি শিল্প এবং চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই হাস্যের অনুকূল মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত W. A. Mason তাঁর *History of the Art of Writing* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সুতরাং শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে হাস্যরস অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

## ১:২ ভাব ও রস

কোন কিছু সৃষ্টির মূল হলো তার ভিত্তিভূমি। তেমনি রস সৃষ্টির মূল হলো ভাব। রস ও ভাব একে অপরের পরিপূরক। ভাবের দ্বারা যেমন রসের প্রকট হয় তেমনি রসের দ্বারা ভাবের প্রকট হয়। ভাব প্রসঙ্গে আদিকবি ভরত বলেছেন-

বিভাবেনাহৃতো যোঽর্থো হ্যনুভাবৈস্তু গম্যতে।

বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়ৈঃ স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ॥[২]

আবার তিনি আরও বলেছেন-

বাগঙ্গমুখরাগেণ সত্ত্বেনাভিনয়েন চ।

কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে।।[৩]

অর্থাৎ বিভাবের দ্বারা আহৃত ও অনুভাবের দ্বারা জ্ঞাত যে বিষয় যা কবির মনোভাব সম্পর্কে দর্শককে ভাবায় তাকে ভাব বলে। ভাব হলো মানুষের স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির বিকার। মানুষের অনুভূতি হলো, ভাবের জন্মস্থল। ভাব প্রধানত তিন প্রকার- বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাব। আচার্য ভরতমুনিপ্রণীত *নাট্যশাস্ত্রে* বলা হয়েছে ভাব থেকে রসের সৃষ্টি হয়। রসের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

রস ইতি কঃ পদার্থঃ। উচ্যতে- আস্বাদ্যত্বাত্।[৪]

রসের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আচার্য ভরতের উক্তি –

ন হি রসাদৃতে কশ্চিদপ্যর্থঃ প্রবর্ততে।

তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।।[৫]

সাহিত্য সমালোচক R. Mukherji ভরতের রসসূত্র সম্পর্কে বলেন একটি চমৎকার পানীয় তৈরি করা হয় অনেকগুলি উপাদানের মাধ্যমে। একইভাবে রসের তৈরি হয় বেশ কয়েকটি ভাবরসের সংমিশ্রণে। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি-

The explanation of the dictum, as furnished by Bharata himself is as ambiguous and vague as the text of dictum: it points out that, Rasa is referred to by the term Rasa, because it is realised by refined appreciators in the same way as a fine drink is relished, both having distinctive flavour of their own.[৬]

বিভাব সম্বন্ধে আচার্য ভরত *নাট্যশাস্ত্রে* বলেছেন-

বিভাবো বিজ্ঞানার্থা[৭]

অর্থাৎ বিভাব শব্দের অর্থ জ্ঞাপন। বিভাবের দ্বারা বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক এই তিন প্রকার অভিনয় জ্ঞাপিত হয় বলে, এর নাম বিভাব। এই বিভাবকে রস সৃষ্টির কারণ, নিমিত্ত, হেতু ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। বিভাব হলো ভাবরূপ কারণ। বিভাব দুই ভাগে বিভক্ত- আলম্বনবিভাব ও উদ্দীপনবিভাব। আলম্বন শব্দের অর্থ বিষয় বা চিত্তবৃত্তির বিষয়। অর্থাৎ যে বস্তুকে বা বিষয়কে অবলম্বন করে রসের সৃষ্টি হয় তাকে আলম্বনবিভাব বলে। আলম্বনবিভাব হলো চিত্তবৃত্তির প্রধান কারণ আর উদ্দীপনবিভাব হলো চিত্তবৃত্তিরহ সহকারী কারণ। যেসব বস্তু বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা অলৌকিক ভাবে রসের উদ্দীপনে সহায়তা করে তাকে উদ্দীপনবিভাব বলে। যে কোন ভাব উদ্দীপিত হতে গেলে তার উপযোগী পরিবেশ থাকা দরকার। পরিবেশের আনুকূল্য না পেলে ভাব উদ্দীপিত হতে পারে না। ইংরেজি সাহিত্যে এই দুটি বিষয়কে একসঙ্গে objective condition

বলা হয়ে থাকে। ভাবের পশ্চাতে যা প্রকাশ পায় তাকে অনুভাব বলে। আচার্য ভরত অনুভাব সম্বন্ধে বলেছেন-

বাগঙ্গাভিনয়েনেহ যতস্ত্বর্থোঽনুভাব্যতে।

শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তস্ত্বনুভাবস্ততঃ স্মৃতঃ।।[৮]

ব্যবহারিক জগতে মনুষ্য চিত্তে যখন কোন ভাব জন্ম নেয় তখন বিভিন্ন শারীরিক চেষ্টার দ্বারা তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। লৌকিক বা ব্যবহারিক জগতের এই জাতীয় আচরণ যদি কাব্যে বর্ণিত হয়, তখন তাকে অনুভাব বলে। ভাবরূপের কারণের যে বহিঃপ্রকাশ বা অভিব্যক্তি তা হলো অনুভাব। আলম্বনবিভাব ও উদ্দীপনবিভাবের দ্বারা স্থায়ীভাব অনুভাবের মাধ্যমে বাইরে প্রকাশিত হয়। অনুভাবের দ্বারা স্থায়ীভাব সহৃদয় দর্শক সমাজে অনুভাবিত হয়। মানুষের মনের ভাবের উদয় হলে যেসব কারণে তার প্রকাশ পায়, কাব্যে এসব কারণের কার্যকে অনুভাব বলা হয়। আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন-

লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ সোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।[৯]

বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক R. Mukherji আচার্য ভরতের মতকে অনুসরণ করে বলেছেন-

Bharata defines an Anubhāva as a factor, which indicates a permanent mood, imitated through words, gestures and organic changes, implying that.[১০]

অর্থাৎ যেগুলি ভাবের অভিমুখে চারণ করে তাদেরকে ব্যভিচারীভাব বা সঞ্চারীভাব বলে। রস সমূহে বিবিধ বস্তুর প্রতি চারণ হেতু তাকে ব্যভিচারীভাব বলে। ব্যভিচারীভাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

বিবিধমভিমুখ্যেন রসেষু চরন্তীতি ব্যভিচারিণঃ।[১১]

আবার আচার্য বিশ্বনাথ ব্যভিচারীভাব সম্পর্কে *সাহিত্যদর্পণে* বলেছেন বিশেষভাবে স্থায়ীভাবের আস্বাদ ব্যঞ্জকে সহায়তা সহকারে বিচরণ করে বলে একে ব্যভিচারীভাব বলে। স্থায়ীভাবের মধ্যে ব্যভিচারীভাব কখনো নিমগ্ন কখনো বা উন্মগ্ন হয়। ব্যভিচারীভাবের অপর নাম সঞ্চারীভাব। ব্যভিচারীভাব তেত্রিশ প্রকারের হয় যথা- নির্ব্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, উৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত, বিরোধ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, রমণ, ত্রাস, বিতর্ক ইত্যাদি। আচার্য বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণে* প্রসঙ্গে বলেছেন-

বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ।[১২]

এই ব্যভিচারীভাব রতি প্রভৃতি স্থিরভাবে বর্তমান থেকে প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবের দ্বারা রস পুষ্টির সহায়ক হিসেবে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। ব্যভিচারীভাব স্বভাবতই চঞ্চল। ইংরেজি সাহিত্যে এই ব্যপারকে Expression of Emotion বলা হয়। বিশিষ্ট সমালোচক R. Mukherji এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

...*Sacñaribhbāba* Or *byacharībhāba*, on the other hand is fleeting in character. And consequently, is comparable to a flash of lightning; it appears and disappears during the experience of a *Sthayibhāba.*[১৩]

হেতু স্থায়ীভাব হলো প্রভু সদৃশ ও বিভাব, অনুভাব, ও ব্যভিচারীভাব পরিবেষ্টিত স্থায়ীভাব রস নাম প্রাপ্ত হয়। রস প্রসঙ্গে আচার্য ভরত একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন –

যথা নরেন্দ্রো ৰহুজনপরিবারোঽপি স এব নাম লভ্যতে, নান্য সুমহানপি পুরুষঃ, তথা

বিভাবানুভাবব্যভিচারীপরিবৃতঃ স্থায়ীভাবো রস নাম লভতে।[১৪]

অর্থাৎ যেমন রাজা বহুলোক পরিবৃত হলেই তিনি রাজার নাম করেন, অন্য লোক অতি মহান হলেও তিনি রাজা বলে পরিচিত হন না, তেমন বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব পরিবেষ্টিত স্থায়ী ভাব রস নাম প্রাপ্ত হয়। আচার্য বিশ্বনাথ রসের পরিণতি প্রসঙ্গে বলেছেন অভিনব অলৌকিক আনন্দলাভই হলো রসের পরিণতি। এ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণে* বলেছেন-

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।

বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।।[১৫]

অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উদ্রেক হেতু এই রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময়, অন্য জ্ঞেয়বিষয়ের স্পর্শশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদতুল্য (আনন্দময়), এবং অলৌকিক বিস্ময়রূপ। আচার্য অভিনবগুপ্ত রস প্রসঙ্গে বলেছেন-

সংবেদনাখ্য (খ্যয়া) ব্যঙ্গ্যপরসংবিত্তিগোচরঃ।

আস্বাদনাত্মাঽনুভবো রসঃ কাব্যার্থ উচ্যতে।।[১৬]

সুখজনক কাব্যের অর্থই রস। আচার্য মম্মট বলেছেন স্থায়ীভাব বিভাবাদির দ্বারা অভিব্যক্ত হলে রস রূপে পরিণত হয়। রসের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন-

বিভাবা অনুভাবাস্তত্ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।

ব্যক্ত সঃ তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।।[১৭]

আচার্য ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্র* নামক অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে রসপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ তাঁর মতকে অবলম্বন করে রসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছেন। আবার সাহিত্য সমালোচক R. Mukherji বলেছেন-

Rasa, which is so well known in the circle of connoisseurs of dramatic art, Bharata places forth the famous dictum, which simply state that, Rasa is brought into bring through the combination of the factor, known as *Vibhāba*, *Anubhāba*, and *Vyabhicārībhāba*.[১৮]

রস বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত P. V. Kane বলেছেন-

Rasa primarily means taste or flavour or savour or relish, but metaphorically it means the emotional experience of beauty in poetry and drama.[১৯]

অর্থাৎ রসের অর্থ প্রাথমিকভাবে স্বাদ বা গন্ধ বা সুস্বাদ কিন্তু আলঙ্কারিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কাব্যের রূপসৌন্দর্যের আবেগময় অভিজ্ঞতা হলো রস। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের তথা রসশাস্ত্রের মূলে রয়েছে নান্দনিকতা। আচার্য ভরত হলেন রসশাস্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা। রসসূত্র নাট্যরস নামে পরিচিত। আচার্য ভরতের রসসূত্রে যে রসের কথা বলা হয়েছে সেটি নাট্যরসের কারণ। এই রস অভিনয় দর্শনকালে দর্শকগণ উপভোগ করে থাকেন। পণ্ডিত R. Mukherji এই বিষয়ে বলেছেন-

This observation makes it clear that, according to Bharata, Rasa is relished by a spectator only at the time of witnessing of a theatrical performance, a corollary to which is that, Rasa is not realised by a refined

reader, as he peruses a specimen of Poetic Art, or in other words, Rasa is incapable of being presented in forms of poetry, other than drama.[২০]

অন্যদিকে ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিকগণ মনে করেন আচার্য ভরতকৃত রসসূত্র কেবলমাত্র নাট্যের সাথে যুক্ত নয়, সাধারণভাবে রস কাব্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ধ্বনিবাদীদের এই মতকে স্বীকার করেছেন আচার্য অভিনবগুপ্ত। এ প্রসঙ্গে সমালোচক R. Mukherji বলেছেন-

Thus, Abhinavagupta relying on the observation of his venerable teachers' remarks, Rasa is experienced by a refined reader, even when a drama is read out of him, but as it is relished in the same way in which it enjoyed at the time of witnessing a theatrical performance, it is often referred to as Nāṭyarasa.[২১]

অর্থাৎ আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের মন্তব্যের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে বলেছেন রস একজন পরিমার্জিত পাঠকের দ্বারা অনুভব করা যায়, এমনকি যখন তাঁর কাছ থেকে একটি নাটক পাঠ করা হয়, তখন এটি সাক্ষ্যদানের সময় যেভাবে উপভোগ হয় সেভাবেই এটি উপভোগ করা হয়। একটি নাটকীয় রচনা আবৃত্তি শোনার সময়, কাব্যিক সংবেদনশীল একজন ব্যক্তি তার চরিত্রগুলিকে দৃশায়ন করেন।

লৌকিক জগতের রস ও অলৌকিক জগতের রস প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পৃথক। লৌকিক জগতের রস যখন কাব্য বা নাটকীয় উপস্থাপনার জন্য নিবেদিত হয়। তখন মানুষের হৃদয়ে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তার থেকে অলৌকিক জগতে রসের সৃষ্টি হয়। অলৌকিক রসের আস্বাদন সম্পর্কে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন যে রসাস্বাদন কালে প্রমাতা নায়ক-নায়িকাগণের মধ্যে

তৎকালিক অভিন্নভাব জন্মায় । উভয়ের মধ্যে ঐক্য অনুভূত হয় আর তখনই রসের আস্বাদ ঘটে। এ প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণে* বলা হয়েছে-

লোকোত্তরোচমত্কার-প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।

স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ।।[২২]

পণ্ডিত জগন্নাথ এই লোকোত্তর অর্থাৎ চমৎকারত্বাবচ্ছিন্ন আনন্দ বিশিষ্ট কাব্য জনিত চমৎকার আনন্দ বিশেষের কারণ পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানাত্মক ভাবনা বিশেষ রূপে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা।[২৩]

কাব্য পাঠকালে বা অভিনয় দর্শনকালে একটি বিশেষ ভাবনাকে আশ্রয় করে পাঠকের বা দর্শকের মন নির্দিষ্ট থাকে। বিষয়ান্তরের মূল কেন্দ্র থেকে সহৃদয় পাঠক বা দর্শক কখনোই বিচ্ছিন্ন হয় না। সন্নিবিষ্ট হয়ে সহৃদয় ব্যক্তিগণ একই চিন্তা করতে করতে তার মধ্যে চমৎকারের সন্ধান পায়। তখন সেইটি সত্য হয়ে ওঠে। সেই জগতের লোকেদের মধ্যে অনবরত চলাফেরা করতে করতে তাদের চিন্তাবিশেষের দ্বারা মন উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাদের সুখ-দুঃখের সহানুভূতি সহৃদয়ের মনে চমৎকারের সৃষ্টি করে। অলৌকিক জগতের রস প্রসঙ্গে ভারত তত্ত্ববিদ R. Mukherji বলেছেন-

The relish of Rasa is an extra-ordinary bliss, -not to be likened to ordinary pain or pleasure, and the mind is so entirely lost in it that; even when grief or horror is realised in such a state, pain is never felt.[২৪]

অর্থাৎ রস থেকে অসাধারণ আনন্দের সৃষ্টি হয়। যাকে সাধারণ বেদনা বা আনন্দের সাথে তুলনা করা যায় না। অলৌকিক আনন্দে সহৃদয়ের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়। লৌকিক জগতে দুঃখ ও ভয়াবহতা উপলব্ধি হলেও অলৌকিক জগতে সহৃদয়ের কাছে সেটি উপলব্ধ হয়না। লৌকিক বা ব্যবহারিক জগতের কারণ বা কার্য অলৌকিক কাব্যজগতে বিভাব ও অনুভাব। অলৌকিক কাব্যজগতের বিভাব ও অনুভাব সহৃদয় ও পাঠকের চিত্তে অলৌকিক রস সঞ্চার করে।

## ১:৩ তত্ত্ব গ্রন্থে হাস্যরস

আচার্য ভরত *নাট্যশাস্ত্রে* - শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত নাট্যে আটটি (মতান্তরে নয়টি) রস স্বীকার করেছেন-

শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।

বীভত্সাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।।[২৫]

আবার এই আটটি রসের মধ্যে শৃঙ্গার রৌদ্র, বীর, বীভৎস এই চারটি রসকে প্রধান রসের মর্যাদা দিয়েছেন। কারণ হিসেবে আচার্য ভরত বলেছেন যে এই চারটি প্রধান রসের অনুকৃতি ও কর্ম থেকে অন্য চারটি রস তথা হাস্য, করুণ, ভয়ানক, অদ্ভুত রসের সৃষ্টি হয়। শৃঙ্গারের অনুকৃতি হাস্য, রৌদ্রের কর্ম করুণ, বীরের কর্ম অদ্ভুত, বীভৎসের অনুকৃতি ভয়ানক। এ প্রসঙ্গে আচার্য ভরত বলেছেন-

শৃঙ্গারানুকৃতির্যা তু স হাস্যস্তু প্রকীর্তিতঃ।

রৌদ্রস্যৈব য যত্কর্ম জ্ঞেয়ঃ করুণো রসঃ।।

বীরস্যাপি চ যত্কর্ম সোঽদ্ভুতঃ পরিকীর্তিতঃ।

বীভত্সদর্শনং যচ্চ জ্ঞেয়ঃ স তু ভয়ানকঃ।।[২৬]

আচার্য ভরতের এই মতকে সমর্থন করে আচার্য অভিনবগুপ্ত স্বীকার করেছেন যে শৃঙ্গারের অনুকৃতি হাস্যরসের জনক। তিনি আরো বলেছেন অনুকৃতি দ্বারা যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় তার প্রথম আদি রস শৃঙ্গারে দৃষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

তেনৈবং যোজনা যা অনুকৃতিঃ স হাস্যো মতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ, এবং বিভাবকো হাস্য ইতি শেষঃ। তদ্ তথা শৃঙ্গার আদ্যঃ শৃঙ্গারবত্যনুকৃতিরিত্যর্থঃ।"[২৭]

অন্যতম সমালোচক K. P. Mishra আচার্য অভিনবগুপ্তের মতকে সমর্থন করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

It indicates *Śṛṅgāra* only in the form of illusion. In this way being their impropriety the illusion of *Karuṃa* (pathetic) and the illusion of *Śānta* (quietistic) become Hāsya (comic). [২৮]

অর্থাৎ শৃঙ্গারের অনুকৃতি থেকে যেমন হাস্যরসের সৃষ্টি হয় তেমনি করুণ এবং শান্তরসের অনুকৃতি থেকেও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। এছাড়া আচার্য অভিনবগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে শৃঙ্গারের অনুকরণ ছাড়াও অনান্য রসের অনুকরণ হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারে। শৃঙ্গারের রসাভাস থেকে যেমন হাস্যরসের সৃষ্টি হয় তেমনি অন্যান্য রসের থেকেও হাস্যরস সৃষ্টি হয়-

অনৌচিত্যপ্রবৃত্তিকৃতমেব হি হাস্যবিভাবত্বম্। তচ্চানৌচিত্য সর্বরসানাং বিভাবানুভাবাদৌ সম্ভাব্যতে।[২৯]

স্থায়ী চিত্তবৃত্তি ঔচিত্য অনুসারে প্রবৃত্ত না হলে এবং স্থায়ীভাবের স্বরূপে বা প্রকাশে কোন প্রকার অসঙ্গতি থাকলে তার থেকে রসাভাসের সৃষ্টি হয়। হাস্যের স্থায়ী অনুচিত হলে তাতে হাস্যরসাভাস সৃষ্টি হয়। হাস্যের রসাভাস হলে হাস্য বিভাব রূপে গৃহীত হয়। অন্যান্য রসের রসাভাস থেকে হাস্যরসের সৃষ্টি হলেও রসাভাস ও হাস্যরস কিন্তু এক নয়। হাস্যরসের সৃষ্টির ক্রম ও রসাভাসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য বিদ্যমান থাকলেও আচার্য অভিনবগুপ্ত উভয়ের মধ্যে মৌলিক ভেদের কথা বলেছেন। আর এখানেই অন্যান্য রসের আভাস থেকে হাস্যরস সৃষ্টি হলেও হাস্যকে একটি পৃথক রস হিসাবে স্বীকার করেছেন। হাস্যরসের চর্বণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন রস আস্বাদন কালে প্রথমেই বিভাবাদি সাধারণীকরণের দ্বারা স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। হাস্যরসের ক্ষেত্রে বিভাব প্রভৃতি যেসকল উপাদানের উপস্থিত আস্বাদন হয়ে থাকে এবং রসের আস্বাদন ও চরিত্র অনুযায়ী অনুভূত হয়। তাই *অভিনবভারতী* টীকায় বলা হয়েছে –

হাসে তু য আস্বাদঃ সোঽপি বিকৃতবেষাদীনাং, সামাজিকান্ প্রতি লোকবৃত্তেন হাসহেতুতেতি বিভাগসাধারণ্যদ্বারেণ তদেকস্বভাব এবেতি হাসাত্মকরসানাখ্যাচর্বণীয়ত্বাচ্চাস্য।[৩০]

*নাট্যদর্পণ* নামক অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র আচার্য অভিনবগুপ্তের মতকে স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন সকল রসের আভাস থেকে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় এমনকি হাস্যরসের আভাস থেকেও হাস্যরস জন্ম লাভ করে। এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন-

সর্বরসানাং চাভাস অনৌচিত্যপ্রবৃত্ত্বাদ্ হাস্যরসস্য কারণম্।..... হাস্যাভাসাদপি হাসো ভবতি।[৩১]

*কাব্যপ্রকাশের* রচয়িতা আচার্য মম্মটের মতে রসাভাস হলো অনৌচিত্য প্রবৃত্ত। এই হেতু তিনি হাস্যরসের আভাসকে স্বীকার করেছেন। আচার্য জগন্নাথ, আচার্য বিশ্বনাথ তাঁরা সকলে

হাস্যরসাভাসের কথা স্বীকার করেছেন। আচার্য শারদাতনয় এই প্রসঙ্গে হাস্যরসের প্রাপ্তিতে জটিলতার কথা বলেছেন সুতরাং হাস্যরসাভাস কেমন হবে তা নির্ণয় করা কঠিন। হাস্যরস ও রসাভাস এক নয় কিন্তু হাস্যরসের চর্বণায় অপর রসের বিলক্ষণ বিদ্যমান।

রস সংখ্যার ক্রমানুযায়ী আচার্য ভরত শৃঙ্গারের পর হাস্যরসকে স্থান দিয়েছেন। রস মাত্রই স্থায়ীভাবে সাথে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব সংযুক্ত হয় । তাই হাস্যরসের স্থায়ীভাব হলো হাস-

অথ হাস্যো নাম হাসস্থায়িভাবাত্মকঃ।[৩২]

আচার্য অভিনবগুপ্ত হাস্যরস প্রসঙ্গে বলেছেন-

রঞ্জনোন্মাদানুবিরুদ্ধশ্চিত্তস্য বিকাসো হাসঃ।[৩৩]

হাস্যরসের দেবতা প্রমথ। হাস্যের আশ্রয় বিকট অভিনয় যা প্রমথগণের পক্ষে স্বাভাবিক। হাস্যরসের বর্ণ সিত বা শ্বেত। হাসিতে দন্তরুচিকৌমুদীর প্রকাশ ঘটে। সাধারণত দাঁতের রং সাদা তাই হাস্যরসের বর্ণ সাদা বা শ্বেত। আচার্য ভরতের মতানুসারে হাস্যরসের বিভাব (কারণ) গুলি হলো- বিকৃতবেষ, অলঙ্কার, ধৃষ্টতা, লোভ, কুহক, অসৎ প্রলাপ (অলীক উক্তি এবং মিথ্যা কথোপকথন), বিকলাঙ্কদর্শন, দোষখ্যাপন (যার মধ্যে যে দোষ বর্তমান নেই তার কীর্তন) ইত্যাদি। এই রসের অনুভাব (কার্য) গুলি হলো- ওষ্ঠ দংশন, নাসিকার কম্পন (নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়), গণ্ড স্থলের কম্পন (গণ্ডদেশ কখনো ঈষৎ বিকশিত অর্থাৎ উৎফুল্ল হয় আবার কখনো আকুঞ্চিত অর্থাৎ সংকুচিত হয়), নেত্রের বিস্তার (নেত্রের বিস্তার কখনো কটাক্ষ বেশ বোধযুক্ত, কখনো উৎফুল্ল ভাব যুক্ত, কখনো নেত্র উত্তেজিত ও অশ্রু যুক্ত হয়), ঘর্ম, মুখরাগ (মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে থাকে), পার্শ্বদেশের হস্ত স্থাপন, দন্ত কখনো লক্ষিত হয় না আবার কখনো লক্ষিত হয়, গলার স্বর

কখনো শোনা যায় না আবার কখনো শোনা যায়, কখনো তা মধুর স্বর যুক্ত হয়ে থাকে, আবার কখনো স্বর বিকৃষ্ট ও উদ্ধতভাব ধারণ করে, মস্তক ও গ্রীবা কখনো নিকুঞ্চিত কখনো বা উৎকম্পিত হয় ইত্যাদি। ব্যভিচারীভাব হলো- অবহিত্থ (বাহ্য আকারের প্রচ্ছাদন), আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, প্রবোধ, অসূয়া ইত্যাদি। আচার্য বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণে* হাস্যরস প্রসঙ্গে যে বিবরণ দিয়েছেন তা আচার্য ভরতের মতানুসারী। বিকৃত আকার বাগ্-বেশ-চেষ্টা দেখে কোন ব্যক্তি যদি হাসে, সেই ব্যক্তিটি হয় হাস্যরসের আলম্বনবিভাব, তার শারীরিক চেষ্টা হলো উদ্দীপনবিভাব। চক্ষু সঙ্কোচন, মুখের হাস্য ভাব ইত্যাদি হলো অনুভাব। নিদ্রা, আলস্য, অবহিত্থা ইত্যাদি হলো ব্যভিচারীভাব। শারদাতনয় *ভাবপ্রকাশন* অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে হাস্যরসের বিভাবাদি প্রসঙ্গে বলেছেন বিকটাকার বেশ, বিকৃত আচারণ ও ক্রিয়া, বিকৃত বাক্য, ধৃষ্টতা, লোভ, চাপল্য, বিকৃত অভিনয়, বিকৃত অঙ্গাবলোকন, কুহক, অসৎ প্রলাপ, দোষ কথন ইত্যাদি থেকে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। শঙ্কা, ত্রপা (লজ্জা), চপলতা, শ্রম, গ্লানি, অপত্রপা (নির্লজ্জতা), হর্ষ, প্রবোধ, অবহিত্থ ইত্যাদি হলো হাস্যের ব্যভিচারীভাব। আচার্য রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র হাস্যরস প্রসঙ্গে বলেছেন বিকৃত-আচার-জল্প-অঙ্গ-আকল্প-বিস্মাপন প্রভৃতি হাস্যরসের বিভাব। নাসা স্পন্দন, অশ্রুপাত, জঠর গ্রহণাদি ইত্যাদি অনুভাব। সংস্কৃত সাহিত্যে আচার্য ভরত এবং তাঁর অনুগামীরা মানুষের প্রবৃত্তিকে স্থায়ীভাবে রূপে কল্পনা করেছেন ইংরেজি সাহিত্যে এই প্রবৃত্তিকে instinctive dominant বলে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের হাস্যরসের কথা বলতে গিয়ে মনস্তত্ত্ববিদ A. A. Macdonell মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে আঠারো প্রকার স্থায়ীভাবের কথা বলেছেন। এবং সেখানে তিনি Instinct হিসাবে Laughter এর কথা বলেছেন। সেখানে তিনি Laughte এর স্থায়ীভাব রূপে Amusementর[৩৪] কথা বলেছেন। প্রতীচ্যের মনস্তত্ত্ববিদ J. Drever হাস্যকে মানসীক্রিয়া রূপে অভিহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

..... the insinuation provoked by laughter finds an echo in our more primitive self-repressed by the customs and taboos of culture and civilization and it is the sudden and temporary freeing of the primitive natural man that produce the laughter.[৩৫]

তাঁর এই মতকে সমর্থন করেছেন পাশ্চাত্ত্যের মনস্তত্ত্ববিদ J. Sully। হাস্যরসের উপাদান হিসেবে ফরাসি দার্শনিক H. Bergson তাঁর *Laughter* গ্রন্থে মানুষের মধ্যে যন্ত্র ভাব (mechenism), সম্প্রসারণ অক্ষমতা (Inlassticity), স্বয়ংক্রিয়তা (Automation), পৌনঃপুনিকতা (Repitition), বৈপরীত্য (Inversion), দ্ব্যর্থবোধকতা (Reciprocal inversion of serious) ইত্যাদিকে চিহ্নিত করেছেন। পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত I. Kant মতে উত্তেজনার অব্যবহিত পরে যে শৈথিল্যের (relaxation of a tention) সৃষ্টি হয় তার থেকেই হাস্যের সৃষ্টি হয়। হাস্যরসের অনুভাব গুলির বহিঃপ্রকাশের সাথে শারীরিক পরিবর্তন (মুখ, চোখ, নাক, নাসারন্ধ্যে, ওষ্ঠ ইত্যাদি বিকৃতি) সূচিত হয়। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের এই মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক G. Meredith। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক J. Sully এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

..... slight lifting of the corners of the mouth, the raising of the upper lip, which partially uncovers । teeth and the curving of the furrows betwixt the corners of the mouth and the nostrils (the nasolabial furrows) which these movement involve. It these must be added the formation of wrinkles under the eyes a most characteristic part of the expression which is a further result of the first movement.[৩৬]

অর্থাৎ হাস্যের ফলে মুখের কোণে সামান্য উত্তোলন, উপরের ওষ্ঠের উত্থান, যা আংশিকভাবে উন্মোচিত হয়। মুখের কোণে এবং নাকের ছিদ্রের মধ্যে দাঁত এবং সেই মধ্যবর্তীস্থানে প্রসারণ সম্প্রসারণ হয়ে থাকে। এছাড়া হাস্যের ফলে অক্ষিগোলকের চারপাশে আকুঞ্চন এবং প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্ত্যের মনীষী S. Leacock উক্তিতে একই প্রতিধ্বনির কথা ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

The face of the man who is listening begins to be visibility affected. There is a tightening of the maxillary muscles, together with a relaxation of the lips and tongue. The area at the east and west sides of the eyes becomes puckered in a peculiar way, and in extreme cases there is a distinct wobbing of the ears. In other words, the man is smiling .... .[৩৭]

অর্থাৎ ব্যক্তির ওষ্ঠ এবং জিহ্বার শিথিলতার সাথে চোয়ালের পেশীগুলির শক্ত হওয়া এবং অক্ষির ও কর্ণের পরিবর্তনের মাধ্যমে হাস্যরস সূচিত হয়।

## ১:৪ তত্ত্ব গ্রন্থে হাস্যরসের ভেদ

আচার্য ভরত হাস্যরসের প্রকারভেদ সম্পর্কে *নাট্যশাস্ত্রে* হাস্যরসের দুই প্রকারভেদের কথা বলেছেন-

দ্বিবিধাশ্চয়মাত্মস্থঃ পরস্থশ্চঃ।[৩৮]

অর্থাৎ হাস্যরস **আত্মস্থ** বা **আত্মগত**, **পরস্থ বা পরগত** ভেদে দুই প্রকার। কোন ব্যক্তি যখন স্বয়ং হাসেন তখন তাকে **আত্মস্থ** বা **আত্মগত** হাস্যরস বলে আর যখন কোন ব্যক্তি অপরকে হাসান

তখন তাকে **পরগত** বা **পরস্থ** হাস্যরস বলে। এই প্রসঙ্গে আচার্য অভিনবগুপ্ত হাস্যরসকে সংক্রামক বলে অভিহিত করেছেন। লৌকিক ব্যবহারে কখনো কখনো এরূপ দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি হাস্যকর বিভাবাদি দর্শন করে হাস্য করে থাকেন। অন্য কোন ব্যক্তি স্বয়ং ওই হাস্যজনক বিভাবাদি দেখতে না পেলে কেবলমাত্র পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে হাস্য করতে দেখে ওই ব্যক্তি হাস্য করে থাকেন। আবার কোন কোন স্থানে এরূপ দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি নিজে হাস্যকর বিভাবাদি দেখেও অতি কষ্টে গাম্ভীর্যের কারণে হাস্যকে চেপে ধরে রাখেন কিন্তু অপরকে হাস্য করতে দেখে তখন ওই ব্যক্তিকে নিজের হাস্যকে প্রকাশ করে থাকেন। সুতরাং হাস্য স্বভাবত সংক্রামক। আচার্য অভিনবগুপ্ত হাস্যরসকে অম্ল রসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

যথাঽম্লাদিভিমাদিরসস্বাদঃ সঙ্ক্রমণ স্বভাবোঽন্য.....হাসঃ স্বভাবতঃ সঙ্ক্রমশীল ইতি ভূয়িষ্ঠতা কাষ্ঠা।[৩৯]

আবার স্ত্রী ও নীচ পাত্রগতভেদে হাস্যরস ছয় প্রকার-

স্ত্রীনীচপ্রকৃতাবেষ ভূয়িষ্ঠং দৃশ্যতে রসঃ। ষড়ভেদাশ্চাস্য ।[৪০]

ক: উত্তম প্রকৃতির পাত্রগণ দ্বারা **স্মিত** ও **হসিত** হাস্যরস প্রযুক্ত হয়

খ: মধ্যম প্রকৃতির পাত্রগণ দ্বারা **বিহসিত** ও **উপহসিত** হাস্যরস প্রযুক্ত হয়

গ: অধম প্রকৃতির পাত্রগণ দ্বারা **অপহসিত** ও **অতিহসিত** হাস্যরস প্রযুক্ত হয়।

আচার্য শারদাতনয় *ভাবপ্রকাশন* নামে অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে হাস্যরসকে 'উপরঞ্জক রস' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি আশ্রয় ভেদে হাস্যরসের দুই প্রকার ভেদের কথা বলেছেন যথা- **স্বাশ্রয়** ও **পরাশ্রয়** এবং প্রকৃতি ভেদে হাস্যরসের ছয় প্রকারভেদ স্বীকার করেছেন যথা-

ক: বরিষ্ঠ পাত্র গণদ্বারা প্রযুক্ত **স্মিত** ও **হসিত** হাস্যরস

খ: মধ্যম পাত্র গণদ্বারা প্রযুক্ত **বিহসিত** ও **উপহসিত** হাস্যরস

গ: নীচপাত্র গণদ্বারা প্রযুক্ত **অপহসিত** ও **অতিহসিত** হাস্যরস

আবার বেশভেদে হাস্যরস তিনপ্রকার- **বাক্, অঙ্গ, নেপথ্য**।

আলঙ্কারিক রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র *নাট্যদর্পণ* নামক অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে প্রকৃতি ভেদে হাস্যরস অনুরূপ ছয় প্রকারের কথা বলেছেন। যেমন- জ্যেষ্ঠ প্রকৃতির হাস্য দুই প্রকার- **স্মিত, হস বা হসিত**। মধ্য প্রকৃতির হাস্য দুই প্রকার- **বিহাস (বিহসিত)**, **উপহাস (উপহসিত)**। নীচ বা অধম প্রকৃতির হাস্য দুই প্রকার- **অপহাস (অপহসিত)**, **অতিহাস (অতিহসিত)**। আলঙ্কারিক সাগরনন্দীর মতে *নাটকলক্ষণ-রত্নকোষ* নামে অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে হাস্যরসের ছয়প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন যেমন- **স্মিত**, **হসিত**, **বিহসিত**, **উপহসিত**, **অতিহসিত**, **অপহসিত** ইত্যাদি যা আচার্য ভরতের *নাট্যশাস্ত্রের* অনুরূপ। শিঙ্গভূপালের *রসার্ণব-সুধাকরে* হাস্যরসের দুইপ্রকার ভেদের কথা বলেছেন- **আত্মস্থিতি** ও **পরস্থিতি**। এক্ষেত্রে শিঙ্গভূপাল আচার্য ভরতের অনুগামী হলেও আচার্য অভিনবগুপ্তের **আত্মস্থ** ও **পরস্থ** বিভাগের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আচার্য বিশ্বনাথের *সাহিত্যদর্পণ* নামক অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে হাস্যরসকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন যেমন- **স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অতিহসিত, অপহসিত**। তিনি *নাট্যশাস্ত্রে* উক্ত **উপহসিত** হাস্যরসের পরিবর্তে **অবহসিত** হাস্যরস নামটিকে গ্রহণ করেছেন।

## ১:৫ হাস্যরস সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য কারণ

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের আলঙ্কারিগণের মতে হাস্যরস উৎপত্তি ক্ষেত্রে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের প্রয়োজন হয়। এই তিন প্রকার ভাবের সমন্বয়ে মনে হাসভাব জাগ্রত হলে শারীরিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আচার্য ভরতের মতানুসারে ওষ্ঠস্পন্দন, নাসাস্পন্দন, কপোলস্পন্দন, দৃষ্টির বিকাশ অথবা নিমীলন, অক্ষির ইষৎ কুঞ্চন, স্বেদপ্রকাশ, মুখের রক্তিমা, অশ্রুর আগমন, হস্ত সঞ্চালন দ্বারা পার্শ্ব গ্রহণ, ভ্রুকুটি পাতন, নাসিকা বিকুঞ্চন, পরিবর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শারীরিক পরিবর্তন লক্ষিত হয়ে থাকে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত S. Leacock, J. Sully, S. Freud হাস্যরসের মাধ্যমে শারীরিক পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্ববিদ S. Freud তাঁর ত্রাণতত্ত্বে সংক্ষিপ্ত আকারে বলেছেন হাস্য উত্তেজনা এবং মানসিক শক্তি প্রকাশ করে, যার ফলে হাস্য নিজের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী।

### ১:৫:১ অসঙ্গতি

হাস্যরসের উৎপত্তিকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যেমন হাস্যের উদ্রেক হয় তেমনি অনুভূতির মাধ্যমেও হাস্যের আভাস পরিলক্ষিত হয়। হাস্যরস বিকাশের ক্ষেত্রে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে থেকে সপ্তদশ শতকে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে হাস্যরসের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস বিকাশের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক বিচার সক্ষম ও তৎপর হয়েছে। হাস্যরস সৃষ্টির অলৌকিক কারণ অর্থাৎ বিভাব তার পশ্চাতে বিভিন্ন প্রকার বিকৃতি, বৈষম্য, অনুকৃতি, বাক্যগত বৈপরীত্য এইগুলি বর্তমান। এইগুলি মানবসত্তার মধ্যে দৃশ্যমান হয়। মানবসত্তার অন্তর্গত স্বভাবের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার বিচ্যুতি

অর্থাৎ অসঙ্গতি সেটাই হাস্যরসের মূল কারণ। মানব জীবন প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল কিন্তু পরিবর্তন মাত্রই অসঙ্গতির সৃষ্টি করে এমনটা নয়। যে পরিবর্তন যুগ, দেশ, কাল, বয়স প্রভৃতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেটাই অসঙ্গতি বা বৈষম্যের জনক। দেশ-কাল-বয়স-বর্ণ ইত্যাদি ভেদে অসঙ্গতির উদ্ভব হয়, তার থেকেও হাস্যরস সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে বালকেরা যদি বৃদ্ধের অনুকরণ কিংবা বৃদ্ধেরা যদি শিশুর অনুকরণ করে তাহলে এক্ষেত্রে যে অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় তা বয়সের বিপরীত বৈপরীত্য অসামাঞ্জস্য চিত্তে যে আলোড়নের উদ্ভব হয় তার থেকেই হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন আচার্য ক্ষেমেন্দ্র *ঔচিত্যবিচারচর্চায়* ঔচিত্য বা সঙ্গতিকে রসের মূল বলে স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে অসঙ্গতি থেকে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় তা যথা যুক্ত। আচার্য অম্লরাজ *রসরত্নপ্রদীপিকা* নামক অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে বৈষম্য জনিত চেতনার বিকৃতি থেকেই হাস্যরসের উদ্ভবের কথা স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ বৈষম্য থেকেই হাস্যের উদ্রেক ঘটে। সুতরাং হাস্যরস সৃষ্টির প্রধান কারণ হলো ব্যবহারের অসঙ্গতি। আচার্য অভিনবগুপ্ত *অভিনবভারতী*তে হাস্যরসের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন-

সত্ত্বাভাবো হি হাস্য।[৪১]

শ্রেষ্ঠত্ব মূলক মনোভাব, ঈর্ষা প্রণোদিত মনোভাব, বিদ্বেষমূলক মনোভাব থেকে অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। যেমন পরাজিত শত্রুকে দেখে বিজয়ীর হাস্য, অবস্থা বিশেষে অপরের দুঃখ দর্শনে হাস্য ইত্যাদি কারণবশত মানুষের চেতনার অন্তঃস্থলে অসঙ্গতির বা বৈষম্য সৃষ্টি করে যার থেকে হাস্যরসের বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ আপন উৎকর্ষ বোধ হতে মানুষের চিত্তে এক প্রকার পরিহাসানুকুল মনোভাব জাগ্রত করে তার থেকে বৈষম্য জনিত কারণে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। অসঙ্গতির আবেদন চিত্তভূমির নিম্নস্তরের প্রতি। সেই জন্য অসঙ্গতি সৌন্দর্যবোধ, কারুণ্য প্রভৃতি

মনোভাবকে জাগ্রত না করে কৌতুক, উপহাস প্রকৃতিকে জাগ্রত করে থাকে। এই মতকে সমর্থন করে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত W. Hazlitt বলেছেন-

One rich source of the ludicrous is distress with which we cannot sympathise from its absurdity or humanity.[৪২]

## ১:৫:২ কৌতূহল

হাস্যরসের মাধ্যমে যেমন অসাধারণ মানসিক আনন্দের প্রকাশ ঘটে, তেমনি মানুষের চিত্তে কৌতূহল প্রকাশিত হয়। হাস্যের অনুকূল চিত্র বৃত্তি থেকে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণ* নামক অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে বলেছেন-

বিকৃতাকার বাগ্‌বেশ চেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ ভবেত্।[৪৩]

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৌতূহল প্রসঙ্গে নতুনত্বের লালসা এই কথাটি প্রয়োগ করেছেন। নতুনত্বের লালসা বা চমক থেকে আমাদের মনে যে আকস্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তা থেকেই হাস্যরসের সৃষ্টি। হাস্যরসকে ক্ষণস্থায়ী কৌতুকের প্রকাশক রূপে অভিহিত করেছেন। কৌতূহল থেকেই যে নতুনত্বের চমক আর তা থেকে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় এই বিষয়টিকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত B. Croce স্বীকার করেছেন। সকল প্রকার বিকৃতি, বৈষম্য, অনুকৃতি ও বাক্যগত বৈপরীত্য হলো হাস্যরস সৃষ্টির কারণ। পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত Aristotle এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

The ludicrous, he says, consists in some defect or ugliness which is not painful or destructive. To take an obvious example the comic mask is ugly and distorted, but does not imply pain.[৪৪]

তাই বলা যেতে পারে স্বাভাবিক এবং গতিশীল জীবনে অস্বাভাবিক যে ব্যবহার তা মানবজীবনে স্বীকৃত নয় এবং তার থেকে সকল প্রকার অসঙ্গতির সৃষ্টি। অসঙ্গতি জড় প্রকৃতির মধ্যেও বিদ্যমান কিন্তু অসঙ্গতি যখন চেতন পদার্থে দৃষ্ট হয় তখনই হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। একটি সমভূমি হতে পারে সুন্দর কমনীয় এবং মহৎ, অথবা নগণ্য এবং কুৎসিত; এটা কখনই হাস্যকর হবে না। এই মতকে পাশ্চাত্ত্যের দার্শনিক H. Bergson স্বীকার করে বলেছেন-

The first point to which attention should be called is that the comic does not exist outside the pale of what is strictly HUMAN. A landscape or insignificant and ugly; it will never be laughable.[৪৫]

হাস্যরসকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে অনুভূতিমূলক বিচার একান্ত প্রয়োজন। অনুভূতি রূপ শক্তিকে কেন্দ্র করে সামাজিক জীবন আবর্তিত হয়। হাস্যরস প্রধান ভাবে আলস্য, দৌর্বল্য, অসঙ্গতি, অহঙ্কার এবং শ্রেষ্ঠত্ব, অভিমান প্রভৃতিকে আশ্রয় করে থাকে । প্রাচীন আলঙ্কারিকের এই মতকে সমর্থন করে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত W. Hazlitt বলেছেন-

Wit and humour appeal to our indolence, our vanity, our weakness and insensibility; serious and impassioned poetry appeals to our strength our magnanimity, our virtue and humanity.[৪৬]

অর্থাৎ চাতুর্যপূর্ণবুদ্ধি এবং হাস্যরস সহৃদয়ের অলসতা, অসারতা, দুর্বলতা এবং অসংবেদনশীলতার প্রতি আবেদন করে থাকে।

### ১:৫:৩ অনৌচিত্য

অনৌচিত্য হাস্যরসের জনক। দেশ, বেশ, ভাষণ প্রভৃতি অনৌচিত্য এক রসের বিভাবকে অন্য রসের বিভাবে পরিণত করে তার থেকে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। এই অনৌচিত্য বা অসঙ্গতির মধ্যে অসম্পূর্ণতা সৃষ্টি করে হাস্যের উদ্রেক ঘটায়। রস প্রধান কাব্যে ঔচিত্য কাব্যের জীবন স্বরূপ কিন্তু হাস্যরস প্রধান কাব্যে অনৌচিত্য কাব্যের আত্মা অর্থাৎ অনৌচিত্য হাস্যর পক্ষে উচিত। অনৌচিত্য সকল রসের বিঘ্নকারক হলেও হাস্যরসের ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ স্বরূপ এবং হাস্যরসাত্মক কাব্যের প্রাণস্বরূপ। অনৌচিত্য যে হাস্যের উদ্রেক ঘটায় এই প্রসঙ্গে আলঙ্কারিক ক্ষেমেন্দ্র একটি সুন্দর উদাহরণের প্রতিস্থাপন ঘটিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যদি কেউ কণ্ঠে মেঘলা পরিধান করে, নিতম্বে মুক্তাহার ধারণ করে, হস্তে নুপুর এবং চরণে কেয়ূর বন্ধন করে ও প্রণত ব্যক্তির কাছে শৌর্য প্রকাশ এবং শত্রুরকাছে করুণা প্রকাশ এরূপ ঘটনা নিশ্চিতভাবে হাস্যাস্পদ। আচার্য ভরত হাস্যরস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে শৃঙ্গারের অনুকরণ অর্থাৎ বিকৃত, বেশ, বপু প্রভৃতি বিভাব দ্বারা শৃঙ্গার রসের অনুকরণ হাস্যরসের সৃষ্টি করে-

শৃঙ্গারানুকৃতির্যা তু হাস্য ইতি।[৪৭]

অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের অনুকরণ জনিত ব্যাপারের ফলে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় সেই ব্যাপারটি শৃঙ্গার রসের পক্ষে অনুচিত অর্থাৎ উচিত নয়। আর এই অনৌচিত্য থেকে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

কোন বৃদ্ধ যদি যুবকের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করে তরুণীর কাছে নিজের প্রণয় নিবেদন করেন, তাহলে সেই স্থলে আদি রস তথা শৃঙ্গার রসের পরিবর্তে হাস্যরসের উদ্ভব হয়। বৃদ্ধের যুবকের ন্যায় আচরণের অনুকরণের মাধ্যমে যে অনৌচিত্যের সৃষ্টি হয়েছে হাস্যরসের উদ্দীপক। অনুকরণ যে হাস্যরসের সৃষ্টি করে এ প্রসঙ্গে আচার্য ভরত বলেছেন-

পরচেষ্টানুকরণাদ্ধাসঃ সমুপজায়তে।[৪৮]

অর্থাৎ পরের আচরণ অনুকরণের মাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার পাশ্চাত্ত্যের ফরাসি দার্শনিক H. Bergson আচার্য ভরতের মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করে অনুকরণ যে হাস্যরসের সৃষ্টি করে সে প্রসঙ্গে বলেছেন-

A deformity that may become comic is a deformity that is normally build person could successfully imitate."[৪৯]

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণ হাস্যরসকে অন্যান্য রস থেকে একটু আলাদা ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্রে হাস্যরসের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য হেতু অন্যান্য রস অপেক্ষা এই রসটি একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে।

## ১:৬ তত্ত্ব গ্রন্থে হাস্যরসের নিদর্শন

কাব্যে তত্ত্বগত দিক দিয়ে যে সকল ক্ষেত্রে হাস্যরস লক্ষণীয় সে বিষয়ে আলোকপাত করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দৃশ্য কাব্যের অন্তর্গত রূপকের দশটি ভেদের মধ্যে প্রহসনে একমাত্র হাস্যরস অঙ্গীরস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন-

ভবেত্ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্..... অঙ্গী হাস্যরসস্তত্র বীথ্যঙ্গানাং স্থিতির্ন বা।[৫০]

প্রহসণে নিম্ন পাত্র সমূহ যেমন বিট, ধূর্ত, শকার, ভণ্ড, তপস্বী, বিদূষক প্রভৃতি প্রধান চরিত্র রূপে গণ্য হবে। মহাকবি কালিদাস রচিত *অভিজ্ঞানশকুন্তলা* নাটকে বিদূষক মাধব্য হাস্যের প্রধান আশ্রয়। তার অঙ্গভঙ্গবিকল দেহ সংস্থান, মৃগয়াশীল রাজার বয়স্যভাব প্রাপ্তিতে নির্বেদ, রাজার শকুন্তলা ব্যসনের প্রতি বিদ্রূপ, রাজার বিষাদে সহানুভূতিসম্পন্ন দরদী সখারূপে তার অপার কারণ্যের মধ্যে হাস্যরস বিদ্যমান। এই অধম প্রকৃতির চরিত্রের মধ্যে নায়কোচিত গুণাবলী কিরূপে সম্ভব। আচার্য অভিনবগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে অধম প্রকৃতির চরিত্রের মধ্যে নায়কত্ব নায়কোচিত গুণের দ্বারা আসা সম্ভব নয় কিন্তু গৌণভাবে প্রবন্ধ শরীরের যে ফল তার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে গৌণ ভাবে তাতে হাস্যের সৃষ্টি করে। হাস্য ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিকরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু অভিনয়কালে কুশীলবগণ নীচপাত্রের কেবল অনুকরণ করে থাকে। এই অনুকরণ বা অনুকৃতি হাস্যরস সৃষ্টির প্রধান কারণ। আচার্য অভিনবগুপ্ত প্রহসনে হাস্যরসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন –

উৎসৃষ্টিকাঙ্কপ্রহসনভাণাস্তু করুণহাস্যবিস্ময়প্রধানত্বাদ্রঞ্জকরসপ্রধানাঃ।[৫১]

অর্থাৎ প্রহসন রঞ্জকত্ব প্রধান হওয়ায় চিত্তকে বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত করে কিন্তু কোন স্থায়ী আনন্দ বা সুখের সৃষ্টি করে না। প্রহসন এবং ভাণে করুণ, হাস্য, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব প্রধান হওয়ার কারণে কেবলমাত্র চিত্তরঞ্জক। সাময়িক চিত্তরঞ্জনার কারণে অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন স্ত্রীলোক ও নীচপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ তার থেকে আনন্দ লাভ করে থাকেন। এজন্য *নাট্যদর্পণ* নামক অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে-

প্রহসনেন চ বালস্ত্রী মূর্খাণাং হাস্যপ্রদর্শনেন নাট্যে প্ররোচনা ক্রিয়তে।[৫২]

*নাট্যদর্পণে* ভাণকেও অনুরঞ্জক হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে এবং সেখানে প্রধান বা অঙ্গী রস হিসাবে শৃঙ্গার ও বীর রসের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

ভাণঃ প্রধানশৃঙ্গারবীরো মুখনির্বাহবান্।

একাঙ্কো দশলাস্যাঙ্গঃ, প্রায়ো লোকানুরঞ্জকঃ।।[৫৩]

আচার্য অভিনবগুপ্তের মত অনুযায়ী শৃঙ্গার রসের আভাস থেকে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল তাঁর *সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস* গ্রন্থে বলেছেন যে, রূপকে শৃঙ্গার রস অঙ্গী হলে হাস্যরস অঙ্গ হতে পারে আর সেহেতু প্রকরণ, সমবকার এবং ঈহামৃগ প্রভৃতিতে শৃঙ্গারাভাস প্রদর্শন হেতু হাস্যরস সৃষ্টি হতে পারে। অলঙ্কারশাস্ত্রের তত্ত্বগ্রন্থে হাস্যকে নীচপাত্রগত বলা হলেও কবি ভাসের *স্বপ্নবাসবদত্তা* নামক দৃশ্যকাব্যের তৃতীয় অঙ্কে পদ্মাবতী ও বাসদত্তার কথোপকথনে, মহাকবি কালিদাস রচিত *অভিজ্ঞানশকুন্তলা* নাটকের প্রথম ও তৃতীয় অঙ্কে প্রিয়ংবদা ও শকুন্তলার কথোপকথনে উচ্চপাত্রপ্রযুক্ত হাস্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। ঘটনাজাত, পরিবেশজাত, চারিত্রিক অসঙ্গতিজাত, বাচিক-বিকৃতিজাত হাস্যের নিদর্শন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

বীথী নামক রূপকের মধ্যে তেরোটি অঙ্গ বিদ্যমান যথা- উৎঘাত্যক, অবলগিত, প্রপঞ্চ, ত্রিগত, ছল, বাক্‌কেলি, অধিবল, গণ্ড, অবস্যন্দিত, নালিকা, অসৎ প্রলাপ, ব্যাহার, মৃদব ইত্যাদি। ঐ সকল অঙ্গকে বিশ্লেষণ করলে বীথীর কয়েকটি অঙ্গের মধ্যে হাস্যের বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলির নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

- প্রপঞ্চ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণ* অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে বলেছেন-

মিথো বাক্যমসদ্ভূতং প্রপঞ্চো হাস্যকৃন্মতঃ।[৫৪]

অর্থাৎ মিথ্যা দোষ উদ্ঘাটনের দ্বারা পরস্পরের স্তুতিকে প্রপঞ্চ বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে মহাকবি কালিদাস রচিত *বিক্রমোর্বশীয়* ত্রোটকে বিদূষক ও চেটীর পরস্পর আলাপের মধ্যে প্রপঞ্চ দৃশ্যমান। প্রপঞ্চে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে পরস্পর দুই ব্যক্তির নিকট রহস্য ভেদ করবার নিমিত্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়কে আবর্তিত করে চলে। এই হাস্যরসের মধ্যে স্বল্প পরিসরে কৌতুকের বিষয় বর্তমান কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না।

- ছল নামক বীথীর অঙ্গে হাস্যরস বিদ্যমান-

প্রিয়াভৈরপ্রিয়ৈর্বাক্যৈর্বিলোভ্যচ্ছলনাছলম্"[৫৫]

অর্থাৎ অপ্রিয় হলেও আপাতত ভাবে যা প্রিয় বলে প্রতীয়মান হয় এরূপ বাক্যের দ্বারা কাউকে প্রলুব্ধ করে প্রতারণা করার নাম ছল। ছল প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তিনি আরো বলেছেন বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন অভিপ্রায় সাধনের জন্য বঞ্চনা, হাস্যজনক ও ক্রোধজনক বা প্রতারণাজনক বাক্যই ছল-

অন্যে ত্বাহুশ্চলং কিঞ্চিত্ কার্য্যমুদ্দিশ্য কস্যচিত্।

উদীর্যতে যদ্বচনং বঞ্চনাহাস্যরোষকৃত্।।[৫৬]

অর্থাৎ ছল জাতীয় অঙ্গে যে হাস্য পরিলক্ষিত হয় তা প্রকৃতভাবে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত উক্তির দ্বারা বিদগ্ধজনের হাস্য ও অপরের ক্রোধের সৃষ্টি করে। কারো কোন অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যে বঞ্চনা, হাস্যরসের জনক যে বাক্য বলা হয় তাকে বলে ছল। সুতরাং এই জাতীয় হাস্যের মধ্যে অর্থের গভীরতা ও বুদ্ধির চাতুর্য্য লক্ষ্য করা যায়। কবি ভট্টনারায়ণের রচিত *বেণীসংহারে* ভীম

এবং অর্জুনের কথোপকথনের মধ্যে দুর্যোধন পক্ষীয় ব্যক্তিদের প্রলুব্ধ করে প্রতারণা করার মধ্যে দিয়ে ছলের সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

- বাক্‌কেলির মধ্যে হাস্যের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় –

বাক্‌কেলির্হাস্যসম্বন্ধো দ্বিত্রিপ্রত্যুক্তিতো ভবেত্।[৫৭]

অর্থাৎ অনেক প্রত্যুত্তর হেতু হাস্য সম্বন্ধকে বাক্‌কেলি বলে। অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা কেলি বা খেলা করাকে বাক্‌কেলি বলে। এটা একপ্রকার হাস্য পরিহাস যুক্ত উক্তি প্রত্যুক্তি। এই উক্তি ও প্রত্যক্তির মধ্যে চাতুর্যপূর্ণ মনোভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। কবি ভবভূতি বিরচিত *উত্তররামচরিতে* বাসন্তীর উক্তির মধ্যে এবং কবি শ্রীহর্ষ বিরচিত *রত্নাবলীর* প্রথম অঙ্কে বিদূষক ও মদনিকার উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে চাতুর্যপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

- নালিকা প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন প্রহেলিকা যখন হাস্য যুক্ত হয় তখন তাকে নালিকা বলা হয়। প্রহেলিকা বলতে বুঝায় বাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হওয়ার পর সেই প্রকাশিত প্রায় অর্থকে হেঁয়ালির জালে জড়িয়ে আবৃত করে উত্তর দেওয়ার নাম নালিকা-

প্রহেলিকৈব হাস্যেন যুক্তা ভবতি নালিকা।[৫৮]

অর্থাৎ কোন প্রকাশ্যমান অর্থকে গোপন করার নিমিত্ত রহস্যময় হাস্যের সৃষ্টি হয় সেটি নালিকা। তবে সব প্রকার বিষয়কে গোপন করবার প্রচেষ্টার মধ্যে যে হাস্যের উদ্ভব হবে এমনটা নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যমান অর্থকে গোপন করার মধ্যে দিয়ে হাস্য সৃষ্টি হবে কিংবা হাস্যকর বাক্য যুক্ত হবে তখনই নালিকার সৃষ্টি। এই জাতীয় হাস্যের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান এবং এই জাতীয় হাস্যের মধ্যে কোন ব্যঙ্গ মনোভাব বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু হাস্যরসের প্রাধান্য পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে। কবি শ্রীহর্ষের *রত্নাবলীতে* সুসঙ্গতা সাগরিকার কাছ থেকে জানতে চান কেন তিনি

এখানে এসেছেন। সুসঙ্গতা জানেন সাগরিকা রাজা উদয়নের খোঁজে এখানে এসেছেন। এতদসত্ত্বেও সাগরিকাকে তাঁর আসার কারণ গোপন করে উপহাসের সঙ্গে সুসংগতা বলেছেন চিত্র ফলকের কথা। রাজা উদয়নের কথা গোপন গোপন করার মাধ্যমে নালিকার লক্ষণ সঙ্গতি ঘটেছে।

- মাৎসর্য, দ্বেষ প্রভৃতি সাধারণ হাস্যকর হলেও অনেক সময় তার থেকে উচ্চ শ্রেণীর হাস্যরসের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই বিষয়ে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন ব্যাহার নামক বীথির অঙ্গের মধ্যে এই ধরনের হাস্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যাহার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

ব্যাহারো যৎপরস্যার্থে হাস্যক্ষোভকরং বচঃ।[৫৯]

অর্থাৎ পরের উপকারের জন্য অথবা পরকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে হাস্য সৃষ্টিকারী বাক্য প্রয়োগ করা হয় কিংবা বাক্য প্রয়োগ করা হয় তাকেই ব্যাহার বলে। সামাজিকের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণের কারোর হাস্যজনক আবার কারো ক্ষোভজনক উক্তি ব্যবহৃত হয়। এই বাক্য বিশেষ কোন উদ্দেশ্যকে অভিহিত করার নিমিত্ত আবার কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই সে বাক্যের মধ্যে হাস্যের সৃষ্টি হতে পারে। এই জাতীয় হাস্যের মধ্যে নির্মল আনন্দের সৃষ্টি হয় কিন্তু চমৎকারিত্ব অবিদ্যমান। মহাকবি কালিদাস রচিত *মালবিকাগ্নিমিত্র* নামক দৃশ্যকাব্যে নায়িকা মালবিকার প্রতি বিদূষকের নৃত্যের পর শিক্ষা বিষয়ে নির্দেশনা প্রমাণ করার যে উক্তি তারমধ্যে ব্যাহার নামক বীথীর অঙ্গের লক্ষণ সঙ্গতি ঘটেছে।

- বীথী নামক রূপকের প্রপঞ্চ, ছল, বাক্‌কেলি, নালিকা, ব্যাহার ইত্যাদি ভেদগুলির মধ্যে হাস্যরসের সূচক বিদ্যমান তেমনি কৌশিকী বৃত্তির প্রকাশক যেসকল ভেদ ও অঙ্গ সেগুলিও হাস্যরসের প্রকাশক হতে পারে। কৌশিকী বৃত্তি প্রধানত শৃঙ্গার প্রধান।

নায়িকাদের বিশেষকে বৃত্তি বলা হয়। কৌশিকী বৃত্তিপ্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন যে বৃত্তিতে সূক্ষ্ম নায়িকাদের বেশ-বিশেষের বিচিত্রতা বর্তমান, যেখানে অনেক স্ত্রী বিদ্যমান এবং অনেক নিত্য-গীতাদি আছে, যেখানে কামভোগের জন্য বহু ব্যবহার বর্তমান সুন্দর বিলাস যুক্ত সেই বৃত্তিকে বলে কৌশিকী বৃত্তি। তাই বলা হয়েছে-

সা কৌশিকী চারুবিলাসযুক্তা।[৬০]

শৃঙ্গার প্রধান হলেও তার মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি হতে পারে। *সাহিত্যদর্পণে* কৌশিকী বৃত্তির চারপ্রকার অঙ্গের কথা বলা হয়েছে-

নর্ম চ নর্মস্ফূর্জো নর্মস্ফটো২থ নর্মগর্ভশ্চ চত্বার্য্যঙ্গান্যস্যাঃ।[৬১]

কৌশিকী বৃত্তির এই চারটি অঙ্গের মধ্যে নর্মে হাস্যরসের কথা বলা হয়েছে-

বৈদগ্ধ্যক্রীড়িতং নর্ম ।[৬২]

এই নর্ম আবার তিন প্রকার- শুদ্ধ হাস্যের দ্বারা বিহিত নর্ম, সশৃঙ্গার হাস্যবিহিত নর্ম, ভয়হাস্য বিহিত নর্ম। নর্মকে অগ্রাম্য ও ইষ্টজন সম্বন্ধী পরিহাসরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নর্মের মাধ্যমে হাস্যের উদ্ভাবন বাক্যে দ্বারা যেমন হতে পারে তেমন বেশভূষা ও আঙ্গিক চেষ্টার দ্বারাও হতে পারে। নর্মে হাস্যরসের আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল বলেছেন-

..... কোন কোন ক্ষেত্রে হাস্য শৃঙ্গারকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে, আবার কোন ক্ষেত্রে শৃঙ্গার রসে অভিব্যক্তির অনুকূল পরিবেশ অনুপস্থিত থাকায় তাহার নিরোধের সম্ভাবনা হইয়াছে এবং এই প্রচেষ্টা হইতে হাস্য জন্মলাভ করিয়াছে।[৬৩]

প্রতিমুখ সন্ধির নর্ম ও নর্মদ্যুতি নামক সন্ধ্যঙ্গের ভাগের মধ্যে হাস্যরস নিহিত রয়েছে। আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন-

পরিহাসবচো নর্ম ।[৬৪]

অর্থাৎ পরিহাস বচনকে নর্ম বলা হয়েছে। কবি শ্রীহর্ষের রচিত *রত্নাবলী* নাটিকায় নায়িকা সাগরিকা নায়ক উদয়নের সঙ্গে মিলনের জন্য একান্ত উৎসুক। তখন তাঁর সখি সুসঙ্গতা সাগরিকার প্রতি পরিহাস জনক উক্তির মাধ্যে নর্মের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

নর্মদ্যুতিঃ ধৃতিস্তু পরিহাসজা।[৬৫]

অর্থাৎ পরিহাস করলেও ধৈর্যধারণকে নর্মদ্যুতি বলা হয়। কোন কোন আলঙ্কারিকগণ মনে করেন হাস্যের দ্বারা দোষের যে আচ্ছাদন তাকে নর্মদ্যুতি বলে অভিহিত করেছেন। আচার্য বিশ্বনাথ কবি শ্রীহর্ষের *রত্নাবলী* নাটিকার উদাহরণ দিয়েছেন। সুসঙ্গতা যখন সাগরিকাকে দাক্ষিণ্যহীন বলে পরিহাস করেছে, তখন সাগরিকা ভ্রূভঙ্গী করে মৃদু হেসেছেন। এর মধ্যে দিয়ে সাগরিকা চরিত্রে ধৈর্য্য ধারণের লক্ষণ বিদ্যমান। সুসঙ্গতা পরিহাস করলেও সাগরিকার ধৈর্য্য অবলম্বনের মধ্যে দিয়ে নর্মদ্যুতি নামক সন্ধ্যঙ্গের লক্ষণ সঙ্গতি ঘটেছে।

- নাট্যালঙ্কারের অন্তর্গত উৎপ্রাসন নামক অঙ্গের মধ্যে হাস্যরসের নিদর্শন রয়েছে। উৎপ্রাসন প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন-

উৎপ্রাসনন্তূপহাসো যোঽসাধৌ সাধুমানিনি।[৬৬]

অর্থাৎ যখন কেউ অসাধু হয়েও নিজেকে সাধু বলে মনে করেন তখন তার প্রতি উপহাস প্রয়োগকে বলে উৎপ্রাসন। অর্থাৎ উপহাসের দ্বারা শুধু মানীব্যক্তির চিত্ত বিক্ষেপকারী ঘটনাকে উৎপ্রাসন বলে। উৎপ্রাসনের মাধ্যমে তীক্ষ্ণ, বিদ্রূপ ও কটূক্তি হেতু যে উপহাস তারমধ্যে তীক্ষ্ণতা ও জ্বালা হাস্যরস অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। মহাকবি কালিদাস বিরচিত *অভিজ্ঞানশকুন্তলা* নাটকের পঞ্চমাঙ্কে ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করে দুর্বাসার অভিশাপের ফলে রাজা দুষ্যন্ত তা ভুলে গেছেন এবং তিনি নিজেকে সাধু ব্যক্তি বলে মনে করেন। শাঙ্গরব রাজাকে অসাধু বলে মনে করেন। অসাধু হয়ে সাধুমানী রাজার প্রতি শাঙ্গরবের উক্তিতে উৎপ্রাসনের লক্ষণ সঙ্গতি ঘটেছে। সংস্কৃত কাব্যের অন্তর্গত রূপকের পতাকা স্থান গুলির মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনাময় হাস্যরসের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। যেখানে একটি বিষয় চিন্তা করার অবকাশের হঠাৎ আকস্মিক উপস্থিত অন্যপ্রকার ভাব দ্বারা প্রথম প্রকার বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত অন্যপ্রকার অর্থ সূচিত হয় তখন তাকে পতাকা স্থান বলে। অর্থাৎ আকস্মিক ভাব দ্বারা নতুন ভাবের আগমন মানুষের চিত্তে বিকাশ ঘটার জন্য আনন্দের সৃষ্টি হয় তার থেকে হাস্যরস উৎপন্ন হয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্রে হাস্যরসের যে ভেদ তা কখনো গুণগত, কখনো পরিমাণগত, কখনো উৎপত্তির দিক থেকে, কখনো আস্বাদনের দিক থেকে আবার কখনো সামাজিক ভেদে তার প্রকাশের দিক থেকে হাস্যরসের বিশ্লেষণ করেছেন।

## ১:৭ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে নির্বাচিত হাস্যরসের নাম সমীক্ষা

সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় ইংরেজি এবং বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস লক্ষণীয়। বিকৃত আকার-আকৃতি, বেশ, অলঙ্কার, পরিধান, অঙ্গরচনা, সংলাপ, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, লোলুপতা, ভেলকি, প্রতারণা

ইত্যাদি থেকে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের পটভূমিকায় হাস্যরসের কোন ধারাবাহিক আলোচনা পরিলক্ষিত হয়নি কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃত হাস্যরসের সন্দর্ভ রচনায় মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে অধ্যাপক S. K. De, V. Raghavan এবং শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিগণের রচনায় হাস্যরসের চর্চা এবং গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন। প্রাচীন হাস্যরস পরিচিতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং দার্শনিক প্রত্যয় যুক্ত। প্রতীচ্যের বিশ্লেষণ সেই তুলনায় সরল এবং বহুল পরিচিত।

### ১:৭:১ কমেডি (Comedy)

**কমেডিকে** হাস্যরসের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে ধরা হয়। লঘু চপল হাস্যরসের প্রসারী, জীবনের নানা ত্রুটি, বিকৃতি, নির্বুদ্ধিতা, প্রগলভতা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ কৌতুক, আনন্দোচ্ছল দীপ্তিতে **কমেডির** পরিণতি তাই **কমেডি** হাস্য মধুর ও মিলনান্ত। **কমেডি** শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Komos' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যের বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক Aristotle তাঁর *Poetics* গ্রন্থে **কমেডির** উদ্ভবের ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রিসের গ্রাম্য আনন্দ উদযাপনের (Phallic songs) কথা উল্লেখ করেছেন। সরল ভাষায়, পরিচিত সামাজিক পরিবেশে প্রেক্ষিতে, মানুষের নানা অসম্পূর্ণতা, আতিশয্য, নির্বুদ্ধিতা, অসঙ্গতি চিত্র উদ্ভবন করাই হলো **কমেডির** মূল উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যিক G. Meredith মতানুসারে চিন্তাভাবনার গাম্ভীর্য ও রঙ্গরসের চাপল্যের সার্থক সমন্বয়ে এবং মননশীল ও মজাদার বিনোদনের চমকপ্রদ স্বাদুতা হলো **কমেডি**। এরমধ্যে স্থূল নির্বুদ্ধিতা এবং ভাঁড়ামির উপস্থিতি লক্ষিত নয়। **কমেডির** মাধ্যমে মানব চরিত্র সমূহের বিকৃতি আতিশয্য অনুকৃতি ও উন্মোচন করেছিলেন। চিন্তা ভাবনায় গাম্ভীর্য ও রসের সাফল্যের

সার্থক সমন্বয়ে **কমেডি** মননশীল ও মজাদার বিনোদনের চমকপ্রদ স্বাদের সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্যের দার্শনিক J. Hobbes স্বীকার করেছেন যে **কমেডি**তে কৌতুকের জন্ম হয় অসামঞ্জস্য অসঙ্গতি থেকে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* গ্রন্থে উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, বিষয়বস্তু ও পরিবেশন ভেদে পাশ্চাত্যের নাট্যকার W. Shakespeare এর **কমেডি**কে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন সেগুলি হলো- **ক্লাসিক্যাল কমেডি** ( Classical Comedy), **রোমান্টিক কমেডি** (Romantic Comedy), **কমেডি অফ হিউমার্স** (Comedy of Humours), **সামাজিক কমেডি (**Comedy of Manners), **ভাব প্রধান বা আবেগ প্রধান কমেডি** ( Sentimental Comedy), **ধারণাপ্রদান কমেডি** ( Comedy of Ideas), **ডার্ক কমেডি** (Dark Comedy), **ব্ল্যাক কমেডি** (Black Comedy), **ট্রাজি কমেডি** (Tragi-comedy), **হাই কমেডি** (High Comedy), **লো কমেডি** (Law Comedy) ইত্যাদি। পাশ্চাত্যের নাট্যকার W. Shakespeare এর লেখা *A Midsummer Night's Drama, As you Like it, Twelfth Night*, *Much Ado about Nothing*, *Measure for Measure*, *The Marchant of Venice*, পাশ্চাত্যের F. Beaumont এবং J. Fletcher রচিত *A King and No King*, *philaster*, *The Prophetess* পাশ্চাত্য নাট্যকার B. Jonson রচিত *Every Man in His Humour*, প্রতীচ্যের লেখক W. Wycherley রচিত *The Gentleman Dancing -Master* (1672), *The Country Wife* (1675), *The Plain Dealer* (1676), প্রতীচ্যের নাট্যকার W. Congreve রচিত *The Way of the World* (1700),পাশ্চাত্যের R. Steeleর *The Funeral* (1701),পাশ্চাত্যের O. Goldsmith রচিত *She Stoops to Conquer* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য **কমেডি**র উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যে প্রথম **কমেডি**র উদাহরণ হলো লেখক রামনারায়ণ তর্করত্নের রচিত *কুলীনকুল সর্বস্ব (১৮৫৮)*। এছাড়া কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে*

*রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০),* দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ, (১৮৬০), লীলাবতী (১৮৬৭)* ইত্যাদি নাটকে হাস্য পরিহাসের বিশেষ নিদর্শন লক্ষণীয়। *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনে* কবি রক্ষণশীল সমাজের মুখোশ উন্মোচন করেছেন, যারা বাইরে ধর্মপরায়ণতা, সচ্চরিত্রের বেশ ধরলেও তাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকে ভণ্ডামি। পৌত্তলিকতাবাদে অবিশ্বাস ও সমাজ সংস্কারের আশা বুকে নিয়ে ঊনিশশতকে শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্য অনুসরণকারী দলের প্রথম পদক্ষেপ ছিল মদ্যপান আর সম্ভোগলিপ্সা। বেদান্ত আশ্রয়ী হিন্দু রক্ষণশীল একেশ্বরবাদী সমাজ এই ইয়ংবেঙ্গলের তীব্র বিরোধিতা করলেও সমাজের নিজেদের পদমর্যাদা উচ্চ করতে পরিমিত মদ্যপানের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তেমনি আগ্রহ দেখা যায় বারাঙ্গনা বিলাসে। এই রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি ভক্তপ্রসাদ। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামকরণেও তীক্ষ্ণ সচেতনার দৃষ্টান্তের পরিচয় রেখেছেন। নব্যযুবক যেমন নবকুমার, তেমনি ভক্তপ্রসাদের ভক্তির ভাব মাধুর্যের নেপথ্যে কদর্য কার্যকলাপকে প্রকাশ করবেন বলেই এই নামকরণ। চরিত্রের কথায় ও কার্যে অসঙ্গতি প্রকাশই প্রহসনের উদ্দেশ্য। পরম বৈষ্ণব ভক্তপ্রসাদের ভক্তির আড়ম্বরের পেছনে নারীলোলুপতা এবং তার উদ্দেশ্যে যথেচ্ছ অর্থব্যয় ও প্রজাশোষণের মধ্য দিয়ে অর্থসংগ্রহ – দুটি দিকই কবি মধুসূদন প্রকাশ করেছেন। জীবনের নানা ত্রুটি, বিকৃতি, নির্বুদ্ধিতা, প্রগলভতা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ কৌতুকপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে **কমেডি**র সৃষ্টি করেছেন।

### ১:৭:২ হিউমার (Humour)

হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ ভাগের নাম **হিউমার। হিউমার**কে বলা হয় বিশুদ্ধ করুণ হাস্যরস। **হিউমার** মৃদু ও নির্মল। জীবনের প্রতি সমবেদন দৃষ্টি, সকলের প্রতি উদার সমদর্শিতা,

চিন্তাশীলতার সহিত আমোদপ্রিয় এক মিশ্রিত অনুভূতি হলো **হিউমারে**র বৈশিষ্ট্য। **হিউমার** সম্বন্ধে একটি ইতিহাস প্রচলিত আছে। বলা হয়ে থাকে যে মধ্যযুগের চিকিৎসকেরা **হিউমার** শব্দটিকে শারীরিক হিসাবে অভিহিত করেছেন। রক্ত, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও কৃষ্ণমেহকে একত্রে **হিউমার** বলা হয়। **হিউমার** সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যের লেখক W. M. Thackeray বলেছেন-

The humorous writer professes to awaken direct your love, your parity your kindness-your scorn for untruth, pretension, imposture-your tenderness for the weak, the poor, the oppressed, the unhappy.[৬৭]

অর্থাৎ জীবনের অপ্রীতিকর, অসুন্দর দিকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে প্রতিস্থাপন করা **হিউমারে**র কাজ। **হিউমারে**র মধ্যে বিদ্রূপের জ্বালা তীব্রভাবে থাকে না, পরিবর্তে থাকে এক স্নেহমণ্ডিত অনুযোগ যার অর্থ সাধারণভাবে গভীর এবং অতলস্পর্শী। যার মাধ্যমে সমাজ সংশোধনের আবেদন বর্তমান, তা অনুভূতি রসে সিক্ত এবং অত্যন্ত কোমল। **হিউমারের** আবেদন গভীর ও অতলস্পর্শী। পাশ্চাত্ত্য লেখক Carlyle **হিউমারকে** স্বর্গীয় বস্তুর সাথে তুলনা করে বলেছেন-

Humour is a sympathy with the semi side of things.[৬৮]

সাহিত্যিক মোহিতলাল মজুমদার *সাহিত্যবিতানে* **হিউমার** সম্বন্ধে বলেছেন-

জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা নির্লিপ্ত অথচ সহৃদয় মনোভাবই **হিউমারে**র মূল উৎস।[৬৯]

**হিউমারে** রয়েছে করুণ ও হাস্যরসের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলীর* প্রথম খণ্ডে কালিদাস ভবভূতি প্রবন্ধ-আলোচনা **হিউমার** প্রসঙ্গে বলেছেন-

আর এক প্রকারের রসিকতা আছে, তাহা অতি উচ্চ ধরণের। তাহার মিশ্র রসিকতা। হাস্যরসের সঙ্গে করুণ, শান্ত, রৌদ্র ইত্যাদি রস মিশাইয়া যে রসিকতা সৃষ্টি হয়, তাহাকে আমি মিশ্র রসিকতা বলিতেছি। যে রসিকতা মুখে হাসি ফুটায়, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে জলধারা বহাইয়া দেয়, কিংবা যাহা পড়িতে পড়িতে আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গে হৃদয় অনুভব করি, তা সাহিত্যজগতে অতি বিরল।[৭০]

আবার পাশ্চাত্ত্যের লেখক J. Benton মতে **হিউমার** হলো **কমেডির** অন্তর্গত চরিত্রের সংলাপ ও ভাবভঙ্গি অথবা নাট্য পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত বিষয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে, সাহিত্যিক J. Austen রচিত Pride *and Prejuice*, প্রতীচ্যের লেখক H. Lee এর রচিত *To Kill a Mockingbird*, C. Lamb রচিত Essays of Elia হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পাশ্চাত্ত্যের লেখক H. Lee সরল অল্প বয়সী বালিকার জবানীতে *To kill a Mockingbird* উপন্যাসটি বর্ণনা করেছেন। Jem এবং Scout এর পিতা Atticus, যিনি Maycomb এ ওকালতি করেন। জনাব Atticus ছিলেন বিপত্নীক, ছেলে Jem আর কন্যা Scout নিয়ে তিনি বাস করেন Maycomb শহরে। Scout এর বর্ণনায় এটি যেন ঝিম ধরা এক শহর। এখানকার অধিবাসীদের মাঝে কৃষ্ণাঙ্গের সংখ্যাই বেশি। তবে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের সর্বদা অবহেলার চোখে দেখে এবং আদালতে তারা সুবিচার পর্যন্ত পেত না। আইন সর্বদাই যেন এখানে শ্বেতাঙ্গের পক্ষে। Maycomb শহরকে আদতে একটি উপনিবেশ বলা চলে, নানা অঞ্চল হতে শ্বেতাঙ্গরা মানুষেরা এখানে বসতি গড়ে, গড়ে তোলে ব্যবসারকেন্দ্র আর আস্তে আস্তে শহরের পত্তন হয়। কৃষ্ণাঙ্গরা মূলত কর্মের খাতিরেই এখানে এসেছিল পরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। লেখক Scout চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে হাস্যের সৃষ্টি করেছেন। কৃষ্ণাঙ্গদের জীবনের প্রতি সমবেদন দৃষ্টি, সকলের প্রতি উদার সমদর্শিতা, চিন্তাশীলতার সহিত আমোদপ্রিয় এক মিশ্র অনুভূতির

মাধ্যমে **হিউমারে**র সৃষ্টি করেছেন। বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* নাটকটি একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই প্রহসনে নব্য সভ্যতার ধ্বজাধারী ইয়ং বেঙ্গলের হাস্যকররূপ এবং অসঙ্গতি নির্ভর ব্যভিচারের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত এই সমাজের মধ্য থেকে উঠে এসেছে মদ্যাসক্ত নিমচাঁদ ও অটলবিহারী নামক চরিত্রের কথা। যিনি বারাঙ্গনা বিলাসে উন্মার্গগামী এবং তাঁকে অনুসরণ করেছেন নকুলেশ্বর উকিল ও কেনারাম ডেপুটি। আবাল্য পিতামাতার শাসনহীন অপরিণামদর্শী যুবক হলো অটলবিহারী। মূর্খ, নির্বোধ ঘটিরাম ডেপুটি একটি অনবদ্য হাস্যকর চরিত্র। নিমচাঁদ দত্ত উচ্চশিক্ষিত ও সৎ হয়েও মদের প্রতি আসক্তির জন্য অধঃপতনের পঙ্কস্তরে তলিয়ে গেছে, কিন্তু নিজের ভ্রষ্টতা ও তাঁর থেকে ভ্রষ্টচারী বন্ধুদের সংসর্গের মাঝখানেও তিনি তাঁর বিবেক ও আত্মসমালোচনার শক্তিকে হারায়নি। মাতলামির ঝোঁকে আপাত হাস্যকর উক্তিগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর মনোবেদনা, আত্মগ্লানি ও আত্মসমালোচনা গভীর অর্থপূর্ণ রূপ পেয়েছে। তাঁর পরিহাস, বাকচাতুর্য, রঙ্গব্যঙ্গ ইত্যাদির পশ্চাতে বেদনার অশ্রুর আভাস সহৃদয়ের হৃদয়কে আলোড়িত করে **হিউমারে**র সৃষ্টি করেছেন।

### ১:৭:৩ উইট (Wit)

**উইট** শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো বুদ্ধির অভিনব প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে যাকে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরস বলে। এই হাস্যরস সজ্ঞান, সচেতন এবং মননশীল। মানসিক আবেগ অপেক্ষা বুদ্ধির সজ্ঞান অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। **উইট** বিস্ময় ও চমৎকারের সৃষ্টি করে। **উইটে**র মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ভাব বিদ্যমান, অল্প কথায় পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং বুদ্ধিকে

চমকপ্রদ করে বিস্মিত করে তোলে এই হাস্যরস নির্মল হাস্যরস। **উইট** প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সমালোচক A. H. Abrams বলেছেন-

Wit once meant the mental faculty of intelligence or inventiveness a sense it still retains in the term halfwit.[৭১]

**উইটে**র মধ্যে থাকে বুদ্ধির নির্ভরতা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ। বুদ্ধিগ্রাহ্য ও শিক্ষা সাপেক্ষ অর্থাৎ উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা বিদগ্ধজন গতানুগতিক চিন্তা ধারাকে নতুন চিন্তাধারার সূচনা দ্বারা চমকপ্রদ অর্থের সৃষ্টি করে কাব্যে রসের সৃষ্টি করে। তাই **উইটে**র আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত নয়, হৃদয়ে এর উপস্থিতি ক্ষণিক এবং তীব্র। সামাজিক পরিবেশ, জীবন দর্শন ও তার রুচি, বিরুদ্ধ ধর্মীয় বাক্য, দৃশ্যমান বস্তুর সঙ্গে অদৃশ্য বস্তুর বৈষম্য ইত্যাদি **উইটে**র উপাদান। অর্থাৎ **উইটে**র মধ্যে হাস্যরসের সকল প্রকার সাধারণ উপাদান বর্তমান। জীবনের খণ্ড অংশের প্রতি আলোকপাত করে থাকে অর্থাৎ এটি সমাদর বিশেষ দেশ-কাল ও শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রতীচ্যের মনস্তত্ত্ববিদ S. Freud উইটকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। **উইট** যখন নির্মল হাস্য পরিহাসের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে harmless wit বলে। আবার **উইট** যখন ব্যঙ্গের মাধ্যমে হাস্যরসের প্রকাশ করা হয় তখন তাকে tendency wit বলে। যে নির্মল হাস্যরস চাতুর্য চমকের সৃষ্টি করে তাকে false wit এবং যে নির্মল হাস্যরস চিরন্তন সত্য সমূহকে শব্দবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করে তাকে true wit বলা হয়। J. Addison false wit, mixed wit এই দুই প্রকারভেদ স্বীকার করেছেন। J. Sully তাঁর *Human Mind* গ্রন্থে false wit, automation wit, mixed wit কথা বলেছেন। মনস্তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে **উইটে**র বিভিন্ন ভাগের কথা বলা হয়েছে- displacement wit, unification wit, nonsense wit, ellipsis wit ইত্যাদি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে John Donne এর লেখা *The Good Morrow* (by John Donne), A. Pope বিরচিত Canto-I, *The*

*Rape of the Lock* । তিনি এখানে প্রচুর চিত্তাকর্ষক এবং বুদ্ধির উদাহরণ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত A. Pope তাঁর বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজকে আক্রমণ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে অলসতা, মূর্খতা, তুচ্ছতা, অগভীরতা, কপটতা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অভিজাত মহিলাদের অসারতাকে উপহাস করেছেন। সামাজিক পরিবেশ, জীবন-দর্শন ও তার রুচি, বিরুদ্ধ ধর্মীয় বাক্য, দৃশ্যমান বস্তুর সঙ্গে অদৃশ্য বস্তুর বৈষম্য ইত্যাদি **উইটে**র উপাদান স্বরূপ। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) লেখা গল্পের মধ্যে যেমন *বীরবলের হালখাতা, নানা কথা, চার ইয়ারী কথা* ইত্যাদিতে হৃদয়ের কারবারি পরিলক্ষিত নয়, তাঁর লেখার মধ্যে সূক্ষ্ম মননশীল, নাগরিক মেজাজ এবং রসরুচির প্রতিবেদন চোখে পড়ে অর্থাৎ তাঁর লেখার মধ্যে **উইট** জাতীয় হাস্যরসের প্রাধান্য লক্ষণীয়। *চার-ইয়ারী কথা* (১৯১৬)এই গল্পগ্রন্থে চার বন্ধুর প্রেমের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রেমই অভিশপ্ত। নায়িকা চারজন ইউরোপীয়। প্রথম নায়িকা উন্মাদ, দ্বিতীয় জন চোর, তৃতীয় জন প্রতারক এবং চতুর্থ জন নায়িকা মৃত্যুর পরে তার ভালোবাসা ব্যক্ত করেছে। ভাষার চাতুর্য, পরিহাসপ্রিয়তা এবং সূক্ষ্মব্যঙ্গ উদ্ভাসিত কাহিনীর মধ্যে সঞ্জান, সচেতন এবং মননশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

### ১:৭:৪ ফান (Fun)

বাংলা সাহিত্যে **ফান**কে কৌতুক হাস্যরস বলা হয়। এই জাতীয় হাস্যরসের আবেদন হৃদয়ের গভীর অংশে নয় তা মনের উপরিতলে বর্তমান। মানুষের স্বাভাবিক স্ফূর্তি প্রবণতা বা আমোদপ্রিয় তা কোন সূক্ষ্মতর কলাকৌশলের গভীর জীবনে অনুভূতির নিয়ন্ত্রাধীন না হয়ে উদ্ভট অবস্থা ও অতিরঞ্জিত চরিত্র কল্পনার সাহায্যে সহৃদয়ের হাস্যের উপলক্ষ সৃষ্টি করে সেখানে

কৌতুক হাস্যরস প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ শারীরিক ভারসাম্যহীনতা ও সেই কারণে বিপর্যয় থেকে যে আনন্দের সৃষ্টি হয় তাকে **ফান** বলা হয়। কৌতুকের জগৎ অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার জগৎ। সাহিত্য সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ **ফান** প্রসঙ্গে বলেছেন-

কৌতুক ময় হাস্যরসের মধ্যে উদ্ভট ও অস্বাভাবিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ থাকে। যাহা সহজেই মনকে ধাক্কা দিয়া সচকিত ও আমোদিত করিয়া তোলে তাহাই এই হাস্যরসের প্রাণ।[৭২]

**ফান** সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত E. Bently বলেছেন-

Comedy is indirect, ironical. It says fun when it means misery. And when it lets the misery show, it is able to transcend it in joy.[৭৩]

পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত L. Carroll রচিত *Alice's Adventures in Wonderland* এই উপন্যাসে Cheshire নামক বিড়ালটি Alice কে দেখেই হেসেছিল। এটি দেখতে ভাল প্রকৃতির ছিল এবং তার লম্বা নখ ও অনেকগুলি দাঁত ছিল। লেখক Carroll, Cheshire নামক বেড়ালটি Alice কে দেখে হাসার মাধ্যমে এক অদ্ভুত এবং অতিরঞ্জিত চরিত্রের সৃষ্টি করে **ফানে**র সৃষ্টি করেছেন। গল্পটা শুরু হয় একটা বাচ্চা ছেলের ঘুম থেকে উঠার মধ্যে দিয়ে। গরমকালে ঘাম মোছবার জন্য রুমালটা তুলতে গিয়ে সে দেখে তার রুমাল একটা বিড়াল হয়ে গেছে। বিড়ালটার সাথে সে গল্প করতে শুরু করে এবং বুঝতে পারে বিড়ালটা উল্টোপাল্টা কথা বলছে। পরে ছেলেটার দেখা হয় কাকেশ্বর নামক দাঁড়কাক সাথে যে বিদঘুটে হিসাব করে। এরপরে একে একে উদো আর বুদো, হিজিবিজবিজ, ব্যাকরণ শিং, নেড়া, সজারু, প্যাঁচা ইত্যাদি আরও অনেক চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে আর বাড়তে থাকে বিশৃঙ্খলা। গল্পের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটে বাচ্চা ছেলেটির ঘুম থেকে উঠার মধ্যে

দিয়ে। উদ্ভট অবস্থা যেমন দাঁড় কাকের হিসাব কষা, ব্যাকরণের শিং ইত্যাদি এবং অতিরঞ্জিত চরিত্র কল্পনার যেমন রুমালের বিড়াল হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে।

### ১:৭:৫ পুন (Pun)

বাক্‌চতুরালি বা বাক্‌বিন্যাসের কৌশলে হাস্যের উদ্রেক হলে তখন তাকে **পুন** বলা হয়। পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত L. Carroll রচিত *Alice's Adventures in Wonderland* এই উপন্যাসে শ্লেষের অনেক উদাহরণ রয়েছে। যা এই উপন্যাসে অদ্ভুতরূপে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। Alice রহস্যময় Cheshire নামে বিড়ালের সাথে দেখা করে, উভয়ের মধ্যে কথোপকথন হওয়ার সময় অ্যালিস 'গল্প'(tale), এবং 'লেজ'(tail) এই শব্দ দুটির অর্থগুলিয়ে ফেলে। লেখক এখানে 'গল্প'(tale), এবং 'লেজ'(tail) এই শব্দ দুটির মাধ্যমে বাক্‌বিন্যাসের কৌশলে সহৃদয়ের চিত্তে হাস্যের সৃষ্টি করেছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩) শিশুসাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি প্রতিভার অধিকারী । তাঁর লেখা *গুপী গাইন বাঘা বাইন, টুনটুনির বই ইত্যাদি* **পুন** জাতীয় রচনা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বাকচাতুর্যে শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০) অদ্বিতীয়। তিনি **পুন** জাতীয় হাস্যরসের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত। *বিশ্বপতি বাবুর অশ্বত্বপ্রাপ্তি, শিক্ষাদান, পুরস্কার লাভ, স্বামী মানেই আসামি* ইত্যাদি গল্প হাসির ছলে নির্মল সত্যটুকু স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) *তোতা কাহিনী*তে বাকচাতুর্যের পরিচয় বহন করে। লেখক রাজশেখর বসুর শ্লেষাত্মক গল্প *উলটপুরাণ।* এখানে আপাতদৃষ্টিতে সবই উল্টো। অর্থাৎ ইংল্যান্ড যেন ভারতের উপনিবেশ। ইংরেজ ছেলেদের মুখে শোনা যায়, ভারত শাসকদের সুখ্যাতি। তারা ভারতীয় পোষাক পরে, মেয়েরা খোঁপা বাঁধে, দোক্তা খায়, উর্দূ

গজল গায়, না বুঝে বাংলা বই মুখস্ত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। দাসত্ব মনোভাববশত মি. টোডি নাম বদল করে হয়ে যান খাঁ সাহেব গবসন টোডি। স্যার ট্রিকসি টার্নকোটকেও ভারতের কোন স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা বলে মনে হয়। আসলে যেমন দর্পণে উলটো বিম্ব পড়ে, তেমনি ইংরেজের এইসব আচরণ অনুকরণপ্রিয় ভারতীয় চরিত্রের, বিশেষত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জীবনাচরণকেই পরোক্ষে প্রতিফলিত করে। বাকচাতুর্য ও পরিকল্পনায় অদ্ভুত মৌলিকতায় গল্পটির মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। আসলে লেখক ইংরেজ ও ভারতীয় দুই সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে রসিকতার ছলে শ্লেষাত্মক বাক্যের ব্যবহার করেছেন।

### ১:৭:৬ স্যাটায়ার (Satire)

তীব্র বাক্যবাণে অন্যকে আক্রমণ করলে যে তৃপ্তিজনক হাস্যের উদ্রেক হয়, তখন তাকে **স্যাটায়ার** বা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বলে। অর্থাৎ যে হাস্যের মাধ্যমে উপহাসের জ্বালা নিদারুণভাবে জাগ্রত থাকে তাকে **স্যাটায়ার** বলে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

ল্যাটিন 'satira' বা 'satura' থেকে 'satire'শব্দটি এসেছে। 'Satura' ছিল অতি প্রাচীন কালের কান্নাহাসির-দোল-দোলানো এক মিশ্র আমোদ কৌতুক। ফল ও সর্ষের দেবী Ceres এর পূজায় 'Lanx satura' নামে একটি থালায় বর্ষ শুরুর নানা শস্য ও ফল নৈবেদ্য রূপে সাজিয়ে দেয়া হতো। আর এই 'Lanx satura' থেকেই 'satura' আর তা থেকেই **স্যাটায়ার**।[৭৪]

সমাজের বিকৃত অঙ্গের প্রতি লেখক বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ, নির্মম ও কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং সমাজের দোষ ত্রুটি জনসমক্ষে হাস্যরসের মাধ্যমে উন্মোচিত করেন। **স্যাটায়ার** জাতীয় রচনার মধ্যে বিদ্রূপ, আক্রোশ বা খোঁচা দেওয়ার প্রবণতা অধিক স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। কিন্তু এই জাতীয়

হাস্যরসের মধ্যে লেখক অর্থাৎ স্রষ্টা সামাজিক ত্রুটিকে তীব্র কষাঘাত করে আত্মগরিমায় উল্লসিত হয়ে ওঠেন। ব্যক্তি বিশেষকে বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করা ছাড়াও লোক শিক্ষা, চরিত্র সংশোধন ও সামাজিক নিয়ম- নীতি ব্যবস্থার সমালোচনা ইত্যাদি **স্যাটায়ারের** প্রধান উদ্দেশ্য। সাহিত্য সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ **স্যাটায়ার** প্রসঙ্গে বলেছেন-

যে হাসি আমাদের মুখকে প্রসন্ন না করিয়া বিষন্ন করিয়া তোলে, যাহা আমাদের মন আমোদে উজ্জ্বল না করিয়া আঘাতের দীর্ণ করিয়া ফেলে ব্যঙ্গের হাসি। ব্যঙ্গকার বড় কঠোর, বড় নির্মম, তিনি মানুষের দোষ ও ব্যাধিকে নগ্ন করিয়া পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। তাঁহার হাসি একক, দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে তাহা প্রতিধ্বনিত হয় না।[৭৫]

আবার পাশ্চাত্ত্যের লেখক G. Chaucer **স্যাটায়ার** সম্বন্ধে বলেছেন-

The satirical intent is wholly lacking, as it is the case of good person, but except in rare cases, the Satya is good humoured and well-meant.[৭৬]

ইংরেজি সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনার উদাহরণ হিসাবে প্রতীচ্যের পণ্ডিত G. Chaucer *The Canterbury Tales* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। *The Canterbury Tales* মধ্যযুগীয় ইংরেজি সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য এটিতে মোট চব্বিশটি গল্পের সংগ্রহ রয়েছে। Southwork থেকে Canterbury Cathedral এ অবস্থিত St. Thomas Becket এর সমাধির উদ্দেশ্যে গমনকারী তীর্থযাত্রীদের গল্প বলার প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে গল্পগুলো (অধিকাংশই পদ্য, যদিও কিছু কিছু গদ্যও রয়েছে) বর্ণিত হয়েছে। প্রতিযোগীদের পুরস্কার ছিল ফেরার পথে Southwork এর Tabard সরাইখানায় একবেলা বিনা পয়সার খাবার। তিনি তার গল্প এবং গল্পের চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে সমসাময়িক ইংরেজদের সমাজের বিশেষ করে ব্রিটিশ চার্চের বিদ্রূপাত্মক ও সমালোচনা

মূলক চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। মধ্যযুগীয় ইংরেজি সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলি নির্দেশ করার জন্য হাস্যরস ব্যবহার করে সাংস্কৃতিক নিয়মগুলিকে ব্যঙ্গ করে। উদাহরণস্বরূপ, সন্ন্যাসীকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলে তার অতিরঞ্জিত প্রশংসা সন্ন্যাসীর ঘোড়া এবং শিকারের দীর্ঘ বর্ণনার দেওয়া হয়েছে। ধর্মের চেয়ে শিকারের জন্য বেশি যত্নশীল একজন মানুষকে সূক্ষ্ম সন্ন্যাসী বলার মূর্খতা ব্যঙ্গের প্রতীকী সূচিত করে **স্যাটায়ারের** সৃষ্টি করেছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য প্রতীচ্যের ঔপন্যাসিক A. Huxley রচিত *Brave New World।* তাঁর উপন্যাসে তিনি বেশিরভাগ সামাজিক সম্মেলন এবং প্রতিষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করেছেন যেগুলোকে পবিত্র বলে মনে করা হয় এবং পাশ্চাত্ত্য সমাজের কাছে প্রিয়। এর মধ্যে রয়েছে ধর্ম, একবিবাহ, সামাজিক সাম্য এবং সন্তান জন্মদানের আশীর্বাদ। এই উপন্যাসে চিরাচরিত রীতি-নীতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমনভাবে উল্টে দেওয়া হয়েছে যে চরিত্রগুলি মাদক সংস্কৃতিকে, সামাজিক শ্রেণী বিচ্ছিন্নতাকে, নৈমিত্তিক যৌনতা এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণকে আলিঙ্গন করে। সমসাময়িক সমাজের স্বেচ্ছাচারী এবং প্রায়শই কপট নৈতিক কাঠামোকে ব্যঙ্গ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে (১৮১২-১৮৫৯) satirist বলা হয়ে থাকে। বিশিষ্ট লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) *আলালের ঘরের দুলাল,* কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) *প্যাঁচার নকশা,* এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *নববাবুবিলাস, দুটি বিলাসী, কলিকাতা কমলালয়* , লেখক অমৃত লালের *তাজ্জব ব্যাপার ও কৃপণের ধন, ডিসমিস,* বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের *বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা ও শেষ রক্ষা* ইত্যাদি রচনা হাস্যরসাত্মক যুক্ত। এই সমস্ত রচনা গুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজের অন্তর জীবনের আচার-ব্যবহার, ব্যভিচারী ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নানা কুকীর্তি এবং তৎকালীন বাবু সম্প্রদায়ের নানা কদাচারকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। *ঘোষালের ত্রি কথা* ইত্যাদি গল্পে আড্ডার আড়ালে হাস্যরসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সুকুমার রায় (১৮৮৭)কে বাংলা সাহিত্যের **'ননসেন্স**

**রাইমে**'র প্রবর্তক বলা হয়। তিনি *আবোল তাবোল, পাগলা দাশু* ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে ব্যঙ্গাত্মক ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। বিশিষ্ট লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা *সাতমার পালোয়ান* নামক গল্পটি ব্যঙ্গরচনার অন্তর্গত। বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ মুস্তাফা আলী রচিত *সিনিয়র অ্যাপ্রেন্টিস* গল্পে **স্যাটায়ার** ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মাক হাস্যরসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কবি সুকুমার রায়ের লেখা *আবোল তাবোলের* অন্তর্গত *খিচুড়ি* ছড়াটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ছড়াতে কবি দেখিয়েছেন, একটি প্রাণী অতি সহজেই নিজের অর্ধেক অংশের সঙ্গে অন্য একটি প্রাণীর অর্ধেক অংশযুক্ত করে একটি কিম্ভুতাকার চেহারা নেয়, যেমন হাঁস ও সজারুর মিশ্রণে হাঁসজারু, বক ও কচ্ছপের মিশ্রণে বকচ্ছপ। কবি তাদের এই রূপকে খাসা বলে অভিহিত করেছেন। নতুন এই অবতারে তারা যথেষ্টই ফূর্তি অনুভব করছে। কবির গভীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, আসলে এই ছড়ার মাধ্যমে কবি সামাজিক ত্রুটিকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন পাঠক মহলের কাছে। খিচুড়ির প্রত্যেকটি প্রাণী আসলে নিজের প্রকৃত পরিচয় অবলুপ্তকারী মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ। বিশেষ করে নব্যশিক্ষিত বাঙালিজাতির কথাই কবি বলেছেন। ব্রিটিশ শাসনের সময় এই বাঙ্গালীরা সরকার মহলকে তুষ্ট করার জন্য নিজেদের পোশাকে, আচারে, সংস্কৃতিতে ইংরেজি আদবকায়দার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে ওপর মহলে, সরকারি দপ্তরে নিজের জায়গা করে নেওয়া।

### ১:৭:৭ ল্যামপূণ বা প্যারোডি বা বারলেসকিউ (Lampoon or Parody or Burlesque)

**ল্যামপূণ** হলো কুরুচিপূর্ণ কুৎসা বা ব্যক্তিগত বিদ্রূপ ব্যঙ্গের অপকৃষ্ট রূপ। এইটি এক প্রকার ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি যাকে লালিকা বা ইংরেজি সাহিত্যে **প্যারোডি** বলা হয়। ল্যাটিন parodia (something sung alongside) শব্দ থেকে **প্যারোডি** শব্দের উদ্ভব পরিচিত কোন গান বা

কবিতা কিংবা নাটক কিংবা উপন্যাসের সরস সমালোচনা মূলক নতুন সৃষ্টিকে **প্যারোডি** বা লালিকা বলা হয়। তাই পাশ্চাত্ত্যের কবি Henry **প্যারোডি** বা **বারলেসকিউ** সম্বন্ধে বলেছেন-

In the diction, I think, burlesque itself may be sometimes admitted..... for whose entertainment those parodies or burlesque imitations are chiefly calculated.[৭৭]

বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন লালিকা বা **প্যারোডি** বলতে বোঝায় কোন রচনার ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি। মূল রচনার গঠনরূপ ও রচনা রীতির পরিবর্তন না করে বিদ্রূপাত্মক অতিরঞ্জনের মাধ্যমে সমালোচনা মূলক নতুন সৃষ্টির নাম **প্যারোডি**। ইংরেজি সাহিত্যে ব্যঙ্গশিল্পী H. Syrian *Lucian of Samosata* যিনি Homer এবং অন্যান্য ধ্রুপদী লেখকদের আলোড়িত করে এমন একটি উপহাস ভ্রমণকাহিনী দিয়ে *Odyssey* এবং *Indica*কে **প্যারোডি** করেছিলেন। মধ্যযুগীয় ইংরেজ লেখক G. Chaucer, যিনি *The Canterbury Tales* এ Chivalric romance এর **প্যারোডি** করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি J. Philips, যিনি তাঁর কবিতা "The splendid shillings"-এ J. Milton *Paradise Lost* অতিমাত্রায় মহাকাব্যিক শৈলীর **প্যারোডি** করেছেন। বাংলা সাহিত্যে কাব্য এবং কবিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার অনুকরণে মোহিতলাল মজুমদারের *আমি যদি জন্ম নিতাম ক্যাবলা কলুর কালে,* কালিদাস রায়ের *কেন বঞ্চিত হব ভোজনে,* সজনীকান্ত দাসের *হে বিরাট গদী,* সতীশ ঘটকের *সোনার ঘড়ি* ইত্যাদির নাম স্মরণযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের অনুকরণে মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত **প্যারোডি** বা লালিকা রচনা করেছেন। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে হাস্যরসের যে সকল প্রকার ভেদ পাওয়া যায়

তারমধ্যে **ফান** ও **পুন** নিম্নস্তরের, **স্যাটায়ার** মধ্যম স্তরের এবং **হিউমার** উন্নত স্তরের হাস্যরস বলে মনে করা হয়।

**১:৮ প্রাচ্যের হাসেরসের সাথে প্রতীচ্যের হাস্যরসের মেলবন্ধন**

পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্বে হাস্যের যে সকল ভেদ স্বীকার করা হয়েছে যেমন **উইট**, **হিউমার**, **স্যাটায়ার**, **ফান**, **পুন**, **ল্যামপূণ** ইত্যাদি সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল ক্ষেত্রে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় সেগুলির বিচার ও বিশ্লেষণ করলে বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের হাস্যরসকে ইংরেজি সাহিত্যে অনুরূপের **হিউমার** রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সহৃদয় যেমন আনন্দে হেসে উঠে তেমনি আনন্দে তাদের চোখে অশ্রুর আগমন ঘটে অর্থাৎ **হিউমারে**র মধ্যে মিশ্রিত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। সমবেদনা, সহানুভূতি, অনুকম্পা এই বৈশিষ্ট্যগুলি **হিউমারে**র মধ্যে বিদ্যমান। সহানুভূতি হলো বাক্যের মাধ্যমে হাস্যরসের প্রাণ। হাস্যরসের মধ্যে সহৃদের আনন্দদানের মধ্যে সমাজ সংশোধনে সূক্ষ্ম প্রতিবেদন লক্ষ্য করা যায় আর এই বৈশিষ্ট্য **হিউমারে**র মধ্যেও বিদ্যমান। নির্মল হাস্যরস বা **হিউমার** হলো সভ্যতার স্থিতি ও বৃদ্ধির সূচক। সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার হাস্যরস **ও হিউমার** প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের হাস্যরসের পর্যায়রূপে **হিউমার** ও হাস্যরসকে একইভাবে সূচক রূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি *সাহিত্যবিতানে* এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

ইংরেজি **'হিউমার'** শব্দটির একটি অতিস্থূল সাধারণ প্রয়োগ আছে, তাহার বাংলা প্রতিশব্দ 'হাস্যরস' হইলে আপত্তি নাই, অবশ্য যদি তাহাতে নির্দ্দোষ রস উপভোগের হাসি বুঝায় আমার।[৭৮]

পণ্ডিত শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল তিনিও সাহিত্যিক মোহিতলাল মজুমদারের মতকে সমর্থন করে বলেছেন-

অলঙ্কারশাস্ত্রে হাস্যরস বলিতে যাহা সূচিত করা হইয়াছে ইংরেজি সাহিত্যের **হিউমার**ই একমাত্র তাহার পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। হাস্যরস যে ক্ষেত্রে নিষ্পন্ন হইয়াছে বা হাস্যরসধ্বনি প্রতীত হইতেছে তাহাদের সকলকে **হিউমার** আখ্যা দেওয়া চলিতে পারে।[৭৯]

**স্মিতহাস্য**কে smile ও **উপহসিত**হাস্য laughter বলা হয়েছে। আচার্য ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* **স্মিতহাস্য** সম্পর্কে বলেছেন হাস্যের মধ্যে গণ্ডদেশ বিকশিত হয় এবং কটাক্ষ বেশ বোধ যুক্ত ভাবে প্রযুক্ত হয়, দন্ত লক্ষিত হয় না সেইরূপ হাস্যকে **স্মিত** বলা হয়। যে হাস্যে নাসিকা উৎফুল্ল অর্থাৎ বিস্ফারিত হয় বক্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা হয় স্কন্ধদেশ ও মস্তক নিকুঞ্চিত হয় তাকে **উপহসিত** বলা হয়। পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যিক J. Sully smile এবং laughter সমন্ধে বলেছেন-

These facial changes are common to the smile and to the laugh, though in the more violent forms of laughter the eyes are apt to lose under their lachrymal suffusion the spark which on laughter.[৮০]

অর্থাৎ **স্মিতহাস্য** বা **উপহসিত** যে এক নয় তাই মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সূচিত হয়। প্রপঞ্চ নামক বীথীর অঙ্গের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়কে কেন্দ্র করে কৌতুক জনক হাস্যরসের সৃষ্টি হয় এবং এর মধ্যে অনুভূতি চাতুর্যের বিষয় পরিলক্ষিত হয় না। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অশোকনাথ শাস্ত্রী তাঁর *রস ও ভাব* গ্রন্থে হাস্যরস প্রসঙ্গে বলেছেন বাক্চতুরালি ও বাক্বিন্যাসের মাধ্যমে হাস্যের উদ্রেক হলে তখন তাকে **পুন** বলা হয়। তাই প্রপঞ্চ নামক বীথীর অঙ্গটি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেন **পুনে**র অনুরূপ। ছল নামক বীথীর অঙ্গের মধ্যে অপ্রিয় বাক্যের দ্বারা কোন ব্যক্তির

বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত উক্তি যা বিদগ্ধজনের হাস্যের উদ্রেক ঘটিয়ে থাকে। অর্থাৎ ছল নাম ও বীথীর অঙ্গের মাধ্যমে অপ্রিয় বাক্যের মধ্যে অর্থের গভীরতা ও বুদ্ধির চাতুর্য লক্ষ্য করা যায়। চাতুর্যপূর্ণ ছলনার মাধ্যমে বিদগ্ধজনের মধ্যে হাস্যের উদ্রেক ঘটায়। অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে **উইটের** মাধ্যমে বিস্মিত, চমৎকৃত, সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্বারা সূক্ষ্ম ভাবনাকে প্রকাশ করা হয় যার মধ্যে দিয়ে হাস্যের উদ্রেক ঘটে। আর এই ভাবকে প্রকাশ করা ও বোঝার মতো ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে বিদগ্ধজনের মধ্যে। ছল ও **উইটে**র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য বর্তমান ছল ও **উইট** একে অপরের অনুরূপ। বাক্‌কেলি নামক বীথীর অঙ্গের মধ্যে চাতুর্যপূর্ণ উক্তি ও প্রত্যুক্তির মাধ্যমে হাস্যের উদ্রেক ঘটানো হয়। এই অঙ্গের মধ্যে বুদ্ধির চাতুর্য বিদ্যমান হেতু বাক্‌কেলি **উইটে**র অনুরূপ। নালিকা নামক বীথীর অঙ্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হবার পর সেই অর্থকে চাতুর্যপূর্ণ বুদ্ধির দ্বারা কিংবা হেঁয়ালির দ্বারা সেই প্রকাশমান অর্থকে আবৃত করে উত্তর দেওয়া। এরমধ্যে বুদ্ধি চাতুর্য লক্ষণীয়। তাই নালিকা নামক বীথীর অঙ্গটি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের **উইটে**র অনুরূপ। ব্যাহার নামক বীথীর অঙ্গের মূল বৈশিষ্ট্য হলো পরের উপকারের জন্য কখনো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আবার কখনো উদ্দেশ্যহীনভাবে বাক্যের মাধ্যমে নির্মল হাস্যের সৃষ্টি করা। ব্যাহার প্রসঙ্গে বিশিষ্ট  সমালোচক শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল বলেছেন-

মাৎসর্য, দ্বেষ প্রভৃতি সাধারণ হাস্য কারক মনোভাব হইতেও অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণীর হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ব্যাহার নামক বীথীর অঙ্গ হইতে এই শ্রেণীর হাস্যের সন্ধান পাওয়া যায়।[৮১]

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে **হিউমার** উচ্চ শ্রেণীর হাস্যরসের অন্তর্গত। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অশোকনাথ শাস্ত্রী **হিউমার**কে উন্নত স্তরের হাস্যের সাথে তুলনা করেছেন। উন্নত স্তরের ও উচ্চ শ্রেণীর হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাহার নামক বীথীর অঙ্গ এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের **হিউমার**

পরস্পরের অনুরূপ। নর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছ, নিপুণ ক্রিয়ায় রসিকেরা সন্তুষ্ট হন সেই বাক্যের দ্বারা কিংবা বেশভূষার দ্বারা হাস্যের উদ্রেক ঘটানো হয়। রসিকজনের বা সহৃদয়ের মধ্যে হাস্যের উদ্রেক ঘটানোর জন্য নিপুণ  বাক্যের প্রয়োজন। আর এই নিপুণতার মধ্যে বুদ্ধির চাতুর্য একান্ত ভাবে লক্ষণীয়। নর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত বুদ্ধির চমকপূর্ণ উক্তির বৈচিত্র্য যা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে **উইটে**র সাথে ভাবগত সাদৃশ্য বর্তমান। তাই নর্ম ও **উইট** একে অপরের অনুরূপ। উৎপ্রাসন নামক নাট্যালঙ্কারের মধ্যে হাস্যরস বিদ্যমান থাকলেও তাতে উপহাসের মাধ্যমে তীক্ষ্ণ, বিদ্রূপ ও কটূক্তির নিদর্শন বর্তমান। অর্থাৎ তীক্ষ্ণ, তীব্র ও কটূক্তি বাক্যের মাধ্যমে অন্যকে উপহাস করা। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য **স্যাটায়ারে**র মাধ্যমে বিদ্রূপ, আক্রোশ, বা খোঁচা দিবার ইচ্ছা অধিকতর স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। ভাবগত সাদৃশ্যের দিক দিয়ে উৎপ্রাসন ও **স্যাটায়ার** একে অপরের অনুরূপ। পণ্ডিত শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে-

**ল্যামপূণ** অর্থাৎ কুরুচিপূর্ণ কুৎসা ব্যক্তিগত বিদ্রূপ এটি ভঙ্গির অপকৃষ্ট রূপ। ‘সংস্কৃত সাহিত্যের উৎপ্রাসন’ নামক নাট্যালঙ্কার এই জাতীয় মনোভাবের প্রকাশক।[৮২]

উপরি উক্ত আলোচনার মাধ্যমে একথা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের যেসকল নিদর্শন পাওয়া যায় এবং ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে হাস্যরসের যে অবান্তর ভেদ বর্তমান থাকলেও উভয়ের মধ্যে অপূর্ব ঐক্য বিদ্যমান রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের হাস্যরস ও ইংরেজি সাহিত্যের হাস্যরসের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য বর্তমান না থাকলেও উভয়ের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাই সাহিত্য সমালোচক শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল এ প্রসঙ্গে বলতে চেয়েছেন, হাস্যরস বলতে **হিউমার**কে বুঝিয়েছেন। ব্যাহাররের সাথে **হিউমারের** ভাবগত সাদৃশ্য বর্তমান। প্রহসন, উৎপ্রাসন ইত্যাদির মধ্যে বিদ্রূপ, উপহাস ও আক্রমণাত্মক মনোভাব বিদ্যমান। সংস্কৃত সাহিত্যের হাস্যের উপরি উক্ত ভেদ গুলির সাথে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে **স্যাটায়ার**, **ল্যামপূণ**, **বারলেসকিউ** ইত্যাদির

ভাবগত সাদৃশ্য, প্রপঞ্চ, ছল, নালিকা, বাক্‌কেলি, নর্মের সাথে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে **উইটে**র ভাবগত ঐক্য দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

প্রাচ্য দেশীয় সাহিত্যের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গের সাদৃশ্য এই নিগূঢ় সংযোগটিকেই ফুটাইয়া তুলিতে সহায়তা করে।[৮৩]

প্রাচীন আলঙ্কারিক আচার্য ভরত রসপ্রস্থানের প্রবক্তা। তিনি *নাট্যশাস্ত্রে*র "রসবিকল্প" নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে আটটি মতান্তরে নয়টি রসের কথা স্বীকার করেছেন। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনাও করা হয়েছে। শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর, বীভৎস এই প্রধান চারটি রসের অনুকৃতি ও কর্ম থেকে অন্য চারটি রস যেমন হাস্য, করুণ, অদ্ভুত ও ভয়ানক ইত্যাদি রসের উৎপত্তি হয়। আচার্য ভরত শৃঙ্গারের অনুকৃতি থেকে সৃষ্ট হাস্যরসকে ক্রমবিচারে শৃঙ্গার এরপর হাস্যরস স্থান দিয়েছেন। এর থেকে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর, বীভৎস প্রভৃতি চারটি রসকে প্রধান হিসেবে মর্যাদা দিলেও হাস্যরস যে সংস্কৃত সাহিত্যে তত্ত্বগত দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে একথা স্পষ্ট। আচার্য অভিনবত্বগুপ্ত হাস্যরস প্রসঙ্গে বলেছেন-

এতেন সর্বে রসা হাস্যেঽন্তর্ভূতা ইতি দর্শিতম্।[৮৪]

আচার্য গোপালচন্দ্র মিশ্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

হাস্য যে শুধু নবসের মধ্যে একটি জায়গা করে নিয়েছে তা নয়, ভারতীয় আলংকারিকেরা অন্যতম প্রধান মনোবৃত্তি রূপে 'হাস'কে স্থায়ীভাবের শিরোপাটিও দিয়েছে।[৮৫]

আবার *নাট্যশাস্ত্রে*র টীকাকার আচার্য অভিনবগুপ্ত হাস্যরস প্রসঙ্গে বলেছেন-

হাস নামো বিনোদাত্মকো ভাবঃ।[৮৬]

অর্থাৎ হাস নামক ভাব থেকে বিনোদ। একই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন-

হর্ষাদিভ্য হাসঃ।[৮৭]

অর্থাৎ হাস থেকে হর্ষের সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক J. Sully হাস্যরসের উপযোগিতা প্রসঙ্গে বলেছেন-

As a characteristic group of facial movements, the smile is excellently well suited for its purpose-the primitive and most universal expression of a pleasurable or happy state of mind.[৮৮]

অর্থাৎ হাস্যরসের মূল উদ্দেশ্যই হলো সামাজিক জীবনের পুষ্টিবিধান এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যিক আনন্দ দান। তাই হাস্যরসের তাৎপর্য ব্যাপক।

**উল্লেখপঞ্জি**


১. H. Bergson, *Laughter an Essay on the Meaning of the Comic*, pp-4

২. M. Shastri, *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, pp-340

৩. *তদেব*

৪. *তদেব*, pp-286

৫. *তদেব*, pp-271

৬. R. Mukherji, *Literary Criticism in Ancient India*, pp-264

৭. M. Shastri, *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, pp-341

৮. *তদেব,* pp-341

৯. *সাহিত্যদর্পণ*, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা- ১৩৬

১০. R. Mukherji, *Literary Criticism in Ancient India*, pp-271

১১. M. Shastri, *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, pp-348

১২. *সাহিত্যদর্পণ*, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা-১৪১

১৩. R. Mukherji, *Literary Criticism in Ancient India*, pp-266

১৪. M. Shastri, *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, pp- 343 & 344

১৫. *সাহিত্যদর্পণ*, তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৬. M. Shastri, *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, pp-276

১৭. Ganganath Jah, *Kāvyaprāsha of Ṃammaṭā*, pp-52

১৮. R. Mukherji, *Literary Criticism in Ancient India*, pp-264

১৯. P. V. Kane, *History of Sanskrit Poetics*, pp-356

২০. R. Mukherji, *literary Criticism in Ancient India,* pp-265

২১. *তদেব*

২২. *সাহিত্যদর্পণ*, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা-২

২৩. *রসগঙ্গাধর*, প্রথম আনন

২৪. R. Mukherji, *literary Criticism in Ancient India,* pp-316

২৫. M. Shastri, *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, chapter 6, Śloka-15, pp-266

২৬. *তদেব*, Śloka- 40 & 41, pp-293 & 296

২৭. *তদেব*, pp-699

২৮. K. P. Mishra, *Aesthetic Philosophy of Abhinavagupta*, pp-148

২৯. M. Shastri *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, pp-695

৩০. *তদেব*, pp-309

৩১. *নাট্যদর্পণ*

৩২. M. Shastri *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, pp-306

৩৩. *তদেব*, pp-330

৩৪. A. A. Macdonell, *The Energies of men*, pp- 97 & 98

৩৫. J. Drever, Psychology *of Everyday life,* pp-32

৩৬. S. James, *An Essay on Laughter,* pp-26

৩৭. দিলীপকুমার. কাঞ্জিলাল, *সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস*, পৃষ্ঠা-৩৩

৩৮. M. Shastri, Nāṭyaśāstra *of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, pp- 310

৩৯. *তদেব*, pp-633

৪০. *তদেব*, Śloka- 41, pp-311

৪১. *অভিনবভারতী* প্রথমখণ্ড

৪২. W. Hazlitt, *Lecture on English Comic Characters*, pp-9 & 10

৪৩. *সাহিত্যদর্পণ*, তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৪৪. S.H. Butcher, *Aristotle's theory of poetry and Fine arts*, pp- 374 & 375

৪৫. H. Bergson, *Laughter an Essay on the Meaning of the Comic*, pp-1

৪৬. W. Hazlitt, *Lacture on English Comic Characters*, pp- 40 & 41

৪৭. *নাট্যশাস্ত্র*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা- ২৬৪, ২৬৫

৪৮. M. Shastri, Nāṭyaśāstra *of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, pp-345

৪৯. H. Bergson, *Laughter an Essay on the Meaning of the Comic*, pp-23

৫০. *সাহিত্যদর্পণ*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ২৬৪, ২৬৫

৫১. *নাট্যশাস্ত্র, অভিনবভারতীটীকা*, দ্বিতীয়খণ্ড

৫২. *Hindi Natya Darpan,* by Ramchandra Gunachandra, pp-230

৫৩. *তদেব*, pp-226

৫৪. *সাহিত্যদর্পণ*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৫৫. *তদেব*

৫৬. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-২৫৮

৫৭. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-২৫৯

৫৮. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-২৬১

৫৯. *তদেব*

৬০. *তদেব*

৬১. *তদেব*

৬২. *তদেব*

৬৩. দিলীপকুমার. কাঞ্জিলাল, *সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস*, পৃষ্ঠা-১২১

৬৪. *সাহিত্যদর্পণ*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৬৫. *তদেব*

৬৬. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-২০১

৬৭. W. M. Thackeray, *The English Humourists of the Eighteenth Century*, pp-2

৬৮. *The Carlyle Encyclopaedia*, pp-228

৬৯. *সাহিত্যবিতান*

৭০. *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী*, প্রথমখণ্ড

৭১. A. H. Abrams, *A Glossary of Literary Terms*, pp-159

৭২. অজিতকুমার. ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃষ্ঠা-৩৫

৭৩. A. E. Dyson, *Comedy Developments in Criticism*, pp-42

৭৪. কুন্তল. চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* পৃষ্ঠা-৫৭

৭৫. অজিতকুমার. ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা,* পৃষ্ঠা-৩২

৭৬. E. Albert, *A History of English Literature*, pp-38

৭৭. D. J. Palmer, *Comedy Development of Criticism, pp*-42

৭৮. মোহিতলাল. মজুমদার, *সাহিত্যবিতান*

৭৯. দিলীপকুমার. কাঞ্জিলাল, *সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস,* পৃষ্ঠা-১২৭

৮০. S. James, *An Essay on Laughter,* pp-27

৮১. দিলীপকুমার. কাঞ্জিলাল, *সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস,* পৃষ্ঠা-১১৯

৮২. *তদেব,* পৃষ্ঠা-১২৭

৮৩. *তদেব,* পৃষ্ঠা-১৩১

৮৪. M. Shastri, *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, pp- 310

৮৫. গোপালচন্দ্র. মিশ্র, *সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা: বিবিধ প্রসঙ্গ*, পৃষ্ঠা-৪০

৮৬. M. Shastri, *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, pp- 796

৮৭. *তদেব,* pp-793

৮৮. J. Sully, *An essay on laughter*, pp-27

# তৃতীয় অধ্যায়

## সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসকে কাল অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস অপরটি লৌকিক সাহিত্যের ইতিহাস। বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি, বেদের বিভাগ (মন্ত্র বিভাগ ও ব্রাহ্মণ বিভাগ), উপনিষদ ও ব্রহ্মবিদ্যা, বেদের ষড়ঙ্গ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। লৌকিক সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকাব্য পুরাণ, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র, কাব্যসাহিত্য যথা দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্য কাব্য (পদ্য, গদ্য, চম্পুকাব্য, খণ্ডকাব্য) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। গল্পসাহিত্য লৌকিক সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত। কিন্তু গল্পের পারিভাষিক শব্দ-আখ্যান, আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, কথা, কথানক, কাহিনী, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ইত্যাদি তত্ত্বগত দিক দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যের কোন অংশের অন্তর্গত এটি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন।

### ১.১ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস অবলম্বনে ‘গল্প’ শব্দটির ব্যাখ্যা

আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* নামে অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে কাব্যের দুই প্রকার ভেদের কথা উল্লেখ করেছেন-

দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধামতম্[১]।

এর মধ্যে শ্রব্যকাব্য দুইভাগে বিভক্ত । আবার শ্রব্যকাব্য পদ্য ও গদ্য ভেদে দুই প্রকার। আচার্য বিশ্বনাথ গদ্যকাব্যের চারপ্রকার ভেদের কথা বলেছেন- মুক্তক, বৃত্তগন্ধি, উত্কলিকাপ্রায়, চূর্ণক ইত্যাদি। তত্ত্বগ্রন্থে এইভাগ গুলি নিয়ে মতপার্থক্য আছে। গদ্যকাব্যকে আবার কথা, আখ্যায়িকা এই দুভাগে ভাগ করা হয়। আচার্য ভামহ গদ্যকাব্যের এই ভেদ দুটিকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করলেও আচার্য দণ্ডী ও বিশ্বনাথ কথা, আখ্যায়িকা এই ভাগ দুটিকে আখ্যান ভাগের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আচার্য বিশ্বনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

আখ্যানদ্বয়শ্চ কথাখ্যায়িকয়োরেবান্তর্ভাবান্ন পৃথগুক্তাঃ[২]।

আচার্য দণ্ডী *কাব্যাদর্শ* নামক অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে বলেছেন-

তত্রৈবান্তর্ভবিষ্যন্তি শেষাশ্চাখ্যানজাতয়ঃ।[৩]

অর্থাৎ অবশিষ্ট গদ্যকাব্যগুলিকে আখ্যান শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আচার্য বিশ্বনাথ ও দণ্ডীর মতকে অনুসরণ করে *পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতিকে* আখ্যান শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কথা, আখ্যায়িকা নামক দুটি পৃথক গদ্যকাব্যের কথা বলা হলেও শেষপর্যন্ত তার পৃথকত্ব রক্ষিত হয়নি। আলঙ্কারিক দণ্ডী এ বিষয়ে বলেছেন কথা, আখ্যায়িকা এক জাতি। আচার্য হেমচন্দ্র *কাব্যানুশাসন* নামক অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে কথার লক্ষণ প্রসঙ্গে 'মণিকুল্যা' নামে এক প্রকার বিশেষ কথার লক্ষণ করেছেন।

সংস্কৃত *শব্দকোষে*[৪] আখ্যায়িকা, আখ্যানক, কথা, প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

- *Ākhyāyikā* – This word occurs apparently but once in the Vedic Literature in the late *Taittiriya Āraṇyaka*, where its significance is doubtful.

- *Ākhyāna* – In the *Aitareya Brāhmaṇa* we hear of the story of *Śunaḥśepa.* The *Aitareya Brāhmaṇa* mention also *Ākhyāna* –vids [men versed in tales].
- *Kathā* - The latter use of this word in the sense of a Philosophical discussion appears in the *Chāndogya Upaniṣad.*

অন্যত্র ইংরেজি *শব্দকোষে*[৫] বলা হয়েছে-

- *Ākhyāyikā* – A connected story or narrative, A tale, Fable.
- *Ākhyānaṃ* – Allusion to some old tale, Atale, Story, especially a legendary story.
- *Ākhyānkaṃ* - Atale, A short legendary narrative, As episode
- *Kathā* - A tale, Fable, Story, Feigned story.
- *kathānkṃ* - A small tale e.g *Vetālapañchavimsati*

উপরি উক্ত আলোচনার মাধ্যমে বোঝা গেল- আখ্যায়িকা, আখ্যানক, আখ্যান, কথা, কথানক, ইতিহাস, কাহিনী, সংবাদ, পুরাণ, আগম, জাতক, শতক ইত্যাদি শব্দকে পৃথক পৃথক নামে অভিহিত করা হলেও যার অর্থ আপেক্ষিক অর্থে এক। আখ্যান, উপাখ্যান, গল্প বা কাহিনী বলতে কোনও একটি ঘটনা বা ধারাবাহিক সম্পর্কযুক্ত একাধিক ঘটনার লিখিত বা কথিত বর্ণনাকে বোঝায়। এটি গদ্যসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে মধ্যযুগে ইতালিতে ছোট ছোট গল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। ল্যাটিন ভাষায় সেগুলি বিচিত্র নামে পরিচিত যেমন- exempula, parabula, fabula, historia, legenda, ইত্যাদি। ফরাসি ভাষায় এই জাতীয় গল্পসাহিত্যকে বলা হয় contes এবং fablia বলা হয়। ল্যাটিন ভাষায় এই জাতীয় গল্পকে exemplum অথবা আবার parabula বলা হয়। ইংরেজি সাহিত্যে Tale, Fable, Story বলা হয়েছে। এগুলি আলাদা আলাদা নামে আভিহিত করা হলেও তাদের অর্থ এক। পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতেরা গল্পসাহিত্য সম্পর্কে একটি সুন্দর ইটালিয়ান শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হলো-novelaa। ফ্রান্সেও বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছিল novelle বা novela নামক এক ক্ষুদ্র গদ্যের আখ্যানরূপ। ইতালীয় Novella উদাহরণ হিসেবে *সহস্য এক আরব্য রজনী* অথবা *Novel of the seven sage* র কথা বলা হয়েছে। ইউরোপীয় ভাষায় এই শব্দটির সমপর্যায়ভুক্ত অনেক শব্দ আছে, সেগুলি হলো- novell, novela, novelle, novel কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ইউরোপীয় শব্দগুলি যে অর্থে ব্যবহৃত করেছেন তা হলো ছোটগল্পের সামান্য বিস্তৃত সংস্করণ। সৃজনী গদ্য সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শিল্পরূপ ছোটগল্প বা Short Story। যাকে সহজ করে বলা যেতে পারে সংক্ষিপ্ত গদ্য আখ্যায়িকা। ছোটগল্পের জনকপ্রতিম মার্কিন লেখক Edgar Allan Poe সংজ্ঞা অনুসারে ছোটগল্প হলো prose tale। ভয়, আতঙ্ক ও বর্বরতার যুগের এই ছোটগল্পের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া এবং ব্যঞ্জনাধর্মীতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই তাঁকে মার্কিনী সাহিত্যের 'জনক' রূপে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর রচিত গল্পগুলি মূলত ঘটনা প্রধান এবং আখ্যানমূলক। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে Oxford কোষগ্রন্থের সংযোজন অংশে স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্য রূপের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তবে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *সাহিত্যে ছোটগল্প* গ্রন্থে প্রতীচ্যের লেখক Washington Irving এর *Rip Van Winkle* এবং *Nathaniel Hawthorne* এর *The Celestial Railroad* রচনায় ইতিহাসগত ভাবে ছোটগল্পে

সূচনা হয়। বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান বা ঘটনামূলক ধারাকে প্রবাহিত করেছিলেন প্রাথমিকভাবে প্রমথ চৌধুরী। তিনি ফরাসি গল্পের ধারাকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণ না করলেও তার পথপ্রদর্শক হিসেবে লেখক Les Ames du Pargatorie এবং La Vénus d'Ille রচিত *Prosper Mérimée*র একটি গল্প *ফুলদানী* গল্পকে বাংলায় অনুবাদ করে আধুনিক ছোটগল্পের আদর্শ তুলে ধরেছেন। *সাহিত্যের রূপ- রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* গ্রন্থে সাহিত্য সমালোচক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় গল্প প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। আধুনিক ছোটগল্পের বীজ নিহিত ছিল নীতিগল্প (fable/exemplum), ব্যঙ্গ উপকথা বা রূপকথা (folktale/fairytale), ব্যঙ্গধর্মী কাব্য কাহিনী (fabliau) ইত্যাদির মধ্যে। *The Bible* অন্তর্গত *Old Testamen*এর *Joseph*, *Samson*, *Absalom*, এবং *New Testament* এর অন্তর্গত রূপকধর্মী অনুগল্প (parable) গুলির মধ্যে প্রধানত নীতি ও ধর্ম প্রচারের অভিপ্রায় গৃহীত হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রাচীন মিশরে বিনোদন ধর্মী প্রাচীন মিশরীয় গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়, আরো পরে গ্রীস ও রোমে নানা ধরনের গল্পের সমাহার পরিলক্ষিত হয়। নবজাগরণপর্বে ইতালি ও ফরাসি গদ্য সাহিত্যে Decameron জাতীয় গল্পের প্রভাব ছিল অপরিসীম। পরবর্তীকালে Decameron অনুকরণে ইতালি ও ফ্রান্সে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল novelle এবং novela.

সংস্কৃত সাহিত্যে আচার্য দণ্ডী ও বিশ্বনাথ *পঞ্চতন্ত্রাদি* প্রভৃতি গদ্যকাব্য গুলিকে কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে কোন একটিতে অন্তর্ভূক্ত করেনি। তাঁরা এগুলিকে আখ্যান ভাগের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। Tale, Fable, Story কে বাংলা সাহিত্যে গল্প নামে অভিহিত করা হয়। *A History of Sanskrit Literature Classical Period* গ্রন্থে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A. A. Macdonell *পঞ্চতন্ত্র* প্রভৃতি গদ্যকাব্য গুলিকে Fairy tales and Fables, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A. B. Keith সাহেব গল্প বা কথা সাহিত্যকে Romantic tale and the didactive tale নামে অভিহিত করেছেন,

ভারত তত্ত্ববিদ S. N. Dasgupta & S. K. De এগুলিকে The Popular Tale এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন । আচার্য ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে *পঞ্চতন্ত্র* প্রভৃতিকে কথা সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। পণ্ডিত সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী তাঁর রচিত *হিতোপদেশ* গ্রন্থের ভূমিকায় সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের অন্তর্গত কথাগুলিকে পশু-পাখিরগল্প ও মানুষেরগল্প এই দুটি ভেদের কথা বলেছেন। আবার তিনি এও বলেছেন যে এই সীমারেখা অনেক ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়নি গল্পসাহিত্যকে অনেকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন- ক)পশুপাখি অবলম্বনে রচিত নীতিকথা খ) মানুষ, গন্ধর্ব, দৈত্য প্রভৃতি নিয়ে লেখা রূপকথা এবং গ) জনপ্রিয় লোক কথা। এগুলিকে ইংরেজি সাহিত্যে যথাক্রমে Fables, Fairy Tales, Popular tales নামে অভিহিত করা হয়েছে। *History of Sanskrit Literature* গ্রন্থে সমালোচক M. Krishnamachaya Fable, Fairy Tales কে *Kathānka* বলে অভিহিত করেছেন। আবার একই গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন –

Closely allied to *Gaḍya Kāvya* in the style of prose and *Nītikāvya i*n impair are the Fables, they are the specie's of Romance called technically *Kathā*. I have used the term *Kathānaka.*[৬]

বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য *সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা* (প্রথম ভাগ) গ্রন্থে গদ্য সাহিত্যকে fable, romance, tale এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এবং নীতিমূলক গদ্য রচনাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন সেগুলি হলো অবদান গ্রন্থ ও পশু-পাখিরগল্প। *সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস* গ্রন্থে পণ্ডিত শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল *পঞ্চতন্ত্র* প্রভৃতাদিকে আখ্যান বা কাহিনীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। উপকথা, রূপকথা, পুরাকাহিনী ইত্যাদি নানা আখ্যান পৃথিবীর সকল ভাষায় মানুষদের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির স্মরণীয় সম্পদ। আখ্যান প্রসঙ্গে

বিশিষ্ট সমালোচক সম্রাট দত্ত তাঁর *বিংশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস* গ্রন্থে Jean-Francois Lyotard মতের উল্লেখ করেছেন। আখ্যান হলো জ্ঞানের ধরণ। এর মাধ্যমে সমাজে জ্ঞান ব্যক্ত ও সঞ্চারিত হয় সুতরাং জ্ঞানের বিভিন্ন সম্ভাবনাকে আখ্যান সংজ্ঞাত করে। কোনো গোষ্ঠী বা সমাজের আখ্যান সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বা না থাকার জন্য স্বদেশী ও বহিরাগত ব্যক্তির মধ্যে তফাৎ হয়ে যায়। আখ্যান হলো অস্তিত্বের কালগত ক্রমের দ্যোতক। মানুষ আখ্যান কথনের মাধ্যমে স্মৃতি–সত্তা-ভবিষ্যতের ধারণা করতে পারে। আখ্যানে উপস্থাপনের ক্রমনির্বিশেষে প্রকৃত কালক্রমিক ঘটনাবলী এবং এই ঘটনাবলীতে অংশগ্রহণকারী চরিত্র ও বিষয় এসবের সমাবেশ হলো কাহিনী বা গল্প। পরিশেষে বলা বলা যেতে পারে যে সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে কথা (খণ্ডকথা, পরিকথা), কথানক, আখ্যায়িকা, আখ্যান, আখ্যানক, ইতিহাস, পুরাণ, আগম, জাতক এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে Fable, Tale, Parable, Fairy Tale, Fairy Story, Story প্রভৃতি শব্দ সাধারণভাবে গল্প বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। তাই বলা হয়েছে-

..... the terms *Kathā* and *Ākhyāyikā* are employed here in general sense of a story. A rigid differentiation, however, cannot perhaps be made in practice between the Fable and the Tale; for the different elements in each are not entirely excluded in the other, nor isolated.[৭]

## ১:২ গল্পসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

সাহিত্যের মধ্যে দেশ, কাল, স্থান, পাত্র প্রভৃতি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে। বাস্তব জগতের নানা ছোটখাটো ঘটনা বা লোকসাহিত্যের কাহিনীকে কেন্দ্র করে গল্পগুলির

প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। কল্পনা ও রূপকথার সংমিশ্রণে কবি গল্পসাহিত্যের রচনা করেন। গল্পসাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য হলো আমোদ প্রদানের মাধ্যমে নীতি শিক্ষা দান। আর সেই নীতি শিক্ষা দানের প্রক্রিয়া শুরু হয় কিশোর বয়স থেকেই। শিশু চিত্ত সাধারণত শব্দ ঝংকার ও ছন্দেই মুগ্ধ হয়, ভাবের গভীরতা ডুব দেওয়ার বোধশক্তি তখন তাদের জন্মায় না, এটি হলো অপরিণত মনের স্বভাব। তাই শিশু চিত্তের চিত্তাকর্ষক করে তোলার জন্য গল্পসাহিত্যের মধ্যে রূপকের প্রয়োজন। গল্পগুলির চরিত্রের মধ্যে রূপকের সাহায্যে কখনো পশুপাখি, কখনো জীবজন্তু প্রভৃতি চরিত্র আবার কোন কোন গল্পে মনুষ্য চরিত্রকে অবলম্বন করা হয়েছে। অলৌকিক ও অসম্ভব ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে কবি প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জগতের অর্থাৎ লৌকিক জগতের আদর্শ, সনাতন নীতির প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন। রূপকের মাধ্যমে জীবন ও সত্যের সংমিশ্রণে বিকশিত হয়ে ওঠে সমাজের চিরন্তন নীতি। গল্পগুলির মাধ্যমে নিত্যকালীন মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের তত্ত্বটি সন্নিহিত থাকে। সামাজিক সত্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গল্পের মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্বকে সচেতনের চেষ্টা করেন, যারা আসল উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে সংযত করা। অত্যন্ত সরল ভাষায় এবং মনোরম কাব্য নৈপুণ্যের দ্বারা গল্পের উপস্থাপন করা হয়। গল্পগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ, বৈচিত্র্যমণ্ডিত, অনতিদীর্ঘ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। গল্পগুলির মধ্যে উচ্চ প্রবাহিত প্রেমের কাহিনী পরিত্যাগ করা হয়েছে। তীক্ষ্ণ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং হাস্যরসের বৈচিত্র্য গল্পগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মূল গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে বহু ছোট ছোট গল্পের সন্নিবেশ। প্রতিটি গল্পের আকার এবং নীতিবাক্য অতি হৃদয়গ্রাহী। প্রত্যেকটি গল্পে একটি প্রত্যক্ষ বার্তা থাকে যা আবশ্যই চিন্তনীয় ও শিক্ষণীয়। ভারত তত্ত্ববিদ S. N. Dasgupta & S. K. De গদ্যসাহিত্যের অন্তর্গত *পঞ্চতন্ত্র* নামক গল্পসাহিত্য সম্বন্ধে বলেছেন-

But the most unassuming, and yeah, it's the most interesting, prose literature of this period is exemplified by a small number of popular tales, which continue the simpler prose tradition of the *Pañcatantra*, and contain racy stories of common life and folktale, denuded of high -flown romance but sublimated with myth and magic, and enforced with pithy gnomic verses of epigrammatic wit.[৮]

অর্থাৎ *পঞ্চতন্ত্রের* গল্পগুলি সহজ গদ্য ভাষায় রচিত যা গল্পসাহিত্যের ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখে এবং এতে সাধারণ জীবন ও লোককথার বর্ণাঢ্য কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পে উচ্চ-প্রবাহিত প্রেমের কাহিনী পরিত্যাগ করা হয়েছে। রূপকথার আলোকে কাহিনীগুলি উজ্জীবিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গল্পসাহিত্যের মধ্যে একদিকে থাকে তত্ত্বকথা বিতরণের কর্তব্য অন্যদিকে থাকে সাহিত্যরস সিঞ্চনের অধিকার। কবিমনের বহুবিধ প্রশ্ন, অনুভূতি, পাণ্ডিত্য ও শিল্পচেতনার সমন্বয়ে সাহিত্য বাঙ্ময়রূপ লাভ করে। বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার জগত অধিক রমণীয় হয়। গল্পগুলির মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে জড় ও চেতন জগতের উপস্থিতিতে সহৃদয়ের চিত্তবিনোদন করে এক বিচিত্র রসের সৃষ্টি করে। সাহিত্য ও রসের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ বিদ্যমান। আসলে কাব্যজগতে সহৃদয় পাঠকগণের মন লৌকিক জগৎ থেকে অলৌকিক জগতের দিকে ধাবিত হয়। কবি প্রতিভার দ্বারা লৌকিক জগতের ঘটনা সাহিত্যে বাঙ্ময়রূপ লাভ করে। বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে পাঠক ও শ্রোতার মনে ভালো লাগার সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A. A. Macdonell বলেছেন-

It is an imaginary world full of marvellous and complicated fairy tales, of wit in the invention of serious and comic science of wealth of fancy in

the creation of ever new material in the story of romance. This is in fact the most original department of Indian literature.[৯]

অর্থাৎ গল্পসাহিত্যে আছে কাল্পনিক জগৎ যা বিস্ময়কর এবং রূপকথার গল্পে পূর্ণ। বুদ্ধির গম্ভীর এবং হাস্যরসাত্মক উপাদানের সংমিশ্রণে গল্পসাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যে মৌলিকত্বের পরিচয় দেয়।

## ১:৩ গল্পসাহিত্যে নীতিশিক্ষা

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ হিসাবে *ঋগ্বেদের* নাম উল্লেখযোগ্য। *ঋগ্বেদকে* সংকলন রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক V. S. Ghate বলেছেন-

I have to warn you that when we call the Ṛig Veda, a book we must not understand the statement literally. If a book means a work written by one man, implying unity of time and ideas well, the Rig Veda is far from being a book, it is rather a compilation.[১০]

এই প্রাচীনতম *ঋগ্বেদের* মধ্যে আর্যাবর্তের অধিবাসী বহুদর্শী মহর্ষিগণকতৃক তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্য ছিল মূলত ধর্মীয় সাহিত্য, বৈদিক মন্ত্র গুলি যাগ-যজ্ঞ সম্পর্ককৃত কোন না কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে ধর্ম ভাবনামুক্ত লৌকিক সাহিত্য উপাদান বর্তমান থাকলেও কালক্রমে সেগুলি ধর্মাচারের অন্তর্ভুক্ত হয়। ধর্মীয় সাহিত্যরূপে বেদকে ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রকার গৌতম ও *মনুসংহিতায়* বেদকে ধর্মের মূল বলেছেন। বেদে ধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম বিধানের নির্দেশ বর্তমান। আরণ্যক ও উপনিষদে আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা হলো প্রধান আলোচ্য

বিষয়। যার মধ্যে জীবন সত্যের নিগূঢ়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। যার বোধগম্য সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। বৈদিক আরণ্যক, উপনিষদের প্রাচীন আর্য ঋষিগণের অধ্যাত্ম দর্শন, পরমাত্মা ও জীবাত্মার তত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে। বৈদিক সাহিত্যে ঐতিহ্যবাহী চিন্তা ধারায় ধর্মভাবনা মিশ্রিত জীবন ও সংস্কৃতির নানা তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্য বিচারে এইগুলি সম্পূর্ণরূপে নিরস বৈচিত্র্যহীন। এজন্যই বৈদিক সাহিত্যে প্রয়োজনীয় সাহিত্য উপাদানের আকরগ্রন্থ হলেও জনসমাজে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারিনি, যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল *রামায়ণ, মহাভারত*, পুরাণ, জাতক, অবদান ও তৎপরবর্তী যুগের সাহিত্য। *রামায়ণ, মহাভারত*, পুরাণ, জাতক, অবদান ও তৎপরবর্তী যুগের সাহিত্যের অগ্রদূত হিসেবে বৈদিক সাহিত্য চিহ্নিত হয়েছে। বৈদিক যুগের পরবর্তী সাহিত্য ছিল যজ্ঞাচারমুক্ত এবং ধর্মীয়ভাব মুক্ত। এই জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে দার্শনিক মনোভাব, ধর্মীয় চিন্তন ও তত্ত্বকথা যুক্ত নয় বলে জনসাধারণের দ্বারা অধিক সমাদৃত । আখ্যান জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে নীতিশিক্ষার সাথে ধর্মবোধের চিন্তাধারা *ঋগ্বেদের* যুগ থেকে শুরু করে *বাল্মীকিরামায়ণ, বৈয়াসিকমহাভারত*, পুরাণ ও তৎপরবর্তী সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও আখ্যান ও উপাখ্যানের গল্পগুলির মধ্যে নীতিবোধ ও ধর্মবোধকে মিশ্রিত করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে আচার্য S. N. Dasgupta বলেছেন-

It closely related to the *Nīti Śastra* and *Artha Śastra* but it is not directly opposed to the *Dharma Śastra.*[১১]

অর্থাৎ গল্পসাহিত্যগুলি নীতিশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেও তবে এগুলি ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী নয়। নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি বিধানের পাশাপাশি নীতিমূলক গল্প বা কথা সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুদের নীতিশিক্ষা দান, তাই *হিতোপদেশে* বলা হয়েছে-

কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।[১২]

এই প্রসঙ্গে কবি নারায়ণ শর্মা বলেছেন-*হিতোপদেশ* একটা গল্প সংগ্রহ মাত্র নয়, নীতিমূলক গ্রন্থও বটে। রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাজপুত্রদের অর্থ ও নীতিশাস্ত্র সম্পর্কিত শিক্ষালাভ ছিল আবশ্যক। রাজাদের দ্বারা নিযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কোমলমতি রাজপুত্রদের গল্পের মাধ্যমে চিত্তাকর্ষক ভাবে অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দিতেন। গল্পসাহিত্যের সঙ্গে অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের ঘনিষ্ট যোগাযোগের এই হলো মূল কারণ। এদেশে নীতিশাস্ত্রের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আবার কোন কোন পণ্ডিত এই প্রকার গদ্যসাহিত্যকে নীতিমূলক গল্প বা কথা সাহিত্য বলে মনে করেছেন । নীতিমূলকগল্প বা কথা সাহিত্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A. A. Macdonell বলেছেন –

It is, however specially pronounced in fairy and fable. Where the abundant introduction of ethical reflection and proverbial philosophy is characteristic. The apology with its moral is peculiarly subject of this method of treatment.[১৩]

গল্পসাহিত্যের মাধ্যমে মনোরঞ্জন ও শিক্ষাদান উভয়ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নীতিশিক্ষা যেমন একদিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, পরকেন্দ্রিক ও আর্দশ কেন্দ্রিকের কথা বলে। তেমনি অন্যদিকে নীতিসম্মত ও নীতিবিগর্হিত দুয়ের মধ্যে ব্যবধানটুকু মানুষের কাছে সহজবোধ্য করতে সাহায্য করে। তার সাথে লোকসাহিত্যর প্রভাব লক্ষিত হয়, তাই অন্যতম সমালোচক S. N. Dasgupta বলেছেন-

The frame story .....is simply and cleverly conceived quite in the sprite of the folk tale.[১৪]

নীতিকথা প্রধানত নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। জৈন কবিদের লেখা যা কথানক (নীতিকথা ও রূপক কথার সংমিশ্রণ), বৌদ্ধজাতকের গল্প, ঈশপীয় গল্প, গুণাঢ্য রচিত *বৃহতকথা, পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ-বেতালপঞ্চবিংশতি-সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা-পুরুষোপরীক্ষা-শুকসপ্ততি* ইত্যাদি গ্রন্থে নীতিশক্ষামূলক গল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। ইংরেজি সাহিত্যে নীতিশিক্ষার মূল গ্রন্থ *The Bible*। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৭০ সালে নীতিমূলক কবিতাকে *কথামালার* আকারে প্রকাশ করেন। যা পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার *ঠাকুমার ঝুলি* (২০ শে ভাদ্র, ১৩১৩ সাল) নামক গল্পসাহিত্য বিষেশ উল্লেখযোগ্য। সরল ও অনাড়ম্বর নীতিমূলক গল্প বা কথার সমাবেশে অতি সরল ভাবে সমাজের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে। তা শুধু শিশু মনে নয়, কিশোর, যুবক, প্রাপ্তবয়সের মনজগতে ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। গল্পসাহিত্যের রম্যরচনার মূল উদ্দেশ্য সমাজের নিয়ম-নীতি-মূল্যবোধকে লোকসমাজে তুলে ধরা। সেই সঙ্গে ধরা দেয় কবি বা লেখকের সমাজের প্রতি সূক্ষ্ম চিন্তাধারা। এই গল্পগুলি ন্যায়, নীতি, ত্যাগ, সততা প্রভৃতির আর্দশপ্রচারে মুখ্যভূমিকা পালন করে। কখনও সেগুলি গল্পমাত্র কখনও বা প্রত্যক্ষ ন্যায়নীতি বা আর্দশপ্রচারের বাহন, কখনও বা সাহিত্যগুণ ও নীতিকথার সুচারু সমন্বয়ে পরিপূর্ণ। আমোদ প্রণীত নীতিশিক্ষাই হলো গল্পসাহিত্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। গল্প বা কথা বা আখ্যান সাহিত্যের সূত্রপাত বৈদিক সংহিতার আদিযুগে আবির্ভূত হলেও বিংশ শতাব্দীতে ও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A. A. Macdonell বলেছেন –

This style of narrative was borrowed from India by the neighbouring oriental people of Persian and Arabian, who employed it in composing independent works.[১৫]।

অর্থাৎ আখ্যানের এই শৈলীটি ভারত থেকে ধার করেছিল প্রতিবেশী পারস্য ও আরবের প্রাচ্যের ব্যক্তিগণ। যাঁরা এটিকে স্বাধীনভাবে রচনায় নিযুক্ত করেছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যে নীতিমূলক গল্পসাহিত্য ব্যাপ্তি ও প্রাচীনতার দিক দিয়ে বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বৈদিক সাহিত্য, *রামায়ণ, মহাভারত,* পুরাণ, জাতক, অবদান, বৌদ্ধ ও আগম সাহিত্যের আখ্যান, উপাখ্যান, কথা, কথানক, ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে গল্পসাহিত্য গড়ে ওঠে। গল্পগুলির সরস বিষয়বস্তু সহযোগে বহুবিচিত্র উপাখ্যান রচিত হয়েছিল। যার প্রধান মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সংযত করা। সংযত করার প্রক্রিয়া ছিল অন্যরকম, ধর্মতত্ত্বকে দূরে রেখে কৌতুক রচনার মাধ্যমে নীতিমূলক তথা উপদেশমূলক কাহিনীর উপস্থাপন করা। ঐ সমস্ত কাহিনীর মধ্যে পশুপাখি, জীবজন্তুর প্রভৃতি চরিত্র আবার কখনো কখনো মনুষ্য চরিত্রকে কেন্দ্র করে গল্পগুলির উপস্থাপন করা হত। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বিভিন্ন ভাষায় রচিত গল্পসাহিত্য বিচিত্র নামে পরিচিত ছিলো যেমন- exemplum, parabula, fabula, historia, lengenda, contex, fabiaux, fable, fableau ইত্যাদি। এই সমস্ত গল্পগুলির শেষে একটি নীতিবাক্য বর্তমান থাকে। ইংরেজি সাহিত্যে নীতিবাক্যকে moral এবং ফরাসি ভাষায় নীতিবাক্যকে conte queue বলা হয়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন এইসকল গল্পগুলির সাথে প্রাচ্যের, ঈশপের গল্প ( Aesop's Fables) এবং প্রাচীন কথা কাহিনীর সাথে ভাবগত সাদৃশ্য বর্তমান। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে Decaneron গল্পের মূল উদ্দেশ্যই হলো সমাজকে রক্ষা করা। সেই কারণের জন্য এইসকল গল্পে নৈতিকতার একটা বিশেষ ভূমিকা

বিদ্যমান থাকে। সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ন্যায় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ঐসকল গল্পগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে গির্জার পাদরিরা তাঁদের নীতিবাক্যামৃত উপদেশ দেবার জন্য রূপকধর্মী গল্পের আশ্রয় নিতেন। সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের প্রভাব যে কতটা সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপে সাহিত্য সমালোচক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী *শুকসপ্ততি* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন-

*শুকসপ্ততি*র সাহিত্যিক সরতার গুরুত্ব না থাকলেও তার আখ্যান শৈলীর অন্য এক মাত্রা আছে এবং সে মাত্রা এসেছে আখ্যান গুলির পর্যটনের সূত্র ধরে। আমরা বলতে চাই *শুকসপ্ততি*র কিছু কিছু গল্প এমনই আছে যে, তা শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, সে গল্পগুলি লোকমুখে পর্যটন করতে করতে শুধু ইয়োরোপে গিয়ে পৌঁছেছিল।[১৬]

## ১:৪ গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের নিদর্শন

বাস্তব জগৎ অপেক্ষা কল্পনার জগৎ অতি প্রীতিপদ। গল্পের মধ্যে সম্ভবপর ঘটনাবলী এবং অসম্ভব ঘটনাবলীর উভয়ের মিশ্র সমাবেশে উপস্থাপিত হয় গল্পসাহিত্য। সংস্কৃত সাহিত্যের আলঙ্কারিকগণ রসকে কাব্যজগতকে অলৌকিক মায়ার জগৎ বলে অভিহিত করেছেন। রসের জগৎ হলো অলৌকিক মায়ার জগৎ আর ভাবের জগৎ হলো একেবারেই লৌকিক। লৌকিক জগৎ অলৌকিক জগৎ হয়ে ওঠে কবি-প্রতিভার দ্বারা। সাহিত্যে বাস্তব সত্য বা ঘটনাগত সত্য বিদ্যমান থাকলেও কবি-সাহিত্যিক বাস্তব সত্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকেন না। সাহিত্যে কবি কল্পনা অতিশয় প্রভাবে প্রভাব বিস্তার করলেও মানবিক সত্তা সেখানে পসরা সাজিয়ে বসে। লৌকিক জগতের কারণগুলি বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাবের মাধ্যমে অলৌকিক জগতে রসের সঞ্চার করে থাকে। রসের উপলভ্য কেবলমাত্র অলৌকিক জগতে সম্ভব। সংস্কৃত সাহিত্যে রসের প্রাধান্য

অতিশয় প্রবল। বাস্তবের সব ঘটনা সহৃদয়ে চিত্তে আনন্দ দিতে পারেনা অথচ কাব্যে যে কোন রসই সহৃদয় বা পাঠক চিত্তে আনন্দের সঞ্চার করে থাকে। তাই রসকে একটি মনোরম অনুভূতি হিসেবে দেখা হয়। সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে মানুষের আশঙ্কা আর স্বপ্নের সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি ঘটেছে রূপকথার মাধ্যমে। আসলে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই রূপকের মাধ্যমে মানুষের গল্পসাহিত্যের জয়যাত্রার ইতিহাস রচিত হয়েছে। ইতিহাস রচনার সাথে সাথে হাস্যরসের শুরু হয়েছিল সুদূর প্রাচীনকালেই। তাদের নিদর্শন নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

### ১:৪:১ বৈদিক সাহিত্যে হাস্যরসের নিদর্শন

- সংহিতায় হাস্যরসের নিদর্শন

সংস্কৃত সাহিত্যে বৈদিক যুগ থেকে হাস্যরসের বীজ প্রস্ফুটিত হলেও ইতিহাসের পটভূমিতে ধারাবাহিকভাবে সেই ভাবে আলোচিত হয়নি। বৈদিক যুগের বিভিন্ন স্তুতিমূলক সূক্তেরমধ্যে কিঞ্চিত পরিমাণে কৌতুক রসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বিষয়ে দার্শনিক S. K. De বলেছেন-

But since the earliest Indian literature, comprised in the *Veda* Brāhmaṇa, and Upaniṣad was predominantly religious, ritualistic or speculative in character, there was very little scope for the spark of wit or pleasantness of humour.[১৭]

অর্থাৎ প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্য বেদ ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রধানত ধর্মীয়, আচার-অনুষ্ঠানমূলক। চরিত্রগতভাবে অনুমানমূলক, তাই বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস বা ব্যঙ্গকৌতুক সৃষ্টির খুব কম সুযোগ বিদ্যমান ছিল। বৈদিক সাহিত্যে সাহিত্যের অন্তর্গত বৃষাকপি সূক্তে বানর দেবতার

উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট যাগের হবি লেহন করার বিষয়কে কেন্দ্র করে দেবতা ইন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা সত্যিই অভাবনীয় ব্যাপার। পুরূরবা ও উর্বশীর কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক উক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। উর্বশীর মুখে স্ত্রীগণের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করা উচিত নয় কারণ তাদের হৃদয় বৃকের মত-

ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি শালবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা।[১৮]

একথা জেনে পুরূরবা উর্বশীর সাথে প্রণয়ে সহমত হয়েছেন। বেদের মন্ডূকসূক্তে ভেকের ডাককে সোমযাগে পুরোহিতদের স্তোত্র পাঠের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সোমযাগে পুরোহিতদের স্তোত্র পাঠকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। *মৈত্রায়ণী সংহিতায়* স্ত্রীলোকগণকে মিথ্যার মূর্ত প্রতীক রূপে এবং তাদেরকে পান ও অক্ষের সমপর্যায়ভুক্ত ব্যসন রূপে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের অন্তর্গত চ্যবন ও অশ্বিনী কুমারের উপাখ্যানে দেবতা ইন্দ্রের সোমপানে অত্যাধিক আসক্ত হেতু সোমপাত্র গুলিকে ইন্দ্রোদর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সোমপানে ইন্দ্রের অভূতপূর্ণ দক্ষতা দেখে বৈদিক ঋষিরা বিদ্রূপ সহকারে তাঁর স্তুতি পাঠ করেছেন। তাতে কৌতুক রসের স্পর্শ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ইন্দ্রের নিজের শক্তি ও সামর্থ্য বিষয়ে দম্ভপূর্ণ যে উক্তি তারমধ্যে সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্যে আত্মবিদ্রূপের প্রতিফলন লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম দার্শনিক S. K. De বলেছেন-

It is witty, for instance in view of Indra's immoderate indulgence in soma drink, to call the somavats 'the belly of Indra' (*indrodara)*, .....but since Indra's comic acts are attributed to soma, such a profane view is out of the question.[১৯]

এছাড়া *মৈত্রায়ণী সংহিতায়* এবং *কাঠক সংহিতায়* স্ত্রীলোককে মিথ্যা ও চাতুর্যের প্রতীক রূপে কল্পনা করে হাস্যরসের প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

- ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদে হাস্যরসের নিদর্শন

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদেও হাস্যরসের নিদর্শন লক্ষণীয়। *শতপথ ব্রাহ্মণে* প্রতিপ্রস্থাতা যজমানের স্ত্রীর প্রতি গুপ্ত প্রণয় বর্তমান আছে কিনা এ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন এবং নারীস্বভাবের প্রতি কটাক্ষ করে উপহাস করা হয়েছে। অন্যদিকে বরুণ কর্তৃক সোমের চোখে আঘাত, দেবগণের দ্বারা ত্বষ্টাকর্তৃক পশুর মস্তকে থুতু নিক্ষেপ রূপ ঘটনার দ্বারা দেবতাদের চরিত্রের অতিরঞ্জনের দ্বারা হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। *ছান্দোগ্যোনিষদে* কুক্কুর কর্তৃক খাদ্য সংগ্রহ করার নিমিত্ত নেতার অনুসন্ধান বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের পরিচয় বহন করে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্বভূব তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্ন নো ভগবানাগায়তু অশনায়াম বাং ইতি।[২০]

জনশ্রুতি ও রৈক্কের উপাখ্যানে এবং সত্যকামের উপাখ্যানে বৃষভ, চক্রবাক ও জলচর পাখিদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ রূপ অবিকৃত পরিবেশে হাস্যরসের প্রতিফলন ঘটেছে। *বৃহদারণ্যকোপনিষদে* প্রজ্ঞানঘন ঋষির উক্তির মাধ্যমে তথাকথিত সমাজে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি অপেক্ষা গোধনীরা জ্ঞানী হিসাবে সমাদৃত এরূপ বিদ্রূপাত্মক মনোভাব হাস্যরসের উৎস স্বরূপ।

## ১:৪:২ *বাল্মীকিরামায়ণে* হাস্যরসের নিদর্শন

*বাল্মীকিরামায়ণে* করুণরস অঙ্গীরস হওয়া সত্ত্বেও তাতে হাস্যরসের উজ্জ্বল প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। *অযোধ্যাকাণ্ডে* বিবিধ ভূষণ অলঙ্কৃতা মন্থরার বাক্যালাপকে রজ্জুবদ্ধা বানরীর প্রলাপের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

লিপ্তা চন্দনসারেণ রাজবস্ত্রাণি বিভ্রতী।

বিবিধং বিবিধৈস্তৈস্তৈর্ভূষণৈশ্চ বিভূষিতা।।

মেখলাদামভিশ্চিত্রৈরনৈশ্চ বরভূষণৈঃ।

বভাসে বহুভির্বদ্ধা রজ্জুভিরিব বানরী।।[২১]

রাম বনে গেলে কৈকেয়ীর পুত্র সিংহাসনে বসলে মন্থরার মৃণালসম কুঁজটি ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি-

অত্র তেঽহং প্রমোক্ষ্যামি মালাং কুব্জে হিরণ্ময়ীম্।[২২]

মন্থরা যেন কৈকেয়ীর চোখে রাজহংসী । তাই বলা হয়েছে-

ত্বং পদ্মমিব বাতেন সন্নতা প্রিয়দর্শনা। [২৩]

ত্রিজোট নামক বৃদ্ধের তরুণী ভার্যার গঞ্জনায় শতছিদ্র বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করে রামের নিকট অর্থ প্রার্থী হলে বৃদ্ধের প্রতি রামের কৌতুক পূর্ণ উক্তি, *অরণ্যকাণ্ডে* ছিন্ন কর্ণনাসা শূর্পণখার ক্রন্দনকে মেঘ গর্জনের শব্দের ন্যায় তুলনা, *সুন্দরকাণ্ডে* রাবণের অন্তঃপুরে সুপ্তা মন্দোদরীকে সীতা মনে করে হনুমানদের যে উল্লাস এবং সীতার সন্ধান লাভে আনন্দিত বানরগণের মধুবনে নানা প্রকার ক্রিয়া, *লঙ্কাকাণ্ডে* অগ্নিপ্রদাহে দগ্ধমুখ রাক্ষস নারীগণের বর্ণনা, *আদিকাণ্ডে* ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির চতুরা বারাঙ্গনার প্রবঞ্চনা, হনুমানের সূর্যের প্রতি শৈশবে লম্ফপ্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে বিদ্রূপাত্মক মনোভাব, অনৌচিত্য ও অসঙ্গতির দ্বারা যে রসের অবতারণা করা হয়েছে তার প্রকৃত পক্ষে হাস্যরসের উদ্দীপক।

### ১:৪:৩ *বৈয়াসিকমহাভারতে* হাস্যরসের নিদর্শন

*মহাভারত* ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, চিন্তায় ও মননে, জ্ঞানে ও কর্মে, শিক্ষায় ও সাহিত্যে অসীম প্রভাব বিস্তার করেছে। বহুমুখী আখ্যান, উপাখ্যান, চরিতকথা ও বংশগুলির মাধ্যমে জীবন দর্শনে উপদেশের বাণী পরিলক্ষিত হয়েছে। *বৈয়াসিকমহাভারতের* অঙ্গীরস শান্তরস হলেও, হাস্যরসের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। লোক চরিত্রে সূক্ষ্মাদিসূক্ষ্ম অনুভূতি চিত্রণে ও বাস্তব জীবনের নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, *আদিপর্বে* কচ ও দেবযানী আখ্যানে বিড়ম্বিতা দেবযানীর ভাগ্য, *বনপর্বে* নহুষোপাখ্যানে স্বর্গের সিংহাসন লাভ ও অগস্ত্য প্রমুখ ঋষিগণকে তার রথে যোজনা ও তার পতন, চ্যবনের উপাখ্যানে সুকন্যা লাভের নিমিত্ত জরাগ্রস্ত ঋষি চ্যবনের পুনর্যৌবনের কামনা, হনুমান ও ভীমের কথোপকথনের মাধ্যমে এবং হনুমানের লেজ ধারণ করে স্থানচ্যুত হওয়ার মাধ্যমে ভীমের অসমর্থ প্রকাশ পেয়েছে, *উদ্যোগপর্বে* কর্ণের আত্মপ্রশংসার প্রতি ভীষ্মের মনোভাব, মহাশয় ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে মহামতি বিদুরেরর উপদেশ বাক্যের মাধ্যমে যে অসঙ্গতি ও অনৌচিত্যের সৃষ্টি করেছে তা প্রকৃতপক্ষে হাস্যরসের উদ্দীপক। আবার কিছু কিছু মাধ্যমে হাস্যের পরিচয় পরিলক্ষিত হয় যেমন তস্করের প্রমত্তের উপর, চিকিৎসক ব্যাধিগ্রস্থের উপর, প্রমদা কামার্তের উপর, পণ্ডিত মূর্খের উপর নির্ভরশীল। গৌসেবা ও কৃষি সেবার সঙ্গে সঙ্গে ভার্যা সেবা একান্ত প্রয়োজন ইত্যাদি।

### ১:৪:৪ জাতকের গল্পে হাস্যরসের নিদর্শন

*জাতকমালা* গ্রন্থে মৈত্রীবল আখ্যানে ওজোহারক যক্ষগণ কর্তৃক অলক্ষিত ভাবে গোপাল বালকে ভীত করবার চেষ্টা ও তাতে যক্ষগণের বিফলতা যথেষ্ট হাস্য জনক। পালিজাতকের

অন্তর্গত *লাঙ্গলেষাজাতক, অসিলক্ষণজাতক, উভতোভ্রষ্টজাতক, দদ্দভজাতকে* হাস্যরসের উপাদান নিহিত আছে। *দদ্দভজাতকে* খরগোশের তাল পাতার উপর বেল ফল পতনের শব্দ শুনে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কল্পনা, *জম্বুকজাতকে* শৃগাল কর্তৃক সিংহের নিধন রূপ নিজের শক্তি সীমা অতিক্রম করায় বিনষ্টফল, *গজকুম্ভজাতকে* অলস ভিক্ষুকদের অলস্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসের প্রতিফলন বিদ্যমান।

## ১:৪:৫ পালি গ্রন্থে হাস্যরসের নিদর্শন

জাতকগ্রন্থ ছাড়াও বৌদ্ধসাহিত্যে *সূত্তনিপাত, ধর্মপদ, অঙ্গুরত্তরনিকায়,* সমকালীন অন্যান্য পালিগ্রন্থে হাস্যরসের নিদর্শন রয়েছে। *সূত্তনিপাতের* মধ্যে কার্পণ্য, মত্ততা, অহঙ্কার এবং নারীসংক্রান্ত চারিত্রিক ত্রুটী ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে হাস্যরসপূর্ণ নিবন্ধের নিদর্শন রয়েছে। *ধর্মপদের যমকবগ্গের* টীকায় অদাতা নামক নির্দয় কৃপণ ব্রাহ্মণের বিবিধ আচরণ হাস্যরসের উদ্দীপক স্বরূপ। *নিলিন্দপঞ্হো* গ্রন্থে ভিক্ষুকদের ধর্মাচরণের প্রণালী ও তার গুণাগুণ বর্ণনার প্রসঙ্গে গাধা ও পেচকের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে কৌতুকপ্রদ বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। *ধর্মপদগ্রন্থে অপ্পমাদবগ্গে* জীবিকা অর্জনের নিমিত্তে বাবা একজন শিক্ষক নির্বোধ বালকে যে শিক্ষা মন্ত্রণা প্রদান করেন এবং সেই শিক্ষা মন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা, *পুপ্ফবগ্গে* সিরিদত্ত ও গরহদিনের উপাখ্যানে নগ্ন জৈন সাধকের অলৌকিক বিভূতির প্রশংসা, প্রভূতি গর্ব করার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় তা লঘু হাস্যের উদ্দীপক। *মিলিন্দপঞ্হো* গ্রন্থে কোন কোন স্থলে উপমার মাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন যেমন ভিক্ষুর সঙ্গে কচ্ছপের, ইন্দুরের এবং রক্ত শোষণকারী জলচরপ্রাণীর সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।

**উল্লেখপঞ্জি**


১. *সাহিত্যদর্পণ*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

২. *তদেব*

৩. *কাব্যাদর্শ*, প্রথম পরিচ্ছেদ

৪. A. A. Macdonell & A. B Keith, *Vedic index of means and subjects,* vol.1, pp-134 &152

৫. Varma Shivram Apte, *The Practical Sanskrit English Dictionary*, pp- 202, 330 & 331

৬. M. Krishnamacharya, *A History of Classical Sanskrit Literature*, pp-413

৭. S. N. Dasgupta & S. K. De, *A History of Sanskrit Literature Classical Period*, vol. 1, pp-84

৮. *তদেব*, pp-419

৯. A. A. Macdonell, *India's past*, pp-119

১০. V. S. Ghate, *Ghate's Lectures on RigVeda*, page- 5

১১. S. N. Dasgupta, *A History of Sanskrit Literature Classical Literature*, Vol.1, pp-86

১২. *হিতোপদেশ, মিত্রলাভ*, শ্লোকসংখ্যা-৮

১৩. A. A. Macdonell, *A History of Sanskrit Literature,* pp-312

১৪. S. N. Dasgupta, *A History of Sanskrit Literature Classical Literature*, Vol.1, pp-422

১৫. A. A. Macdonell, *A History of Sanskrit literature*, pp-312

১৬. নৃসিংহপ্রসাদ. ভাদুড়ী, *শুকসপ্ততি*, পৃষ্ঠা- ২৩

১৭. S. K. De, *Aspect of Sanskrit literature*, pp-257

১৮. *ঋগ্বেদ*, ১০মণ্ডল, ৯৫সূক্ত, ১৫ঋক্

১৯. S. K. De, *Aspect of Sanskrit literature*, pp-257

২০. *ছান্দোগ্যোপনিষদ* ১, ১২, ২

২১. *বাল্মীকিরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড*

২২. *তদেব*

২৩. *তদেব*

# চতুর্থ অধ্যায়

## গল্পসাহিত্য ও সমকালীন সমাজ

### ১:১ সংস্কৃত সাহিত্যের গল্পসাহিত্য

অভিধানগত ভাবে সহিতের ভাব বা মিলন অর্থে সাহিত্য শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য তত্ত্বের দৃষ্টিতে শব্দ এবং অর্থের যথার্থ সহভাব হলে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বৃহত্তর অর্থে সাহিত্যিকের সঙ্গে সহৃদয়ের যোগসূত্র ঘটায় এই সাহিত্য। সাহিত্য বলতে সাধারণভাবে কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদিকে বোঝায়। ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতি হলো সাহিত্য। সাহিত্য হলো মানব ও সমাজ জীবনের দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে সমাজ হলো সাহিত্যের ধারক ও বাহক। মানব মনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, শাশ্বত ও চিরন্তন অনুভূতি সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। মানব সমাজের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জীবনের মূল্যবান নির্ধারণ ও নির্মাণে সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বোধ ও চেতনাকে, উজ্জীবিত, উচ্ছ্বসিত ও উদ্ভাসিত করে তোলে সাহিত্য। মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রতকরণ এবং তার উৎকর্ষ সাধন হলো সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কীর্তি। কু-প্রবৃত্তির উপর সুস্থ বিবেক বুদ্ধির বিজয় অর্জন এবং পরিশীলিত রুচিবোধ সৃষ্টি করে সর্বতোভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা সাহিত্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানকে উন্নত করার দায়িত্ব তারই উপর বর্তায়। মানব চিত্তের চেতন, অবচেতন ও অচেতন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণপূর্বক দুর্বলতাসমূহ স্পষ্টরূপে জনসমাজে প্রদর্শন করা সাহিত্যের অন্যতম দিক। তাই বলা যেতে পারে সাহিত্য ও সমাজ একে

অপরের পরিপূরক। সমাজ মানে কেবলমাত্র স্থান, কাল, পাত্র নয়, মানুষের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আচার, আচরণ, বিচার, অবিচার, সংস্কার, ব্যবহার, মহত্ব, নীচতা এই সমস্ত কিছুই সমাজে দেখা যায়। সমাজের মধ্যে রাজনীতি ও অর্থনীতি ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। কবি, শিল্পী বা লেখক সমকালীন সমাজকে উপেক্ষা করতে পারেন না। কারণ জগত ও সমাজজীবনের অভিজ্ঞতা সাহিত্যিকের মানস সম্পদ। সাহিত্যের প্রত্যক্ষ উপকরণ সমসাময়িক সমাজ ও সামাজিক জীবন কিন্তু তা কোন নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না বা নিঃশেষিত হয় না। তা কবি, শিল্পী, লেখকের শৈলীর অপরূপ শিল্পকলায় সমকালীনতাকে অতিক্রম করে সাহিত্য হয়ে ওঠে সর্বকালীন ও সার্বজনীন।

### ১:১:১ *পঞ্চতন্ত্র*

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সর্বাপেক্ষ প্রাচীনতম গ্রন্থ *পঞ্চতন্ত্র*। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির তিন অল্পধীসম্পন্ন পুত্রগণের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য এই গ্রন্থটি রচনা করেন। *The Bible* এর পর বহুল প্রচারিত গ্রন্থ হিসাবে *পঞ্চতন্ত্রের* নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশটি ভাষায় এবং দুই শতাধিক সংস্করণে *পঞ্চতন্ত্র* প্রকাশিত হয়েছে। ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে পল্লবী ভাষায় এর অনুবাদ করা হয়। তবে সংস্কৃতের মূল গ্রন্থটি বর্তমানে লুপ্ত। *তন্ত্রাখ্যায়িকা* নামে মূল *পঞ্চতন্ত্রের* একটি সংস্করণ ছিল। *তন্ত্রাখ্যায়িকার* দুটি সংস্করণ পাওয়া যায়- আচার্য পূর্ণভদ্রপ্রণীত জৈন সংস্করণ এবং ক্ষুদ্রাকার জৈন সংস্করণ। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম সংস্করণ বর্তমানে লুপ্ত। এই সংস্করণে চারটিভেদ যথা- গুণাঢ্যের *বৃহৎকথা* (লুপ্ত), বুদ্ধস্বামীর *শ্লোকসংগ্রহ*, ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরী*, সোমদেবের *কথাসরিৎসাগর*। দক্ষিণী সংস্করণ রূপে

*পঞ্চতন্ত্র* প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংস্করণটি তিনটি ভাগে বিভক্ত এবং বর্তমানে লুপ্ত। প্রথমটি নেপালী সংস্করণ এবং এই সংস্করণটির নাম তন্ত্রাখ্যান। ১৪৮৪ সালে এর পুঁথি পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি *দক্ষিণী পঞ্চতন্ত্র* এটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকার *পঞ্চতন্ত্র*। জৈনমুনি মেঘবিজয় (১৬৫০-৬০খ্রিস্টাব্দ) এই গ্রন্থটি রচনা করেন এবং তিনি এই গ্রন্থের মূল গল্পের সঙ্গে নতুন কিছু গল্পের সংযোজন করেন। এই সংস্করণ যা *হিতোপদেশ* নামে অভিহিত। পহ্লবী সংস্করণ বর্তমানে লুপ্ত। প্রতীচ্যের পণ্ডিত Bud সিরীয় ভাষায় সংস্করণ ও আধুনিক পণ্ডিতেরা জার্মান ভাষায় এই সিরীয় সংস্করণের অনুবাদ করেন। ৭৫০ শতকে Abdallah Ibn-al Moqaffa সংস্কৃত করটক ও দমনকের আরবীয় সংস্করণে *পঞ্চতন্ত্র* প্রকাশ করেন। আরবীয় সাহিত্যে আরবি ভাষায় অনূদিত *পঞ্চতন্ত্র* বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। একাদশ শতকে পণ্ডিত Symen Seth আরবীয় *পঞ্চতন্ত্রের* গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন। ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে জিনপতি সূরির শিষ্য শ্বেতাম্বর জৈন ভিক্ষুক পূর্ণভদ্র *পঞ্চতন্ত্রের* একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণে একুশটি নতুন গল্প সংযোজন করা হয়েছিল এবং এটি *পঞ্চাখ্যানক* নামে পরিচিত। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে আরবীয় *পঞ্চতন্ত্রের* স্লাভনিক ভাষায়, স্পেনীয় ভাষায় এবং হিব্রু ভাষায় ও ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। রাণী প্রথম Elizabeth এর রাজত্বকালে Sir T. North *পঞ্চতন্ত্রের* ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। *পঞ্চতন্ত্রের* আবির্ভাব কাল সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A.A. Macdonell বলেছেন –

There is evidence that a collection of vesāli, about 380 B.C and in the fifth century A.D.[১]

গ্রন্থটি পাঁচটি তন্ত্রে বিভক্ত। পাশ্চাত্ত্য জার্মান অনুবাদক J. Hertel এর মতে 'তন্ত্র' কথার অর্থ 'Case of good sense'. তন্ত্র গুলি হলো- ***মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রনাশ, অপরীক্ষিতকারক***। ***মিত্রভেদ***- প্রথম তন্ত্র *মিত্রভেদ।* এই তন্ত্রে বাইশটি মনোজ্ঞ গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। দমনক ও করটক নামে দুই শৃগাল, পিঙ্গলক নামে এক সিংহ এবং সঞ্জীবক নামে এক বৃষভ এই গল্পের প্রধান চরিত্র। গল্পগুলির মধ্য দিয়ে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি রাজনীতি বিষয়ক জ্ঞান দান করা হয়েছে। ***মিত্রপ্রাপ্তি***- এই তন্ত্রে ছয়টি গল্পের সমন্বয় লক্ষিত হয়েছে। কপোতরাজ চিত্রগ্রীব, লঘুপতনক কাক, হিরণ্যক মূষিক, মন্থক কচ্ছপ, ও চিত্রাঙ্গ নামক হরিণের গল্প বিদ্যমান। এই মূল কাহিনীর সঙ্গে পাঁচটি গল্প সংযুক্ত হয়েছে এবং এই গল্প গুলির মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনে চলার পথে নানা উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। ***কাকোলূকীয়***- পেচকরাজ অরিমর্দন ও মেঘবর্মণ নামক কাকেদের রাজার সাথে চিরশত্রুতা নিয়ে মূল গল্পটি আলোচিত হয়েছে। মূল গল্পের প্রসঙ্গক্রমে এই তন্ত্রে চারটি গল্পের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। প্রধানত এই তন্ত্রে সন্ধি প্রভৃতি ষড়্গুণের আলোচনা করা হয়েছে। এই তন্ত্রটি *সন্ধিবিগ্রহ* নামেও পরিচিত। গল্পগুলির মধ্য দিয়ে ষড়্গুণ্যের যেকোনো একটি বিষয়কে আশ্রয় করার বার্তা প্রতিফলিত হয়েছে। ***লব্ধপ্রনাশ***- *পঞ্চতন্ত্রের* চতুর্থ তন্ত্রটি *লব্ধপ্রনাশ*। বিশ্বাসঘাতক মকর ও তার পরমবন্ধু বানরের কাহিনী হলো এই গল্পের মূল। মূল গল্পের প্রসঙ্গক্রমে সতেরোটি গল্পের গল্পের সমন্বয় লক্ষিত হয়। এই তন্ত্রে নীতিবিদ্যা এবং অর্থশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষাদান হলো এর মূল উদ্দেশ্য। ***অপরীক্ষিতকারক***- পূর্বপুরুষদের উপার্জিত ধন ও শ্রেষ্ঠী মণিভদ্রকে কেন্দ্র করে মূল গল্পটি রচিত হয়েছে। এই তন্ত্রে পনেরোটি গল্পের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। বাস্তব জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞান এই তন্ত্রে প্রদান করা হয়েছে। পাঁচটি তন্ত্রে মোট তেষট্টি গল্প রয়েছে। গল্পগুলি কল্পনার মৌলিকতা বর্ণনার সরসতা এবং চরিত্রগুলির সজীবতা হেতু *পঞ্চতন্ত্র* অধিক মাত্রায় রমণীয় হয়ে উঠেছে।

### ১:১:২ *বেতালপঞ্চবিংশতি*

গল্পসাহিত্যের অন্যতম অমূল্য গ্রন্থ হিসাবে *বেতালপঞ্চবিংশতি* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঁচিশটি গল্পের সমন্বয় রচিত *বেতালপঞ্চবিংশতি* গ্রন্থটি বর্তমানে চারটি সংস্করণ পাওয়া যায়। ক) জনৈক শিবদাসবিরচিত গদ্যপদ্য মিশ্রিত সংস্করণ, এতে সরল গদ্যের মাঝে মাঝে নীতিমূলক শ্লোকের সন্নিবেশ পরিলক্ষিত হয়। খ) জনৈক জম্ভলদত্তবিরচিত গদ্যাত্মক সংস্করণ, এতে নীতিমূলক শ্লোকের সন্নিবেশ নেই। গ) শ্রীবল্লভদাসবিরচিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ঘ) অজ্ঞাত লেখকের গদ্যাত্মক সংস্করণ। তবে উপরিউক্ত সংস্করণ গুলির মধ্যে জনৈক শিবদাস রচিত গদ্যপদ্য মিশ্রিত সংস্করণটি বর্তমানে অধিক সমাদৃত এবং প্রচলিত। কবি গুণাঢ্য রচিত *বৃহৎকথা* হলো *বেতালপঞ্চবিংশতি*র উপজীব্য গ্রন্থ। *বেতালপঞ্চবিংশতি* গ্রন্থের আবির্ভাব কাল একাদশ শতক। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ভারত তত্ত্ববিদ S. N. Dasgupta & S. K. De বলেছেন-

Although the earliest version of this very interesting collection of twenty-five tales of the *Vetāla* is preserved in the two Kashmirian version of the Bṛhatkathā by the Kṣemendra and Somdeva respectively (11 th century), it is missing in the Nepalese version of Bidhasvāmin.[২]

উজ্জয়নী নগরে বহুপণ্ডিত ও গুণী মানুষের বসবাস ছিল। সেখানে রাজা ছিলেন গন্ধর্ব সেন। তিনি পণ্ডিত ও মহান ব্যক্তি ছিলেন। রাজাগন্ধর্ব সেনের কনিষ্ঠপুত্র বিক্রমাদিত্য। যিনি রাজাবিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত। গল্প অনুসারে রাজাবিক্রম সেন বা ত্রিবিক্রম সেনের নিকট বেতালের মুখে পঁচিশটি উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। রাজাবিক্রম সেনকে হত্যার চক্রান্ত করে এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন একটি করে ফল উপহার দিতেন। তার মধ্যে থাকতো একটি করে রত্ন। রত্ন উপহারের

কারণ রাজা জানতে চাইলে সন্ন্যাসী রাজার কাছে শবসাধনায় সিদ্ধিলাভের সাহায্য চান। গভীর রাতে সন্ন্যাসীর অনুরোধে রাজাবিক্রম সিংহ শবদেহ আনতে শ্মশানে প্রবেশ করেন। শ্মশানে স্থিত বৃক্ষ থেকে শবদেহটি আনতে গেলে মৃত্তিকা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে শবদেহটি জীবিত হয়ে ওঠে। আসলে এই শবদেহকে এক বেতাল আশ্রয় করেছিল। শ্মশানে অপেক্ষারত সন্ন্যাসীর অভিমুখে রাজাবিক্রম সেন শবদেহ নিয়ে রওনা হলে শবাধিষ্ঠিত বেতাল রাজাকে এক একটি কাহিনী শুনিয়ে তৎসম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। বুদ্ধিমান রাজাও যথাযথ প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। এইভাবে পঁচিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বেতাল রাজার পাণ্ডিত্য ও বীরত্বের প্রতি প্রীত হয়ে সন্ন্যাসীর ষড়যন্ত্রের কথা রাজার কাছে প্রকাশ করলেন। বেতালের পরামর্শেই দুষ্ট সন্ন্যাসীকে হত্যা করলেন এবং নিজেকে আত্মরক্ষা করলেন। কাহিনীগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী ও কৌতূহল উদ্দীপক। প্রত্যেকটি গল্পেই অভিনবত্ব, বুদ্ধির চাতুর্য, হাস্যরসের উপাদান বর্তমান।

### ১:১:৩ *শুকসপ্ততি*

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ *শুকসপ্ততি*। *শুকসপ্ততি* গ্রন্থে সত্তরটি আখ্যানের সঙ্কলন বর্তমান। মূল রচনাটি বর্তমানে লুপ্ত। এই গল্পসাহিত্যের দুটি সংস্করণ বিদ্যমান। কবি পূর্ণভদ্রকৃত জৈন সংস্করণ (একাদশ শতাব্দী), কবি চিন্তামণিভট্ট রচিত বৃহদাকার সংস্করণ । এই গ্রন্থটির আবির্ভাব কাল দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী নয়। তাই এই বিষয়ে বলা হয়েছে-

The Ornatior text appears to be the work of Cintāmani Bhaṭṭa, who having used Pūrṇabhadra's version of the *Pañcatantra*, cannot be earlier than the 12th century.[৩]

পারসিক পণ্ডিত Nakhshabi ১৩২৯-১৩৩০ খ্রিস্টাব্দে *শুকসপ্ততির* ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তার নাম দেন *তুতীনামেহ্* বা *তুতীনামা*। *তুতীনামেহ্*র অনুবাদের একশত বছর পর *শুকসপ্ততির* তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এছাড়া *তুতিনামার* সাহায্যে *শুকসপ্ততির* উর্দু ভাষায়, ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ১৭৯২ সালে ফরাসি ভাষাতত্ত্ববিদ R.V.Gerrans *তুতীনামার* বারোটি গল্প ইংরেজিতে প্রকাশ করেন। অষ্টাদশ শতকে ফার্সি ভাষায় রচিত *তুতীনামাকে* সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেন লেখক মুহাম্মদ কাদিরি। অনুবাদক চণ্ডীচরণ মুনসি *তুতীনামার* অনুকরণে বাংলা অনুবাদ করেন এবং তার নাম দেন *তোতার ইতিহাস*। ১৯৫৯ সালে মোতিলাল বেনারসিদাসের প্রকাশনায় *শুকসপ্তত*ি নামক গ্রন্থটির একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত জার্মান পত্রিকা ZDMG তে (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Geseleshaft) উক্ত সংস্করণের আংশিক অংশের অনুবাদ করেন জার্মান পণ্ডিত Von Richard Schmidt সাহেব। তিনি ১৮৯৯ সালে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন।

বণিক হরিদত্তের পুত্র মদন বিনোদ মতান্তরে দেবদাস ছিল অলস প্রকৃতির যুবক। পুত্র মদন বিনোদের জন্য হরিদত্ত খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে হরিদত্ত একটি শুকসারি উপহার পান।। শুকপাখিটি ছিল নীতিশাস্ত্রে নিপুণ এবং তার নীতি বচনে মদন বিনোদ বিলাসব্যসন পরিত্যাগ করে দেশান্তরে বাণিজ্য যাত্রায় গেলেন। স্বামীর অনুপস্থিতর সুযোগে প্রভাবতী প্রতি সন্ধ্যায় অবৈধ প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গৃহ ত্যাগের উপক্রম করলেই সারি নামক পাখি ভৎসনা করত এবং শুকপাখি তাকে একটি করে গল্প শোনাত। এইভাবে সত্তর দিনে সত্তরটি গল্প শুনিয়ে অবৈধ প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হওয়া থেকে বিরত করত। এই গল্পে শুকপাখির যে উল্লেখ আছে সেই শুকপাখির কোন আত্মপরিচয় নেই। কিংবদন্তি অনুসারে শুকের রূপধারী মহাত্মা নারদ দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে এই গল্পগুলির বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু প্রতীচ্যের

Schmidt সাহেব *শুকসপ্ততির* যে অনুবাদ করেন তাতে শুকপাখির আত্মপরিচয় জানা যায়। এই শুক ও সারিকা হলো শাপভ্রষ্ট দুই পক্ষী পক্ষিণী।

এই গ্রন্থে গল্পের মধ্যে যে প্রধান এবং চমকপ্রদ ব্যাপার তা হলো কৌশল, বুদ্ধি ও দক্ষতা। অধিকাংশ গল্পের মধ্যে পরপুরুষাভিসারিণী রমণীর সাময়িক বিপন্নতা, ও তার বৌদ্ধিক প্রতিকারের কথা, বুদ্ধি ও চতুরতার মাধ্যমে বিপদ কাটিয়ে ওঠা, ধৈর্য এবং প্রচেষ্টার রমণীয়তা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। *হিতোপদেশে* নারীচরিত্রের নানা দুর্বলতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, *শুকসপ্ততিতে* তার ব্যাতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। এই গল্পে সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা অনেক বেশি ছিল এবং তা ছিল বলে কবি মেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্যতার নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। অবশ্য এটা উল্টো প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভারতবর্ষের সমাজের সাধারণত মেয়েদের কোন স্বাধীনতা ছিল না বলেই হয়তো মেয়েরা লুকিয়ে চুরিয়ে পর পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে আবদ্ধ হত। *শুকসপ্ততির* বেশিভাগ গল্পে নারীদের পরকীয়া অবৈধ সম্পর্কের কথা বারবার ব্যক্ত করা হয়েছে। কাজেই সহৃদয়ের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে তৎকালীন সমাজে সাধারণভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল না। রীতি-নীতি, নিয়ম-ধর্মের সাধারণ বিষয়ক ব্যাপার এখানে আলোচিত হয়নি বরং অদম্য আদিম ভাবনাকে নিয়ে চতুর এবং হাসরসাত্মক গল্প রচিত হয়েছে।

### ১:১:৪ *বিক্রমাঙ্কচরিত বা সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা*

*বিক্রমাঙ্কচরিত* বা *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* এই গ্রন্থটি প্রাচীনতম মূল রচনাটি সম্ভবত লুপ্ত। কিন্তু এই গ্রন্থটির সংশোধনমূলক দুটি সংস্করণ পাওয়া যায় একটি উত্তর ভারতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয়টি দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণ। উত্তর ভারতীয় সংস্করণটিকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা

হয়েছে- ক) জৈনলেখক ক্ষেমাঙ্করবিরচিত (মহারাষ্ট্রী সংস্করণ), খ) পণ্ডিতবররুচিকৃত বঙ্গীয় সংস্করণ গ) অজ্ঞাত পরিচয়ের লেখকের রচিত (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) । দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণটি মূলত *বিক্রমাঙ্কচরিত* নামে অভিহিত করা হয়, তাই বলা হয়েছে-

...While the Southern, generally called *Vikrama-carita*, has a prose, as well as a secondary metrical version in the Sloka metre, both anonymous.[৪]

এই গ্রন্থটির মূল রচয়িতা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। জৈন সংস্করণ ও দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণের ভিত্তিতে এই গ্রন্থের আবির্ভাব কাল ত্রয়োদশ শতকের পূর্ববর্তী। এ প্রসঙ্গে ভারত তত্ত্ববিদ S. N. Dasgupta & S. K. De এর অভিমত-

The date and authorship of the work are unknown, but since both the Southern and Jaina versions, apparently independently, refer to the Dānakhaṇḍa of Hemādri's *Caturvarga-cintamoṇi*, it cannot date from a time earlier than the 13th century.[৫]

বত্রিশটি গল্পের সঙ্কলন নিয়ে *বিক্রমাঙ্কচরিত* লেখা হয়েছে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইন্দ্রের নিকট থেকে একটি সিংহাসন উপহার পান। অতঃপর শালিবাহন কর্তৃক বিক্রমাদিত্য পরাজিত ও নিহত হন পরে উক্ত ইন্দ্রপ্রাপ্ত সিংহাসনটি কালক্রমে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়। ধারাধিপতি ভোজ ওই সিংহাসনের উদ্ধার সাধন করতে সমর্থ হন। দেবরাজ ইন্দ্র প্রাপ্ত সিংহাসনের উদ্ধারকার্যের পর রাজাভোজ উপবেশন করতে চাইলে সিংহাসন গাত্রে খোদিত বত্রিশটি নারীরূপীপুত্তলিকা জীবন্ত হয়ে উঠে। প্রত্যেকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের গুণাবলী সম্বন্ধে এক একটি গল্পের অবতারণা

করেন। *বিক্রমাঙ্কচরিত বা সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা*তে বত্রিশটি পুতুলের গল্প স্থান পেয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পেই বিক্রমাদিত্যের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং গল্পগুলি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক।

### ১:১:৫ *হিতোপদেশ*

*হিতোপদেশ* গ্রন্থের রচয়িতা হলেন নারায়ণ শর্মা। ইনি বাঙালি এবং বঙ্গদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। তিনি রাজা ধবল চন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শন পুত্রদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি এই গল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবকাল ১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী অর্থাৎ তদানীন্তন সময়ে *হিতোপদেশ* গল্পসাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A. A. Macdonell বলেছেন-

.... about the date of this complication then that it is more than 500 years old, the earliest known MS aap it was written in 1373 A. D.[৬]

অর্থাৎ *হিতোপদেশের* প্রাচীন পুঁথি ১৩৭৩ সালে রচিত হয়েছিল। বিশ্বের নানাদেশে *হিতোপদেশের* বিচিত্র ভাষায় অনুবাদ করেছেন সাহিত্যরসজ্ঞ মনীষীগণ। ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত Charles Wilkins অনুবাদ করেন ১৭৮৭ সালে। ১৭৯০ সালে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত Louis-Mathieu Langlès ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন। *হিতোপদেশের* অনুবাদক হিসেবে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যেমন Max Müller (১৮৪৪), Arnold Schoenberg (১৮৮৪), F. Scott Fitzgerald (১৮৮৮), Johannes Hertel ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

*হিতোপদেশে* তেতাল্লিশটি গল্পের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। তেতাল্লিশটি গল্পের মধ্যে পঁচিশটি গল্প *পঞ্চতন্ত্র* থেকে নেওয়া হয়েছে। শুধু *পঞ্চতন্ত্র* নয় অন্যান্য এক বা একাধিক গল্পগ্রন্থকে

অবলম্বন করে *হিতোপদেশ* গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আর এই কারনেই তিনি *হিতোপদেশ* গ্রন্থের গ্রন্থারম্ভে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

পঞ্চতন্ত্রাত্তথাঽন্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে।[৭]

একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে মূল *পঞ্চতন্ত্র* গ্রন্থটি বর্তমানে লুপ্ত হলেও *হিতোপদেশ* গ্রন্থটি *পঞ্চতন্ত্র* গ্রন্থের বঙ্গীয় রূপান্তর বলে অনেকে মনে করছেন। আবার পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা বিরচিত *হিতোপদেশ* গ্রন্থটিকে দক্ষিণী সংস্করণের পাঠান্তর বলে অনেকে নির্দেশ করেছেন । সাহিত্য সমালোচক বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই অভিমত পোষণ করেছেন যে *পঞ্চতন্ত্র, কামন্দকীয় নীতিসার* ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কবি নারায়ণ শর্মা রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। *হিতোপদেশ* গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ***মিত্রলাভ***- প্রথম অধ্যায়ের নাম *মিত্রলাভ*। এই অংশে গল্পের সংখ্যা আট। মূল গল্প হলো কাক-কচ্ছপ-হরিণ-মূষিকের গল্প। মূল গল্পের ভিতরে বৃদ্ধ বাঘ ও পথিকের গল্প, হরিণ, কাক, শৃগালের কথা, শকুনি ও মার্জার কথা, চূড়াকর্ণ, বিনাকর্ণের কথা, বণিক দম্পতির কথা, অতিসঞ্চয়ী ব্যাধের কথা, রাজপুত্র ও বণিক বন্ধুর কথা, হাতি এবং শৃগালের কথা বিদ্যমান। ***সুহৃদভেদ***- দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম *সুহৃদভেদ*। এই অংশে গল্পের সংখ্যা নয়। মূলগল্প হলো সিংহ-বৃষ-দুই শৃগালের গল্প। সেই মূল গল্পের মধ্যেই প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য গল্পের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয় সেগুলি- কীলোৎপাটি বানরের কথা, রজক-চোর-গর্দভ-কুকুরের কথা, সিংহ-মার্জার-মূষিকের কথা, কুট্টনী-ঘন্টাকর্ণ রাক্ষসের কথা, রাজা-রাজপুরুষ-পরিব্রাজক-সাধু-গোপ-গোপবধূ-নাপিত এবং নাপিত বধূর কথা, কাক দম্পতি-কৃষ্ণ সর্প-কণক হারের কথা, সিংহ-শশক কথা, সমুদ্র ও টিট্টিভ দম্পতি কথা ইত্যাদি। ***বিগ্রহ***- তৃতীয় অধ্যায়ের নাম *বিগ্রহ।* অধ্যায় গল্পের সংখ্যা নয়। এই অংশে আছে হংস, ময়ূর এবং কাকের গল্প। ***সন্ধি***- চতুর্থ অধ্যায়ের নাম সন্ধি। এই অংশে গল্পের সংখ্যা বারো। *হিতোপদেশ গ্রন্থের* মধ্যে জীবনে চলার পথে আশা-দ্বন্দ্ব, বাধা-বিপত্তি, লোভ-মোহ

ইত্যাদির সম্মুখীন হলে কোন পথ বেছে নেবে তার প্রাথমিক নিদর্শন এতে প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পগুলির মধ্যে উপদেশের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া চিরন্তন সত্যের বহু নিদর্শন এই গ্রন্থে পাওয়া যায় যেমন বিদ্যা-শাস্ত্র জ্ঞানেরপ্রশংসা, যৌবন-ধন-প্রভুত্ব প্রভৃতির অনিত্যতা, কুপুত্রের নিন্দা, সংসারের সুখের উপাদান নির্দেশ, ধর্মের প্রশংসা, দানের প্রশংসা, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের নির্দেশ, অসৎ সঙ্গের কুফল এবং সৎসঙ্গের সুফল, মহাত্মার প্রশংসা, প্রকৃত বন্ধুর লক্ষণ ও বন্ধুর প্রশংসা, সুজন ও দুর্জনের পরস্পর ভেদ নির্ণয়, আত্মরক্ষার গুরুত্ব, স্বভাবের অনতিক্রমণীয়তা, গুরুজনের নির্দেশ মান্য করার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। *হিতোপদেশের* গল্পগুলির মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্রের নিয়ম-কানুনকে সহজভাবে পরিবেশন করেছেন এবং সেইসঙ্গে চিরন্তন সত্যের পরিচয় জনসমক্ষে প্রচার করেছেন। *হিতোপদেশ* একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো গল্পের মাধ্যমে নারী চরিত্রের দুর্বলতার কথা বারবার ব্যক্ত করা হয়েছে। স্ত্রী চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলীকে কেন্দ্রকরে কৌতুকময় গল্প রচনা করেছেন। পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা নারীদের দুর্বলতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন এমন নয় বরং তিনি সমাজের দুর্বল দিকটির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর অভিনব রচনারীতির মাধ্যমে।

### ১:১:৬ *পুরুষপরীক্ষা*

পদাবলী সাহিত্যের পদকর্তা বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি মিথিলা রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন এবং তিনি 'মৈথিল কোকিল' উপাধি পান। রাজা শিবসিংহের নির্দেশে বালকদের নীতি শিক্ষা ও পুরঃরমণীগণের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে মনোজ্ঞ কাহিনী রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে *পুরুষপরীক্ষা* গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে চুয়াল্লিশটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। গল্পগুলি সবই মনুষ্য

চরিত্র অবলম্বনে রচিত। *পুরুষপরীক্ষা* গ্রন্থটির আবির্ভাব খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতক। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

The author, who is best known for his exquisite Rādhā-Kṛṣṇa song in Maithilī, flourished under Śivasiṃha of Mithila towards the latter part of the 14th century A.D.[৮]

হড়কোলা নগরীর সুপ্রসিদ্ধ এবং সসাগরা রাজা হড়কোলের একমাত্র রূপবতী ও বিদূষী রাজকুমারী ছিলেন পদ্মাবতী। যৌবন প্রাপ্তা পদ্মাবতীর বিবাহ যোগ্য পাত্রের সন্ধানে রাজা হড়কোল চিন্তান্বিত হয়ে বসুকৃতি নামক ব্রাহ্মণের কাছে জানতে চাইলেন যে তাঁর কন্যার জন্য কিরূপ বর(পাত্র) করিবেন। উত্তরে বসুকৃতি ব্রাহ্মণ বললেন পুরুষবরের কথা বললেন। অসন্তুষ্ট রাজা তার প্রকৃত অর্থ বুঝলেন না এবং ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন এই জগতে আকারে পুরুষ অনেকেই আছে কিন্তু প্রকৃত পুরুষের অভাব লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রকার পুরুষের চরিত্রকে গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

### ১:১:৭ *ভোজপ্রবন্ধ*

কবি বল্লাল বা বল্লভ রচিত *ভোজপ্রবন্ধ* নামক গ্রন্থটি ধারা রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজাকে কেন্দ্র করে ইতিহাস প্রসিদ্ধ জ্ঞানীগুণী চরিত্র সমাবেশে বিবিধ গল্পের সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্যগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি *বল্লালশতক* নামক আর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্য সমালোচক S. N. Dasgupta & S.K. De বলেছেন *ভোজপ্রবন্ধ* গ্রন্থটি আবির্ভাব কাল খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতকের শেষার্ধে-

To the same class of composition, but not to Jaina inspiration, belongs the *Bhoja-Prabandha* of Ballāla (end of the 16th century), which, however, us entirely useless as an historical document and is not of much value as a literary production.[৯]

*সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* গ্রন্থের সপ্তদশখণ্ডের *ভোজপ্রবন্ধের* ভূমিকা অংশে কবি বল্লাল রচিত *ভোজপ্রবন্ধ* ব্যতীত আরো কয়েকটি *ভোজপ্রবন্ধের* পরিচয় পাওয়া যায় যেমন- মেরুতুঙ্গরচিত *ভোজপ্রবন্ধ*, রাজবল্লভ রচিত *ভোজপ্রবন্ধ*, বৎসরাজরচিত *ভোজ প্রবন্ধ*, শুভাশীল রচিত *ভোজপ্রবন্ধ*, পদ্মগুপ্তরচিত *ভোজপ্রবন্ধ*, *পদ্যতরঙ্গিনী* কাব্যের রচয়িতা ব্রজনাথ রাজশেখর রচিত *ভোজপ্রবন্ধ* ইত্যাদি। রাজাভোজের জীবনী অবলম্বনে বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য *ভোজচরিত* ও *ভোজরাজসচ্চরিত* নামে দুই অঙ্কের দৃশ্যকাব্য রচনা করেন। *ভোজপ্রবন্ধ* বহুবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫১ সালে মাদ্রাজ থেকে, শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ১৮৭২ সালে কলকাতা থেকে, শ্রীবাসুদেব পংশীকর ১৯২১ সালে বোম্বে থেকে একটি *ভোজপ্রবন্ধ* প্রকাশ করেন। পণ্ডিত S. K. DE তাঁর *History of Sanskrit literature* গ্রন্থে Indian Office Catalogue এ *ভোজপ্রবন্ধের* একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের কথা উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত Theodore Pavic প্যারিস থেকে অনুবাদসহ *ভোজপ্রবন্ধের* প্রকাশ করেন।

ভোজ নামক একাধিক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। বিদর্ভরাজ ভোজ যাঁর আবির্ভাব কাল দশম শতকে (১০০৫-১০৫৪)। যিনি *রামায়ণচম্পূ* নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এই সময়ে আর একজন ভোজ নামক ব্যাক্তির নাম পাওয়া যায় যিনি ধারা নগরীর অধিপতি ছিলেন। যিনি কাব্য রসিক ও বিদ্বান ব্যাক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। মনে করা হয় যে এই কাব্য রসিক ধারা নগরের রাজাভোজ নামক ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে বল্লাল সেন *ভোজপ্রবন্ধ* রচনা

করেছিলেন। বল্লাল সেন তিনি ঐতিহাসিক কাব্যরচনা করলেও এই গ্রন্থের মধ্যে কথোপকথার সঙ্কলন পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ রচনা বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি জৈন সাহিত্য পাওয়া যায়। তাই এই প্রবন্ধকে মনোরঞ্জক *কাব্য-সূক্তি-সংগ্রহ* বলা যেতে পারে। মহারাজ ভোজের বিদ্যা অনুরাগ ও বদান্যতা গুণে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ কবি ও বিদ্বজ্জনেরা সবাই উপস্থিত হয়ে আপন আপন কবিত্বগুণে রাজাকে সন্তুষ্ট করে যথাযোগ্য পারিতোষিক লাভ করতেন। রাজাভোজ তিনি নিজেও সাহিত্যের প্রতি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বল্লাল সেনের রচনা থেকে জানা যায় যে রাজাভোজের দরবারে মহাকবি কালিদাস, কবি ভবভূতি, কবি মাঘ, কবি মল্লিনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও অনান্য কবির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

It brings together in Bhojo's court a large number of literary celebrities, such as Kālidaāa, Bhababhūtī, Daṇḍin and Māgha, as well as less known poets like Sītā and Cittapa, who are made to display their readiness of wit and vie with each other in quick composition of smart verses in a series of amusing, but unconnected anecdotes.[১০]

## ১:২ তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

### ১:২:১ *পঞ্চতন্ত্রে* তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয় প্রাচীন, মধ্য ও নব্য। প্রাচীন আর্য ভাষার অন্তর্গত বৈদিক যুগ। এই যুগে *ঋগ্বেদ* রচিত হয়েছিল। প্রাচীন যুগে

রচিত *ঋগ্বেদের* আবির্ভাব কাল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। প্রাচীন আর্য যুগের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A. A. Macdonell বলেছেন-

The first is the Vedic, which beginning perhaps as early as 1500B.C., extends in its latest phase to about 200B.C.[১১]

আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে *পঞ্চতন্ত্রের* আবির্ভাব কাল খিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক। তৎকালীন সময়ে ব্রাহ্মসমাজ ও ক্ষত্রিয় জনসম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করলেও তার প্রভাব ক্রমশ কমতে থাকে। কুষাণবংশের রাজা দ্বিতীয় কদফিসেস (৬৫-৭৫ খ্রিস্টাব্দ) উত্তর ভারতের কতগুলো অংশে রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর পরে রাজা হন কনিষ্ক (৭৮ খ্রিষ্টাব্দ)। কনিষ্ক তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। চীনা পরিব্রাজক Hsuan Tsang এবং ইরাণীয় পণ্ডিত Al Biruni (Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni) সাক্ষাৎ হতে জানা যায় যে তিনি পেশোয়ারে বিশাল বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। কথিত আছে কনিষ্কের অনুপ্রেরণায় কাশ্মীরে (মতান্তরে গান্ধার বা জালন্ধরে) বৌদ্ধ সভার আয়োজন হয়েছিল। এছাড়া তাঁরা সবাই মহাযানী নাগার্জুন ও স্বনামধন্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা প্রভৃতি বৌদ্ধদার্শনিকের সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। জাতিগত ও ধর্মীয় কঠোরতার কারণে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ জনপ্রিয়লাভ করে। কুষাণ রাজত্বের অবসানের পর উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উপজাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এছাড়া কোন কোন অঞ্চলে রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। গণতন্ত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আর্জুনায়ন, মালব ও যৌধেয়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে পশ্চিম ভারতের সিন্ধু উপত্যাকায় শকগণ প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে দক্ষিণ ভারতের অপর দুটি বংশ প্রাধান্য লাভ করে একটি ছিল দাক্ষিণাত্যে উত্তরাঞ্চলে সাতবাহনবংশ এবং অপরটি কলিঙ্গের চেদিবংশ। খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকে সাতবাহনবংশের অবসানের পাশাপাশি দাক্ষিণাত্যের বাকাটকবংশের রাজাগণ প্রভুত্ব স্থাপন করেন। বাকাটকবংশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন

প্রথম প্রবরসেন এবং তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একজন বলিষ্ঠ পোষক। এছাড়া আভীর, বোধি, ইক্ষ্বাকু, বৃহৎফলায়ণ, চোল, প্রাণ্ড, চের ইত্যাদি বংশ দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। অন্যদিকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে নন্দবংশের পতন এবং গুপ্তবংশের উত্থান শুরু হয়। গুপ্তবংশের প্রাচীন ও প্রধান রাজা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি সম্ভবত ৩২০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং সমগ্র বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং বঙ্গদেশের কিছু অংশ তাঁর শাসনাধীন ছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর রাজা হন তাঁর পুত্র সমুদ্র গুপ্ত। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁর রাজ্য জয়ের বিবিধ গুণাবলী বর্ণিত রয়েছে। কৌটিল্য ওরফে বিষ্ণুগুপ্ত বুদ্ধি বলে নন্দবংশের পতন ঘটিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সিংহাসনে প্রতিস্থাপন করেন। এর ফলে শক, পহ্লব, কুশান ও গ্রিক তৌফিক-ই বহির্ভারতীয় জাতিগুলির প্রভাব হিন্দু ধর্মে পরিলক্ষিত হয়। এইসময় গ্রীক দূত Megasthenes পাটলিপুত্রের রাজসভায় কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন এবং ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A. A. Macdonell বলেছেন-

This was followed by the sojourn in India of various Greeks, of whom the most notable was MEGASTHENES. He resided for some years about 300B.at the court of Pataliputra (The modern Patna) .....state of Indian society.[১২]

বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব এই চারটি ধর্মের প্রভাব তদানীন্তন সময়ে প্রকট হলেও বৌদ্ধ ধর্মের অধিকমাত্রায় আধিক্য ও মর্যাদা লাভ করে। বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা ছিল ভক্তি উপাস্য। দেবতার প্রতি প্রেম ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ একনিষ্ঠ ভক্তি, অভিষ্ঠ দেবতার প্রসাদ, অনুগ্রহ ও মোক্ষলাভের উপায় মাত্র। এই যুগে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ও কৃষ্ণ লীলার প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

*কাকোলূকীয়* অংশে *ঘৃতান্ধব্রাহ্মণ* কথাতে দেবী ভগবতীর মন্দিরের উল্লেখ্য পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রের প্রভাবের প্রতিচ্ছবি পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে। এ *পঞ্চতন্ত্রের* সূচনায় বলা হয়েছে-

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণু শর্মেদম্।

তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং শাস্ত্রম্।।[১৩]

অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থটি থেকে সেই সময়ে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা, সমাজনীতি, রাজনৈতিক চিন্তার তাত্ত্বিক নিদর্শন মাত্র যার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় *পঞ্চতন্ত্র* নামক গল্পসাহিত্যে। *পঞ্চতন্ত্রের* মূল উপজীব্য ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের সাধক। নীতিশাস্ত্র মুখ্য উপজীব্য হওয়ায় নীতিশাস্ত্রের প্রবক্তা মনু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য, পরাশর, ব্যাসদেব এবং চাণক্যের উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে *পঞ্চতন্ত্রে* বলা হয়েছে-

মনবে বাচস্পতয়ে শুক্রায় পরাশরায় সসুতায়।

চাণক্যায় চ বিদুষে নমোঽস্তু নয়শাস্ত্র কর্তৃভ্রঃ।।[১৪]

এছাড়া পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা ছয় মাসের মধ্যে মূর্খ অবিনীত রাজপুত্রদের নীতিশাস্ত্রজ্ঞ করে তোলার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং তিনি একথা বলেছিলেন নীতিশাস্ত্রজ্ঞ করে তুলতে না পারলে তিনি তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম ত্যাগ করবেন-

পুনরেতাংস্তব পুত্রান্ মাসষট্কেন যদি নীতিশাস্ত্রজ্ঞান্ না করোমি ততঃ স্বনামত্যাগং করোমি। [১৫]

কবি বিষ্ণুশর্মার এই উক্তির মধ্যে তৎকালীন সমাজে নীতিশাস্ত্রের প্রভাবের কথা প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া *পঞ্চতন্ত্রের* বিভিন্ন গল্পে নীতিশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। *মিত্রভেদ* অংশে দুর্জন ব্যক্তি প্রসঙ্গে যে নীতিশাস্ত্রের অবতারণা করা হয়েছে সেটি হলো-

সর্পাণাং চ খলানাং চ পরদ্রব্যাপহারিণাম্।

অভিপ্রায়ো ন সিধ্যন্তি তেনেদং বর্ততে জগত্।। [১৬]

অর্থাৎ সাপ এবং পরস্ব-হারী দুর্জনের মতলব সব সময় বর্তমান থাকেনা আর তাতেই এই জগৎ বর্তমান। *কাকোলূকীয়ে শশকপিঞ্জলকথাতে* জৈন সম্প্রদায়ের অহিংসার বাড়াবাড়ির প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

অহিংসাপূর্বকো ধর্মো যস্মাত্ সদ্ভিরুদাহৃতঃ।

যূকমত্কুণদংশাদীংস্তস্মাত্তানপি রক্ষয়েত্।।[১৭]

অর্থাৎ সজ্জনেরা অহিংসা পূর্বক ধর্ম আচরণের কথা বলেন তাই উকুন, ছারপোকা, ডাঁশ প্রভৃতিকে থেকে রক্ষা করা উচিত। আবার ঐ একই গল্পে যাজ্ঞিকদের হিংসার বাড়াবাড়িকে তুলে ধরে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে প্রতিফলিত করেছেন। স্বদেশানুরাগ তথা দেশপ্রেমের নামে সংকীর্ণতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন *কাকোলূকীয়* ও *অপরীক্ষিতকারক* অংশে। এ প্রসঙ্গে *কাকোলূকীয়* অংশে বলা হয়েছে-

ন তাদৃগজায়তে সৌখ্যমপি স্বর্গে শরীরিণাম্।

দারিদ্রেহপি হি যাদৃক্ স্যাত্ স্বদেশে স্বপুরে গৃহে।।[১৮]

অর্থাৎ দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজের দেশে, নিজের শহরে, নিজের গৃহে দেহধারীদের এরকম সুখ হয় স্বর্গীয় সেইরকম সুখ অবশ্য হয় না। তথাকথিত সমাজে নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণিত হয়েছে। *অপরীক্ষিতকারকে সারমেয়বিদেশভ্রমণকথাতে* একই প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। সমাজে নারীরা নিষিদ্ধ, ভোগ্যা, এবং দ্বেষ্যা। সমাজে পুরুষ সম্প্রদায়ের আধিপত্যের কথা প্রতিফলিত হয়েছে *অপরীক্ষিতকারকের চারব্রাহ্মণযুবকসিদ্ধবর্তিকা* গল্পে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আকাশ থেকে যেমন জল পড়ে তেমনি পাতাল খুঁড়লেও জল আসে। অচিন্তনীয় দৈবই শুধু বলবান নয়, পুরুষকারও বলবান-

পততি কদাচিন্নভসঃ খাতে পাতালতোঽপি জলমেতি।

দৈবমচিন্ত্যং বলবদ্ধলবান্ ননু পুরুষকারোঽপি।[১৯]

**১:২:২ *বেতালপঞ্চবিংশতিতে শুকসপ্ততে, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকাতে, হিতোপদেশে* তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য**

এই জাতীয় গল্পসাহিত্যগুলি অনুমানিক একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা* গ্রন্থে তৎকালীন সময়ের সমাজের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন। ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং তাঞ্জোরের চোলবংশ ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করে। এইসময় দাক্ষিণাত্যের চোলবংশের রাজা ছিলেন রাজেন্দ্র চোল। মধ্য ও পশ্চিমভারতে যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড রাজবংশ গুলির প্রাধান্য লাভ করেছিল সেগুলি হলো চন্দেল্ল, কলচুরি, পরমার, চৌলুক্য, চাহমান, গোহিল, তোমর, শাহী ইত্যাদি। কাশ্মীরে উৎপলবংশের রাজত্বের অবসান ঘটে ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে এবং তারপর

দ্বাদশশতকে স্থাপিত হয় লোহরবংশের রাজত্ব। কাশ্মীরীয় কবি বিহ্লণ রচিত *বিক্রমাঙ্কদেবচরিত* (আনুমানিক একাদশ থেকে দ্বাদশ শতক) নামক ঐতিহাসিক কাব্য প্রধানত চালুক্য রাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত হয়েছে। মালবের পরমাররাজ ভোজের নাম একাদশ শতকে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যবংশ, গঙ্গ, পল্লব, বাণ প্রভৃতি অন্যান্য রাজবংশের নাম উল্লেখযোগ্য। দশম শতকে দক্ষিণ থেকে আগত সেনবংশ বাংলার সিংহাসন দখল করেন এবং পালবংশের পতন শুরু হয়। কবি জয়দ্রথের রচিত *হরচরিতচিন্তামণি* মহাকাব্য এবং কবিমঙ্খের রচিত *শ্রীকণ্ঠচরিত* প্রভৃতি মহাকাব্য থেকে থেকে জানা যায় যে তৎকালীন সময়ে শৈবধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ভারত তত্ত্ববিদ S. N. Dasgupta & S. K. De এ বিষয়ে অভিমত পোষণ করেছেন-

.... which retail in the Śloka metre old and new Śiva myths and legends, some of which are directly connected with places of pilgrimage in Kashmir.[২০]

রাজা ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*, রুয্যকের রচিত *অলংকারসর্বস্ব*, আচার্য অভিনবগুপ্তের *তন্ত্রালোক*, ভাস্করাচার্যের *সিদ্ধান্ত শিরোমণি*, আচার্যমম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থগুলি বেশ পরিপুষ্ট লাভ করে। সংস্কৃত সাহিত্যে পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যেও তদানীন্তন সময়ের অগ্রসর পরিলক্ষিত হয়। বাংলা সাহিত্যের *চর্যাপদের* নাম সকলের জ্ঞাত। *চর্যাপদের* আবির্ভাব কাল দশম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে। *চর্যাপদ* সম্বন্ধে বলা হয়েছে- "A Collection of Buddhist mystic songs." এরপর বাংলা সাহিত্য দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের* পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং তেইশজন বৌদ্ধ সহজিয়া এই পদগুলির রচনা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন সমাজে

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এইসময় পালবংশের পতন এবং সেনবংশের উত্থান বাংলায় পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানগণ শাসকগণ ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করবার উদ্দেশ্যে বহুযুগ হতে অভিযান চালালেও হিন্দু রাজার প্রতিরোধে বিপর্যস্ত হয়ে পুণরায় শক্তি সঞ্চয় করে ভারতের উপর আঘাত হানতে শুরু করেছিল। দ্বাদশ শতকে ইফতিকার-উদ্দিন-বিন বকতিয়ার নামক এক তুর্কির বহিরাগত জাতির আক্রমণে বাংলার রাজধানী নবদ্বীপের সেনবংশের উপর আঘাত হানে এবং সেনবংশের পতন হয়। দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে বঙ্গবীর প্রভৃতি অঞ্চল মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং দীর্ঘকাল তাঁদের শাসনাধীন হয়ে থাকে। *সদুক্তিকর্ণামৃত* কাব্যের রচনাকার শ্রীধর দাস (দ্বাদশ শতক) বাংলার সেনবংশের রাজালক্ষ্মণ সেনের মহামণ্ডলিক ছিলেন। চালুক্যবংশের রাজার প্রাধান্য, দক্ষিণ ভারতীয় যদুবংশীয় রাজা এবং শাকম্ভরী চৌহানবংশীয় রাজা তদানীন্তন সময় বেশ খ্যাতি লাভ করেন। কবি সুভটের  রচিত ছায়া নাটক *দূতাঙ্গদ* এবং কবি অমর চন্দ্রের *বালভারত* নামক রচনাটি চালুক্য বংশের রাজা ত্রিভুবন পালের সমসাময়িক এছাড়া কবি যশপাল রচিত *মহোপরাজয়* নামক পঞ্চাঙ্ক নাটকটি চালুক্যবংশের রাজা অভয় পাল দেবের সমসাময়িক। ১২৫৭ শতকে রচিত *সূক্তিমুক্তাবলী* বা *সুভাষিতমুক্তাবলী*র রচয়িতা কবি জহ্লণ, তিনি দক্ষিণভারতীয় যদুবংশের রাজা কৃষ্ণের সমসাময়িক ছিলেন। *শাঙ্গধরপদ্ধতি*র রচয়িতা শাঙ্গধর তিনি শাকম্ভরী রাজ্যের রাজা চৌহানবংশের রাজা সমসাময়িক। ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিমবাংলার কিছু অংশ মুসলিমজাতির হস্তগত হয় পরে পাঠান, সুলতান ও মুঘলরা দীর্ঘ পাঁচ শত বছর ধরে বাংলায় শাসন করেছেন। এই শতকে দিল্লীর সিংহাসন অধিকারে মুসলিম শাসক সম্প্রদায় কৃতকার্য হন। ১২৯০ শতকে খলজিবংশের উত্থান হয় এবং আলাউদ্দিন খলজী সংহত সাম্রাজ্য স্থাপনের তৎপর হন। সেইসঙ্গে হিন্দুগণের উপর নানা ভাবে অত্যাচার করেন। ১৩২০ শতকে খলজীবংশের পতনের পর তুঘলকবংশের উত্থান ঘটে। কবি কহ্লণ পরবর্তী যুগে সুলতান আমলে

মুসলমান বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় চারজন ঐতিহাসিক বিদ্বান ঐতিহাসিক কাব্য *রাজতরঙ্গিণী*র চারটি অধ্যায় সংযোজন করেন, যা *দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিণী* নামে খ্যাত। দ্বাদশ শতকে প্রখ্যাত বৈয়াকরণ ও ধর্মাচার্য হিসেবে হেমচন্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, তাঁর রচিত গ্রন্থটি *ত্রিষষ্ঠীশলাকাপুরুষ* যা *জৈনরামায়ণ* নামে প্রসিদ্ধ। এছাড়া আচার্য পদ্মনাভ রচিত *সুপদ্মব্যাকরণ* এবং কবি রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামী রচিত *হরিনামৃত* নামক গ্রন্থের মাধ্যমে ব্যাকরণ শিক্ষাধারাতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের কথা বলা হয়েছে, বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শৈব ধর্মের প্রভাব ও বিদ্যমান ছিল। একাদশ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে লোহিত ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাইরের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা শুরু হয়। ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে একাদশ-দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে চোলরাজাদের উত্থানের সময়ে দাক্ষিণাত্যের করমণ্ডল এবং মালাবার বন্দরে বেশ ভালো ধরণের বাণিজ্যিক জাহাজ তৈরি হতো। ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন দেশের বণিকরা ভারতীয় বস্তু সামগ্রী পশ্চিম দুনিয়ায় জোগান দিতেন। সেই সময় মিশরে ফতিমিদবংশের রাজত্বের পাশাপাশি ইসলাম রাষ্ট্রগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময় সমুদ্রপথে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির শিখরে পৌঁছে যায়। দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মশলাপাতি, গন্ধদ্রব্য, রঞ্জক দ্রব্য, আয়ুর্বেদিক গাছগাছরা, লোহা এবং জাহাজ তৈরি কাঠ ভারত থেকে আরব এবং পারস্যে মিশর এবং ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপে পাঠানো হতো। মুসলিমদের তুলনায় ভারতীয় হিন্দুরা বাণিজ্য ব্যাপারে ধর্মের কারণেই হোক বা সমুদ্রযাত্রার ভয়েই হোক তারা অনেকটা পিছিয়ে ছিলেন। পারস্য উপসাগরে অবস্থিত হরমুজ বন্দরের মাধ্যমে ভারতের পণ্যবাহী জাহাজ ইরান, ইউরোপ, রাশিয়া, মধ্য এশিয়ায় প্রভৃতি স্থানে গিয়ে বাণিজ্য চালাত। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বলেছেন-

দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের যেসব তথ্যপূর্ণ দলিল ঐতিহাসিকেরা পরীক্ষা করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে- ভারতের মশলাপাতি, গন্ধদ্রব্য, রঞ্জকদ্রব্য, আয়ুর্বেদিক গাছ- গাছড়া, লোহা এবং জাহাজ-তৈরির কাঠের খুব ভালো চাহিদা ছিল আরব এবং পারস্যে, মিশর এবং ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপে।[২১]

*বেতালপঞ্চবিংশতি*তে রাজা বিক্রমাদিত্যের দানশীলতা ও মহানুভবতার কথা গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শুধু তিনি রাজা গুণের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেনি। তার সাথে তিনি তৎকালীন সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিকটিকে এবং লোভাতুর কুলোপুরোহিত চরিত্রকে উদ্ঘাটন করে তির্যক দৃষ্টি জ্ঞাপন করেছেন। কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া গল্পে সন্ন্যাসী, সাধক, কাপালিকের কপটতার নিদর্শন লক্ষিত হয়।

*শুকসপ্ততি* গল্পে তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। সাহিত্যিক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর লেখা *শুকসপ্ততি* গ্রন্থটি থেকে জানা যায় যে তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষে মুসলিমসম্প্রদায়ের অধিকার চলে এসেছে। সুলতান মামুদ এবং মোহাম্মদ ঘোরির আক্রমণ শেষে তাঁরা দিল্লীর মসনদে বসেন এবং দাস রাজাদের রাজত্ব তখন শেষের মুখে। এই সময় রাজতন্ত্রের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসে এবং গণতন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বেশ কিছু কিছু গল্পে তেমন চতুর্থগল্পে, দশমগল্পে, সাতাশতমগল্পে, ছত্রিশতমগল্পে গ্রামীণ শাসনকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে। চৌত্রিশতমগল্পে ব্রাহ্মণ্য জাতির সংরক্ষণশীলতা বিষয়ে নিন্দা করা হয়েছে। তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণ ব্যক্তিরা সমাজ রক্ষক হিসেবে পরিগণিত হতো। কিন্তু এই গল্পের মধ্যে সমাজ রক্ষক ভূমিদেব ব্রাহ্মণকে তার ব্রাহ্মণ্যজাতি নিয়ে মাথা ঘামানোর পরিবর্তে তিনি গ্রামের সরলা রমণীর সঙ্গে নির্দ্বিধায় ভোগবাসনা চরিতার্থ করেছেন। শম্ভু নামক ব্যক্তিটি জাতিতে ব্রাহ্মণ হোলেও জুয়া খেলার মতো নিম্ন বৃত্তি

গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষা থেকেও যেটার প্রতি কবি অধিকমাত্রায় দৃষ্টিপাত করেছেন সে বিষয়টি হলো শম্ভু নামক ব্রাহ্মণটি গ্রাম্য সরলা রমণীর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অথবা তার দারিদ্রোত্থিত লোভের সুযোগ নিয়ে তাকে ভোগ করার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। পঁয়ষট্টিতমগল্পে শিবভক্ত সাধু যিনি শ্রাবক বলে সম্বোধিত হয়েছেন। সেই শিবভক্ত সাধু মাংসখাওয়ার লোভে প্রবৃত্ত হওয়ায় অন্যদের সামনে তাঁকে লজ্জায় পড়তে হয়েছে। তৎকালীন সময়ে হিন্দুদের উপর নানা অত্যাচারের প্রতিফলন উপরি উক্ত গল্পের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমগল্পে লক্ষ্মীর কামতাড়নার নিমিত্ত পূর্ণা মোহবশত লক্ষ্মীর স্বামীকে রমণার্থী হিসেবে হাজির করে। চতুর্থগল্পে গোবিন্দপত্নী মোহিনী পিতৃগৃহে যাত্রাকালে আগন্তুক বিষ্ণু নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। গোবিন্দ পত্নী ও বিষ্ণুর নামক ব্রাহ্মণ পরের পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়। কবি উপরি উক্ত গল্পের মাধ্যমে তথাকথিত সমাজে নারীদের তাড়নাপীড়িত নগ্নচিত্র তিনি উন্মোচন করেছেন। তার দায় শুধুমাত্র নারীরাই নয় পুরুষেরাও সমানভাবে দায়ী। তেইশতম গল্পে গণিকার লাম্পট্যের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয়গল্পে এক বণিকের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ায় বণিকেরা বন্ধ করে দিয়েছে এবং তারা রাজার কাছে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এই ঘটনার নিরিখে বলা যায় যে একাদশ-দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে বণিকদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ভারতের বাইরে বাণিজ্যের পরিচয়ের কথা জানতে পারা পারা যায় বাহান্নতমগল্পে। উক্ত গল্পে বণিক সম্প্রদায় বিদেশ ভূমিতে ব্যবসা করতে গিয়ে বিড়ম্বিত হয়ে নালিশ ও সুবিচারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পঁচিশতমগল্পে কবি বণিকসম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তৎকালীন সমাজে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নগ্ন রূপটিকে জনসমক্ষে উন্মোচিত করেছেন। সেইসঙ্গে জৈন ধর্মের প্রাধান্যতার বিষয়টিকে পরিস্ফুট করেছেন। ষষ্ঠগল্পের পটভূমিকায় দারিদ্রতা এক অতি বাস্তবচিত্র। এই সমাজের মানুষ ধর্মীয় বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেকে বেঁধে রাখে । সে কারণেই মনের মধ্যে ধর্মীয় দার্শনিকতা জাগিয়ে বিশ্বাস

করতে ভালোবাসে যে মানুষকে পুণ্য ক্ষয়ের ফলে দারিদ্র ভোগ করতে হয়। দরিদ্র হওয়ার ফলে সুমতি নামক বণিকের সাথে নগরের লোকজন মেশে না এবং তাঁর সঙ্গ কেউ দেয় না। টাকা থাকলে সেই ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন টিকে থাকে এমনকি টাকার বলেই মানুষ বল বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে বলবান এবং পণ্ডিত বলে মনে করে। এই কঠিন বাস্তবকে সুমতি বণিকের হৃদয়ে চরম পীড়া দেয়। আর সেই কারণেই বনের মধ্যে কাঠের নির্মিত গণেশের মূর্তি পেয়ে দারিদ্রতার কারণে তাঁকে বেচে দেবে এই কথা ভাবতেও পিছপা হননি। আসলে দারিদ্রতার কারণে নিজের ক্ষুধা নিবারণের জন্য এই রূপ বিধিসম্মত পাপ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। কারণ ভদ্র সজ্জনেরা যেসব নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান মেনে চলেন ক্ষুধার্থ ব্যক্তির পক্ষে তা মেনে চলা কখনোই সম্ভব নয়। বস্তুত রীতি সম্মত বৈবাহিক জীবনের বাইরে কামুক ও লম্পট্যের যে জগত, ব্রাহ্মণ্য সংরক্ষণশীলতার অসঙ্গতি, দারিদ্রতার বাস্তবচিত্র, রাজনৈতিকভাবে প্রখরতা, গ্রাম্য পরিবেশের আলোকচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা রচিত *হিতোপদেশের সুহৃদভেদ* অংশে নবমকথাতে পিঙ্গলক,সঞ্জীবক, করটক ও দমনকের গল্পে সঞ্জীবক নামক সিংহ এবং পিঙ্গলক নামক বৃষের মধ্যে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটনার মধ্যে রাজনীতির বিচিত্র রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

নীতির্বারবিলাসিনীব সততং বক্ষস্থলে সংস্থিতা ।[২২]

অর্থাৎ রাজনীতি (নীতি) বারাঙ্গনার মত মন্ত্রীদের বক্ষঃস্থলে সর্বদা বিরাজ করে। তৎকালীন সমাজে যে শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা*তে চৌদ্দতম উপাখ্যানে রাজা বিক্রমাদিত্যকে যোগী শিবের মূর্তি দান করেছেন। তৎকালীন সমাজের শৈবধর্মের প্রতিচ্ছবি

লক্ষিত হয়। *হিতোপদেশের* শাশ্বত নিত্যতা প্রসঙ্গে কবি নারায়ণ শর্মার উক্তিতে তা প্রতিফলিত হয়েছে-

প্রালেয়াদ্রেঃ সুতায়াঃ প্রণয় নিবসতিশ্চন্দ্রমৌলিঃ স যাব-

দ্যাবল্লক্ষ্মীর্মুরারের্জলদ ইব তড়িন্মানসে বিস্ফুরন্তী।[২৩]

*বিগ্রহ* অংশে জম্বুদ্বীপের শুক দূত রূপে কর্পূরদ্বীপে আগমন এবং সিংহল দ্বীপ থেকে মেঘবর্ণ নামক কাকের জম্মুদ্বীপে আগমন এই ঘটনার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে বহিরাগত জাতির আগমনকে সূচিত করা হয়েছে। এছাড়া সেই সময়ে খণ্ড খণ্ড রাজবংশের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। *হিতোপদেশে* স্ত্রীচরিত্রের দুর্বলতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। *মিত্রলাভ* অংশের পঞ্চমগল্পে সুন্দর পুরুষের প্রতি নারীর কামার্তের রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

স্ত্রিয়ো হি চপলা নিত্যং দেবানামপি বিশ্রুতম্।

তাশ্চাপি রক্ষিতা যেষাং তে নরাঃ সুখভাগিনঃ।।[২৪]

অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা সততই চপল-এই কথা দেবতাদের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে। এই চপল নারীদের যারা রক্ষা করতে পেরেছেন, তারাই সুখী। একই অংশে সপ্তমকথাতে দুটি শ্লোকে (১৯৭ এবং ১৯৮তম শ্লোকে) মিথ্যাকথা, হঠকারিতা, নির্গুণত্ব ইত্যাদি নারীর স্বভাবত দোষের কথা কবি বলেছেন। এছাড়া *সুহৃদভেদের* ষষ্ঠগল্পের একাধিক শ্লোকে নারীজাতির নির্গুণের কথা বলা হয়েছে। দান, মান, সরলতা, সেবা, শাস্ত্র, শস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে স্ত্রী জাতির অসন্তোষের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন স্ত্রীলোকের আহার পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ, বুদ্ধি চার গুণ, ব্যাবসায়িক বুদ্ধি ছয় গুণ এবং কাম আট গুণ-

আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।

ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ।।[২৫]

### ১:২:৩ *পুরুষ পরীক্ষা*তে তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

কবি বিদ্যাপতি রচিত *পুরুষপরীক্ষা* গ্রন্থটির আবির্ভাব খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতক। এই সময় খলজীবংশের পতন হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় তুঘলকবংশ। এই বংশ চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি রাজত্ব করেছিল। তৈমুর লং এর আক্রমণে তুঘলকবংশের পতন ঘটে, সেইসঙ্গে হিন্দুগণের উপর পাশবিক অত্যাচার বহুগুণে বর্ধিত হয়েছিল। তুঘলকবংশের অবসানের পর বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয়। তুঘলকবংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে দুটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় একটি বাহমনী রাজ্য, দ্বিতীয়টি বিজয়নগর রাজ্য। বিজয়নগর রাজ্যের উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং বহুকবি ও পণ্ডিত কর্তৃক সমাদৃত ছিলেন। তাঁর সময় শুধু সাহিত্য নয় স্থাপত্য এবং শিল্পে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। চতুর্দশ শতকে শাহবংশের উত্থান ঘটে। বাংলাদেশের সমাজজীবন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক থেকে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল এই সময় তার অবসান ঘটে। শিল্প, সাহিত্য ধীরে ধীরে অরাজকতার হাত থেকে মুক্তি পায়। বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু সমাজের মুক্তির পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রাধান্য লাভ করে। কবি বিদ্যাপতি মিথিলার রাজাশিব সিংহের সুপ্রসিদ্ধ সভাকবি ছিলেন। এই সময় নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য প্রাধান্য লাভ করেন, সেইসঙ্গে বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার বিখ্যাত কবি জয়দেব তিনি *গীতগোবিন্দ* রচনা করেন সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তৎকালীন সমাজজীবন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক থেকে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিচ্ছবি গল্পের মধ্যে লক্ষিত হয়। *অথবর্ব্বরকথা*তে কবি বলতে চেয়েছেন বুদ্ধিহীন ও প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তিরা বারংবার

শাস্ত্র অভ্যাস করলেও প্রকৃত পণ্ডিত হতে পারে না, প্রকৃত পাণ্ডিত্যের জন্য চাই বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা। কবি নির্বোধ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শান্তিধর নামক চরিত্রে মাধ্যমে যে গল্পের অবতারণা করেছেন। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি হলো পাণ্ডিত্যের প্রধান উপাদান যা মানুষের জন্মগত উপাদান। বারংবার শাস্ত্র অভ্যাসের দ্বারা তা সম্ভব নয় এই সহজ সত্যটাকে জনসমক্ষে পরিস্ফুট করেছেন। *অথশাস্ত্রবিদ্যকথা*তে কবি বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণের শিরোপীড়ারূপ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে গল্পের অবতারণা করেছেন, তাতে তথাকথিত সমাজের ব্রাহ্মণ্যধর্মের ব্যক্তির প্রতি শাস্ত্রাধিগত বাক্যকে অমৃতস্বরূপ মননশীল মনোভাবকে প্রকাশ করে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। *অথনৃত্যবিদ্যকথা*তে কবি বিদ্যাপতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে গন্ধর্ব ও উমাপতিধর নামক চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তথাকথিত সমাজের বিদগ্ধ পণ্ডিতদের কলহদ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট করেছেন। সমাজের নানা স্তরের পুরুষের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে যেমন দানশীল, দয়াবান, সত্যবতী, যুদ্ধবীর, সুবুদ্ধি, সপ্রতিভ, মেধাবী, সবিদ্য, সশস্ত্র, সশাস্ত্র, লৌকিকবিদ্য, বেদবিদ্য, গীতবিদ্য, নৃত্যবিদ্য, ইন্দ্রজালবিদ্য, চিত্রবিদ্য প্রভৃতি গুণাধার পুরুষের চরিত্র যেমন অঙ্কিত হয়েছে তেমনি চোর, অসাধু, অলস, অবুদ্ধি, জন্মবর্ব্বর, সংসর্গবর্ব্বর, কামপীড়িত, অবসন্নপীড়িত, মূঢ় ও নীচ প্রভৃতি নানা মন্দপুরুষের চরিত্রও বর্ণিত হয়েছে। *পুরুষপরীক্ষায়* গল্পগুলির মধ্যে কবি সমাজের ন্যায়-অন্যায় তথা যথার্থ পুরুষের আচরণ বিধি জনসমাজে তুলে ধরে সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন।

### ১:২:৪ *ভোজপ্রবন্ধে* তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

কবি বল্লাল বা বল্লভ রচিত *ভোজপ্রবন্ধ* রচনা করেন আনুমানিক ষোড়শ শতকে। পরমার রাজবংশীয় ধারানগরীর অধিপতি ভোজকে ( আনুমানিক দশম শতক) কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধটি রচিত হয়। মধ্য ভারতের মালব অঞ্চলের অন্তর্গত ধারা নগরী, উত্তরে চিতোর থেকে দক্ষিণে

কঙ্কন উপকূল পর্যন্ত এবং পূর্বে সবরমতিনদী থেকে বিদিশানগরী পর্যন্ত রাজাভোজের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। জনশ্রুতি আছে যে, বেতালসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যের দেবরাজ ইন্দ্রপ্রদত্ত ভূগর্ভে প্রথিত সিংহাসনকে তিনিই উদ্ধার করেছিলেন। তিনি দক্ষিণভারতের শক্তিশালী রাজারাজেন্দ্র চোলের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক করে তোলেন এবং শাহীরাজাদের গজনিকে মহম্মদের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি একজন ভালো শাসকই ছিলেন না, সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন পণ্ডিত, কবি, সমাজ সংস্কারক। তাঁর রাজত্বকালে সংস্কৃত ভাষায় কথ্য ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। শিক্ষার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজাভোজের *শৃঙ্গারপ্রকাশ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* সংস্কৃত সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি। তুঘলকবংশের অবসানের পর ভারতের লোদীবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের রাজত্বকাল ছিলো পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। ষোড়শ শতকে দক্ষিণ ভারতের তৎকালীন সময়ে ময়ূরীগিরি বাগুল রাজা বর্তমান ছিলেন। এই সময় মুঘল সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর তিনি সুশাসন এবং অত্যাচারিত হিন্দু নারীদের প্রতি উদার মনোভাব হেতু একটি সুসংহত বিস্তীর্ণ সমাজ গঠনে সমর্থ হন। তৎকালীন সমাজে দুজন ঐতিহাসিক বিদুষী মহিলা কবির নাম স্মরণীয়, তাঁরা হলেন রামভদ্রম্বা এবং গঙ্গা দেবী। ষোড়শ শতকে কবি হীরবিজয় সূরী রচিত জৈনমহাকাব্য *বিজয়প্রশস্তিকাব্য* রচিত হয়। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। *বিপ্রভোজসংবাদে* রাজাভোজ ও বিপ্রের কথোপকথনের মধ্যে রাজাভোজের উদ্দেশ্যে বিপ্র বলেছেন- রাজাভোজকে বৈষ্ণববিপ্র রাজাকে সত্য কথা বললেও রাজা বিপ্রের কোন ক্ষতি করবেন না। সেই দিক দিয়ে বিপ্রের কোন ভয় নেই। এই উক্তির মাধ্যমে তথাকথিত সমাজে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। এছাড়া *ভোজশৈবব্রাহ্মণের* গল্পে ব্রাহ্মণের উক্তির মাধ্যমে শৈবধর্মের অস্তিত্বের কথা প্রতিফলিত হয়। ব্রাহ্মণ শিবের সামনে রাজা ভোজকে বলেছিলেন শিবের অর্ধাঙ্গ (দক্ষিণাঙ্গ) অসুর বিনাশী

বিষ্ণু ও অপর অর্ধাঙ্গ (বামাঙ্গ) হিমালয় দুহিতা গৌরী গ্রহণ করেছেন। এইভাবে পৃথিবীতে শিবের অভাব প্রকটিত হয়েছে বলে গঙ্গা সাগরকে, চন্দ্রকলা আকাশকে, সর্পরাজ পাতালকে, সর্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরত্ব আপনাকে অবলম্বন করেছে। কেবল শিবের ভিক্ষার জন্য ইতস্তত ভ্রমণ তাকে অবলম্বন করেছে। তাই বলা হয়েছে-

অর্ধং দানববৈরিণা গিরিজয়াপ্যর্ধং শিবস্যাহৃতং

দেবেত্থং জগতীতলে পুরহরাভাবে সমুন্মীলতি।

গঙ্গা সাগরমম্বরং শশিকলা নাগাধিপঃ ক্ষ্মাতলং

সর্বজ্ঞত্বমধীশ্বরত্বমগমত্ত্বাং মাং তু ভিক্ষাটনম্।।[২৬]

তিনি কাব্য রসিক ও বিদ্বান ব্যাক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। *ভোজশঙ্করকবি* কাহিনীতে জানা যায় শ্রীভোজরাজের সভা পাঁচশবিদ্বান অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁদের সকলেই ছিলেন বিবিধ শাস্ত্রে বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে বররুচি, বাণ, ময়ূর, রেক্ষণ, হরি, শঙ্কর, কলিঙ্গ, কর্পূর, বিনায়ক, মদন, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, ও তিরেন্দ্র ছিলেন প্রধান। এ প্রসঙ্গে *ভোজপ্রবন্ধে* বলা হয়েছে-

ততঃ ক্রমেণ পঞ্চশতানি বিদুষাং বররুচি-বাণ-ময়ূর-রেফণ-হরিশংকরলিঙ্গ-কর্পূর-বিনায়ক-মদন-বিদ্যা-বিনোদ-কোকিল-তিরেন্দ্রমুখাঃ সর্বশাস্ত্রবিচক্ষণাঃ সর্বে সর্বজ্ঞাঃ শ্রীভোজরাজসভামলংচক্রুঃ।[২৭]

তৎকালীন সমাজে বিদূষী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। *ভোজপ্রবন্ধে* রাজাভোজ *কালিদাসনির্বাচন* কাহিনীতে সীতা নামক বিদুষী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। রাজাভোজ কবি কালিদাসের

বারবনিতার প্রতি আসক্তি দেখে দুঃখিত হলে রাজার প্রতি সীতার উক্তি তাঁর পাণ্ডিত্যকে সূচিত করে। রাজাভোজের প্রতি বিদুষী সীতার উক্তিটি হলো-

দোষমপি গুণবতি জনে দৃষ্ট্বা গুণরাগিণো ন খিদ্যন্তে।

প্রীত্যৈব শশিনি পতিতং পশ্যতি লোকঃ কলঙ্কমপি।।[২৮]

অর্থাৎ দেব গুণানুরাগী ব্যক্তি গুণবান ব্যক্তির মধ্যে দোষ দেখলেও দুঃখ পান না। লোকে চাঁদে কলঙ্কচিহ্ন তো আনন্দের সাথেই দেখে থাকেন। সীতার এরূপ উক্তিতে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে লক্ষমুদ্রা দান করেছিলেন। এছাড়া *ভোজবিদুষীসংবাদে* জাহ্নবীতীরবাসিনী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বিদুষীর পরিচয় পাওয়া যায়। *ভোজমালাকাবধূ* কাহিনীতে মালাকারবধূর রাজা ভোজের প্রতি স্তুতিবাক্য তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়-

সমুন্নতঘনস্তনস্তবকচুম্বিতুম্বীফলক্বণন্মধুরবীণয়া বিবুধলোকলোলভ্রুবা।

ত্বদীয়মুপগীয়তে হরকিরীটকোটিস্ফুরত্তুষারকরন্দলীকিরণপূরগৌরং যশঃ।।[২৯]

অর্থাৎ সুরলোকবাসিনী চঞ্চল নয়না অপ্সরাগণ আপনার যশগান করে। তাদের বীণাদণ্ডের অলাবুফল (লাউ) অতিস্থূলত্ব হেতু পরস্পর সংশ্লিষ্ট স্তনদুটিকে আলিঙ্গন করে মধুর ধ্বনির দ্বারা শোভিত হচ্ছে। আপনার যশ মহাদেবের জটাগ্রেশোভিত হিমাংশু কলার কিরণ প্রবাহের মত শুভ্র। রাজাভোজের যশকে মহাদেবের জটাতে শোভিত চন্দ্রকলার কিরণ প্রবাহের দ্বারা শোভিত এরূপ তুলনার মাধ্যমে তথাকথিত সমাজে শৈবধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। *ভোজমাঘপত্নীর* কাহিনী, *ভোজসীতাকালিদাস* কাহিনীতে এবং *ভোজগোপকন্যা* কাহিনীতে বিদুষী নারীদের পরিচয় পাওয়া যায়।

## ১:২:৫ অনান্য সাহিত্যে হাস্যরসের প্রতিফলন

সংস্কৃতসাহিত্যে নীতিমূলক গল্পসাহিত্যের সূত্রপাত হয় বহুপূর্বে। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নীতিমূলক গল্পসাহিত্যের সূত্রপাত হয় অনেক পরে। শিশু-শিক্ষা ও শিশু-সাহিত্য উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশুসাহিত্য প্রধানত ছিল অনুবাদ প্রধান। তৎকালীন সময়ে অধিকাংশ শিশু সাহিত্যের লক্ষ্য ছিল নীতি ও শিক্ষা প্রচার। লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের *শতাব্দীর শিশুসাহিত্য* গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১৮৮১ সালে ১৫ই ডিসেম্বর ভালুক বন্ধুরূপে যে মানসিক পত্রিকাটি বার করা হয় তাতে বিজ্ঞানের গল্প ও নীতি, কবিতার সমন্বয়ে হাস্যরসের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। ১৮৯২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিশুসাহিত্যে সাময়িক পত্রিকাকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন এবং তাতে নানাজনের বিবিধ বিষয়ক রচনা সমৃদ্ধ করে। *হাসি ও খেলা* এই গ্রন্থটির মাধ্যমে শিশুমহলে সাহিত্যরস পরিবেশন আনন্দ দান করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। ১৮১৮ সালের পূর্বে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয়ের *বত্রিশসিংহাসন* (১৮০২), গোলক শর্ম্মার *হিতোপদেশ* (১৮০২)। বাংলা ভাষায় শিশু সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয় ১৮১৮ সালে নীতিকথা নামক গ্রন্থের মাধ্যমে। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ঈশপের গল্পের (Aesop's Fables) অনুসরণে ব্যঙ্গাত্মক গল্প রচনা করেছেন। যেমন-*কথামালা, চরিতাবলী, আবোল তাবোল* ইত্যাদি। লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪) *আলালেরঘরে দুলাল,* বিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮) *মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত, লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর* ইত্যাদি গল্পে কৌতুক ঘটনার উপস্থাপনায় চরিত্রের ক্রান্তীয় অসঙ্গতি প্রদর্শনে হাস্যরসাত্মক রচনা লিখেছেন। লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭) *ডমরুচরিত* গল্পটিতে *মহাভারত, বত্রিশসিংহাসন, বেতালপঞ্চবিংশতি, Decaneron* কিংবা *The Canterbury Tales* আদর্শের অনুসৃত আজগুবি অতিরঞ্জন উদ্ভট ও অদ্ভুত চরিত্রের

সংমিশ্রণে কৌতুক হাস্যরসাত্মক রচনা করেছেন। *কঙ্কাবতী, ময়না কোথায়, মুক্তামালায়* অপূর্ব হাস্যরসের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১) *হিং টিং ছট্, জুতা আবিষ্কার, ব্যঙ্গকবিতা, গোড়ায় গলদ, চিরকুমার সভা, একটা আষাঢ়ে গল্প, ইচ্ছাপূরণ, ঠাকুরদা, কর্তার ভূতরূপ* হাসিরগল্প এবং *তোতা কাহিনী* **স্যাটায়ার**ধর্মী রূপকগল্প রচনা করেছেন। বিশিষ্ট সাহত্যিক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮) *ঘোষালের হেঁয়ালি, অবনী ভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি, রাম ও শ্যাম* গল্পে **উইটের** প্রাধান্য বর্তমান। ১৮৬৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *The Comedy of Errors* নাটকটি *ভ্রান্তিবিলাস* নামে বাংলায় আখ্যায়িকার আকারে অনুবাদ করেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬) *লালু* গল্পটির মধ্যে হাসির খোরাক বর্তমান। লেখক পরশুরাম (১৮৮০) রচিত *গড্ডালিকা, কজ্জলী, লম্বকর্ণ, ভূশণ্ডীর মাঠে, বিরিঞ্চিবাবা, জাবালি, কচি-সংসদ, চিকিৎস-সংকট, লম্বকর্ণ* প্রভৃতি গল্পের মাধ্যমে সমাজের নানা অসঙ্গতি উদ্ঘাটন করে রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪) রচিত *দ্রব্যময়ীর কাশীবাস, বাদল, দাঁতের আলো, ননীচোরা, বরযাত্রী* ইত্যাদি গল্পগুলি কৌতুকরসে অভিষিক্ত। বনফুলের (১৮৯৯) *তিলোত্তমা* গল্পটি **হিউমারে**র নিদর্শন। এই গল্পে পিতার পছন্দকরা পাত্রী তিলোত্তমার সঙ্গে গোকুলের বিয়ে হলেও শেষে স্বামী সপত্নীকে ঘরে আছে জেনেও তিলোত্তমা আশীর্বাদের সময় শাঁখ বাজায়। তার প্রতি পাঠকের বা সহৃদয়ের অনুভূতি জাগ্রত হয়। সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯) *রমণীর মন* গল্পটি শ্লেষাশ্রয়ী হাস্যরসযুক্ত। এছাড়া *রক্তসন্ধ্যা, জাতিস্মর, চুয়াচন্দন* ইত্যাদি গল্পে কল্পনার বৈচিত্র্যের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। লেখক হেমেন্দ্র প্রসাদের(১৯০১) *আষাঢ়ে গল্প,* সাহিত্যক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের (১৯০২) *হাসি রাশি,* লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪) *ঘনাদা,* সাহিত্যক দক্ষিণারঞ্জনের (১৯০৮) *ঠাকুরমার ঝুলি* বা *বাঙ্গালার গীতকথা,* লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০৯) *ভূত-পেত্নী,* শিশুসাহিত্যিক

উপেন্দ্রকিশোরের (১৯১০) *টুনটুনির গল্প*, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮) *টেনিদা সমগ্র* ইত্যাদি গল্পগুলির মধ্যে সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ন্যায় রূপক ধর্মী চরিত্রের দ্বারা কখনো বা হাস্য উদ্দীপক শব্দ ও বাক্যের দ্বারা সহৃদয়ের সামনে উপস্থাপন করেছেন। লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর *স্বর্গেরচাবি*, সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের *ফাউল কাটলেটের ইতিহাস, ভাংচি* ইত্যাদি গল্পের সরস ও তীক্ষ্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নৈপুণ্য প্রতিফলিত হয়েছে। লেখক পরিমল গোস্বামীর রচিত *একটি রূপকথা* এবং *অভিনন্দন* গল্পে আক্রমনাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশিষ্ট লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী বিরচিত *বাজে খরচ, সর্পশিশু, অভিনেত্রী* ইত্যাদি গল্পে কৌতুকের আবরণ পরিলক্ষিত হয়। ফলে শুধু অপ্রাপ্তরা নয় প্রাপ্তবয়স্ক সকলশ্রেণীর সহৃদয়গণ গল্পগুলির মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে থাকে। এই সমস্ত গল্পগুলি পরবর্তীকালে বঙ্গসাহিত্যে ও শিশু সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছে। ইংরেজি সাহিত্যে অধিকাংশ ব্যঙ্গাত্মক রচনা সৃষ্টি হয়েছিল খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতকে। বিখ্যাত নাট্যকার W. Shakespeare রচিত *The Comedy of Errors* হলো নাটকগুলির অন্যতম। তাঁর **কমেডি** গুলির মধ্যে এটিই সংক্ষিপ্ততম এবং সর্বাধিক হাস্যরসোদ্দীপক। এই নাটকের হাস্যরসের প্রধান উৎস ভাঁড়ামি ও পরিচয়-বিভ্রান্তি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক Voltaire বিরোধিতা *Candide*, ফরাসি সাহিত্যিক H. D. Balzac রচিত *Droll Stories* ব্যঙ্গাত্মক গল্পে প্রধানত সমাজ সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের লেখক O. Henryর *Four Roads to Destiny* গ্রন্থে বাইশটি ব্যঙ্গাত্মক গল্পের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক M. Twain রচিত *The Adventures of Huckleberry Finn* একটি চমৎকার ব্যঙ্গমূলক সৃষ্টি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক A. Murno রচিত *Boys and Girls*, *The Bear came over the Mountain*, পাশ্চাত্ত্য লেখক J. K. Jerome এর *Packing*, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক S. Leacock রচিত *My Financial Career*, *Nonsense*

*Novels* (1911), *Sunshine Sketches of a Small Town* (1912), *Arcadian Adventures With the Idle Rich* (1914), *Moonbeams From the Larger Lunacy* (1915), *Winsome Winnie* (1920), *My Discovery of Engla* (1922) ইত্যাদি ব্যঙ্গাত্মক রচনার নিদর্শন। প্রতীচ্যের ঔপন্যাসিক J. Swift রচিত *A Tale of a Tub*, *Gulliver's Travel* পাশ্চাত্ত্যের J. Addison, A. Marvell, J. Swift, Y. Lina, A. Tennyson, J. Dryden, W. Thackeray, R. Browning প্রভৃতি লেখক হাস্য ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ দিককে ফুটিয়ে তুলেছেন। হাস্যরস সমাজ সংস্কারক রূপেও কর্ম করে থাকে। হাস্যরসাত্মক সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য হলো সমাজ তথা ব্যক্তির মঙ্গলসাধন। সভ্য মানব ক্রমে অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন করতে শিক্ষা করেছে এবং প্রতিরোধের জন্য মানবতা, অনুকম্পা প্রভৃতির ভাব হাস্যরসের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল এ প্রসঙ্গে বলাছেন-

> কবি লেখনী ধারণ করিয়াছেন এই বিকারগ্রস্ত সমাজের মধ্যে চেতনা সঞ্চারের নিমিত্ত।[৩০]

**উল্লেখপঞ্জি**


১. A. A. Macdonell, *A History of Sanskrit literature,* pp-313

২. S. N. Dasgupta & S. K. De, *A History of Sanskrit Literature Classical Period*, vol.1, pp-421

৩. *তদেব*, pp-425

৪. *তদেব*, pp-424

৫. *তদেব*, pp-425

৬. A. A. Macdonell, *A History of Sanskrit literature,* pp-317

৭. *হিতোপদেশ*, *মিত্রলাভ*, শ্লোকসংখ্যা-৯

৮. S. N. Dasgupta & S. K. De, *A History of Sanskrit Literature Classical Period*, vol.1, pp-426

৯. *তদেব*, pp-429

১০. *তদেব*

১১. A. A. Macdonell, *A History of Sanskrit literature,* pp-7

১২. *তদেব*, pp-10

১৩. *পঞ্চতন্ত্র*, কথামুখ, শ্লোকসংখ্যা-২

১৪. *তদেব*, কথামুখ, শ্লোকসংখ্যা-১

১৫. *তদেব*

১৬. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-১/১৫৯

১৭. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-৩/১০৪

১৮. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-৩/৯১

১৯. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-৫/২৯

২০. S. N. Dasgupta & S. K. De, *A History of Sanskrit Literature Classical Period*, vol.1, pp-324

২১. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *শুকসপ্ততি*, পৃষ্ঠা-২৫

২২. *হিতোপদেশ*

২৩. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-৪\১৪০

২৪. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-১\১১৮

২৫. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-২\১১৭

২৬. *ভোজপ্রবন্ধ*, শ্লোকসংখ্যা-২৪১

২৭. *তদেব*

২৮. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-১৩৩

২৯. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-২৬৪

৩০. দিলীপকুমার. কাঞ্জিলাল, *সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস*, পৃষ্ঠা-২২৮

## পঞ্চম অধ্যায়

## নির্বাচিত গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে গল্পসাহিত্য উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। গল্পসাহিত্যের ব্যাপ্তি এবং প্রাচীনতা বিশ্বসাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবকে সমৃদ্ধি করেছে। মানুষ এবং পশু-পাখির চরিত্রকে কেন্দ্র করে মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন রূপকে সহৃদয়ের সামনে তুলে ধরেছেন। জীবজন্তুর মুখোশের অন্তরালে চরিত্র উদঘাটন রূপ পরিকল্পনাটি ব্যঙ্গকৌতুকের পরিচয় দেয়। এছাড়া গল্পসাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন গল্পের মধ্যে ব্যঙ্গ-কৌতুক-বৈদগ্ধ্য-চাতুর্যের মধ্যে দিয়ে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নির্বাচিত গল্পসাহিত্যগুলি হলো- *পঞ্চতন্ত্র*, *বেতালপঞ্চবিংশতি*, *শুকসপ্ততি*, *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা*, *হিতোপদেশ*, *পুরুষপরীক্ষা*, *ভোজপ্রবন্ধ* ইত্যাদি।

### ১:১ *পঞ্চতন্ত্র* গল্পে হাস্যরস

পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা বিরচিত *পঞ্চতন্ত্রের* *মিত্রভেদ*, *মিত্রপ্রাপ্তি*, *কাকোলূকীয়*, *লব্ধপ্রণাশ*, *অপরীক্ষিতকারক* অংশে জীব-জন্তু, পশু-পাখি, এবং চিরপরিচিত মনুষ্য চরিত্রের সাহায্যে গল্পের মধ্যে অভিনব চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছেন। গল্পের আখ্যান ভাগকে শিশুদের বোধগম্য করে তোলার জন্য সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় নীতিশাস্ত্রের প্রয়োগ করে বেশ কয়েকটি গল্পে হাস্যরসের উপস্থাপন করেছেন।

*কাকোলূকীয়* অংশে মেঘবর্মণ নামক কাক ও অরিমর্দন নামক পেঁচার মধ্যে চিরশত্রুতা নিয়ে যে গল্প কবি বিষ্ণুশর্মা রচনা করেছেন তা হাস্যরসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কাক ও পেঁচা এই দুই প্রকার প্রজাতির মধ্যে একে অপরকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তি বর্তমান। পেঁচাদের রাজা কাকেদের দেখতে পেলেই মেরে ফেলতেন। মেঘবর্মণ নামক কাকেদের রাজা তাঁর পাঁচ মন্ত্রীকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করার প্রসঙ্গে অহিংসা ও হিংসার কথা তুলে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে চড়ুই, খরগোশ ও বিড়ালের গল্পে কপিঞ্জল নামক চড়ুই, ও শীঘ্রগ নামক খরগোশের মধ্যে বাসস্থান নিয়ে ঝগড়ার উদ্রেক হয়। সুবিচারের জন্য তারা বিদ্বান ব্যক্তির সন্নিকটে শরণাপন্ন হলেন। যাঁর শরণাপন্ন হলেন তিনি হলেন তীক্ষ্ণদ্রংষ্ট নামক এক ভণ্ড ধর্মতপস্বী বনবিড়াল। চড়ুই ও খরগোশের ঝগড়ার কথা শুনে নদীর তীরে গিয়ে বনবিড়াল ভণ্ড তপস্বীর ভান করে দণ্ডায়মান ছিলেন। এই ভণ্ড তপস্বী তাদেরকে (চড়ুই ও খরগোশকে) অহিংসার শিক্ষা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বাক্য বলেন। যেমন ধর্মের সংক্ষিপ্তসার হলো ধর্মের প্রতি প্রতিকূল আচরণ না করা, নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি। হিংসা হলো নরকের রাস্তা। অহিংসা পরম ধর্ম-

অহিংসৈব ধর্মমার্গঃ।[১]

পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা অহিংসার বার্তা প্রসঙ্গে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন –

হিংসকান্যপি ভূতানি য হিংসতি স নিঘৃর্ণ।

স যাতি নরকং ঘোরং কিং পুনর্যঃ শুভানি চ।।[২]

অর্থাৎ হিংস্র জন্তুকে যিনি হত্যা করেন তিনিও নরকগামী হন, আর যে নিরীহ জীবজন্তু তথা ছারপোকা, উকুন, ডাশমশা ইত্যাদিকে হত্যা করবে তার কি হবে? সমাজে জাতিগত সেই সুযোগে ভণ্ড, অসৎ ব্যক্তির স্বার্থচরিতার্থ করার যে প্রবণতা তা উপরিউক্ত গল্পের মাধ্যমে কবি উপস্থাপন

করেছেন। সমাজের যে চিত্র তার প্রতি কটাক্ষ করে যে বার্তা প্রেরণ করেছেন তাতে **স্যাটায়ার** (Satire) নামক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে এই একই গল্পে যাজ্ঞিকদের যজ্ঞ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন। তিনি তাঁদের প্রতি অঙ্গুলি নিক্ষেপ করেছেন। যে যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞে পশু হত্যা করেন তাঁরা হলেন মূর্খ যাজ্ঞিক। কারণ তাঁরা বেদের অর্থ প্রকৃতপক্ষে জানেন না। 'অজ' কথার অর্থ 'সাত বছরের পুরানো শালিধান' পশু নয়। এই কৌতুকময় হাস্যরসের মাধ্যমে জৈনসম্প্রদায়ের হিংসাত্মক মনোভাব ও অতিশয় মূর্খ যাজ্ঞিকদের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ করে বলেছেন-

বৃক্ষাংশ্ছিত্বা পশূন্ হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দমম্।

যদ্যেব গম্যতে স্বর্গে নরকং কেন গম্যতে।।[৩]

অর্থাৎ গাছ কেটে, পশু মেরে, রক্তের দ্বারা কর্দম রঞ্জিত করলে যদি স্বর্গে গমন হয় তাহলে নরকের গমন কোন রূপ কর্মের দ্বারা সম্ভব। এখানে কবি **স্যাটায়ার**ধর্মী (Satire) হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

*লব্ধপ্রনাশ* অংশে *ব্যাঘ্রচর্মাবৃতগর্দভ* কথাতে হাস্যরস বিদ্যমান। এই গল্পে শুদ্ধপট নামক রজকের অত্যন্ত দুর্বল গাধা ছিল। সেই রজক বনের মধ্যে ব্যাঘ্রচর্ম পেল। সেই ব্যাঘ্রচর্ম দিয়ে দুর্বল গাধাকে আবৃত করে যবের ক্ষেতে ছেড়ে দিত। সেই ব্যাঘ্রচর্ম আবৃত দুর্বল গাধা যব ভক্ষণ করে ক্রমশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। অতঃপর মদগর্বিত গাধা যব ক্ষেতে দূর থেকে স্ত্রী গাধার ডাক শুনে চিৎকার করতে আরম্ভ করল-

স মদোদ্ধতো দূরাদ্রাসভীশব্দং শৃণ্বংস্তারস্বরেণ শব্দায়িতুমারুদ্ধ।[৪]

বাঘের চামড়া আবৃত গাধাটির আসল রূপ বুঝতে পেরে জমির পালকেরা তাকে মেরে ফেলল। এই গল্পে ব্যাঘ্রচর্ম আবৃত বিকৃতবেশ দুর্বল গাধা হলো আলম্বনবিভাব, ব্যাঘ্রচর্ম আবৃত অবস্থায় দুর্বল গাধার শস্যক্ষেত্রে গমন উদ্দীপনবিভাব। দুর্বল গাধাটির শস্য ভক্ষণ করে হৃষ্টপুষ্ট রূপ ধারণ করা ব্যাপার হলো অনুভাব। শস্যক্ষেত্রের বিচরণকারী ব্যাঘ্রচর্মাবৃত গাধা, স্ত্রী গাধার ডাকে সারা দেওয়া রূপ কর্ম হলো ব্যভিচারীভাব। বিষ্ণুশর্মা এখানে বাক্‌বিন্যাস দ্বারা যে অতিরঞ্জিত চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন তার থেকে নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। এই জাতীয় হাস্যরস **ফান** (Fun) শ্রেণীর হাস্যরসের অনুরূপ।

*লব্ধপ্রণাশ* অংশে *পুনর্মূষিকাকথা*তে মূষিককন্যা গল্পের নাম শোনা মাত্র হাসির উদ্রেক ঘটে। নদীতীরে তিনজন মুনি তপস্যারত ছিলেন। তাঁদেরমধ্যে পুত্রহীন একজন মুনি বাজপাখির নিকট থেকে মূষিককন্যার প্রাণ রক্ষা করলেন। তপস্যাবলে মূষিককন্যাকে শিশুকন্যাতে পরিণত করেন ও তার লালন-পালন করতে থাকেন। ক্রমে মূষিককন্যা যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হলে মুনি নিজের কর্তব্য অনুযায়ী উপযুক্ত পাত্রের হাতে মূষিককন্যাকে ভারপ্রাপ্ত করতে চাইলেন। তার জন্য মুনি স্বয়ম্বরসভা সৃষ্টি করলেন। স্বয়ম্বর সভাতে মুনি নিজে সূর্য, মেঘ, বায়ু, পর্বত প্রভৃতি দেবতাদেরকে আহ্বান করলেন এবং তাতে মূষিককন্যার সম্মতি জানতে চাইলেন । মূষিককন্যা এতে অসম্মতি প্রদান করে। শেষে মূষিকরাজাকে দেখে মুনির পালিতকন্যা নিজেকে মূষিকজাতিতে পরিণত করার আবেদন করে বলল-

তাত মাং মূষিকং কৃতাস্মৈ প্রযচ্ছ যেন স্বজাতিবিহিতং গৃহধর্মমনুতিষ্ঠামি।[৫]

অর্থাৎ যাতে সে স্বজাতি বিহিত গৃহ ধর্ম পালন করতে পারে এইজন্য মুনি তাকে মূষিককন্যাতে পরিণত করেন এবং মূষিকরাজের সঙ্গে বিবাহ দেন। এই কথাতে মূষিককন্যা হলো আলম্বনবিভাব,

যৌবন প্রাপ্ত মূষিককন্যার জন্য স্বয়ংবর সভা নির্মাণ ঘটনা হলো উদ্দীপনবিভাব। মূষিককন্যার জন্য স্বয়ম্বর সভা নির্মাণ অলৌকিক ব্যাপার এবং বাস্তব ঘটনার সাথে তা বিকৃতি মনোভাব যুক্ত। মূষিকরাজের সাথে রাজকন্যার বিবাহ হলো অনুভাব। মূষিকরাজকে দেখে মুনির পালিতকন্যা মোহ এবং স্বজাতি ধর্মপালনরূপ স্বপ্ন হলো ব্যভিচারীভাব। কবি বিষ্ণুশর্মা এর মাধ্যমে নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। স্বজাতির প্রতি মোহবশত মুনিরদ্বারা পালিত মূষিককন্যা নিজে দেবীর আসন ত্যাগ করে স্বজাতির দোষে নীচ অর্থাৎ মূষিকজাতির সংসর্গ প্রাপ্ত হয়েছে। এখানে স্বজাতির প্রতি অত্যধিক মোহবশত নারীব্যক্তির সংসর্গ প্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে নারীজাতির প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তা **স্যাটায়ারের** (Satire) অনুরূপ।

বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, 'অতি চালাকের গলায় দড়ি'। *অপরিক্ষীতকারক*অংশে *শতবুদ্ধিসহস্রবুদ্ধিএকবুদ্ধিকথাতে* হাস্যরসের পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। শতবুদ্ধি ও সহস্রবুদ্ধি নামক মাছ এবং একবুদ্ধি নামক একটি মন্ডূক একসঙ্গে জলাশয়ে বসবাস করত। ধীবর জলাশয়ে মাছ ধরবে বলে ঠিক করলে সকলে ভীত হলেও সহস্রবুদ্ধি সকলকে বুদ্ধি বলে বাঁচানোর কথা প্রকাশ করল। সেইসঙ্গে শতবুদ্ধি ও সহস্রবুদ্ধিকে নানা ফন্দির কথা বলতে থাকে। নিজ স্থানের প্রতি অর্থাৎ পিতৃভূমির প্রতি যে টান তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় সহস্রবুদ্ধির বার্তার মধ্যে। এ প্রসঙ্গে সহস্রবুদ্ধির উপদেশ হলো-

না তত্ স্বর্গেঽপি সৌখ্যং স্যাদ্ দিব্যস্পর্শনশোভনে।

কুস্থানেঽপি ভবেত্ পুংসাং জন্মনো যত্র সম্ভবঃ।।[৬]

অর্থাৎ স্বদেশভূমি যতই কু-স্থান হোক না কেন তাকে ছেড়ে কেউ চলে যাওয়া যায় না। একবুদ্ধি সহস্রবুদ্ধির কথা না শুনে অন্য জলাশয়ে চলে যায়। ইতিমধ্যে ধীবরের জালে সহস্রবুদ্ধি ও শতবুদ্ধি

ধরা পড়ে। কবি এখানে বলতে চেয়েছেন যে যখন যেরকম পরিস্থিতি হবে তাকে সেই ভাবে উপস্থিত বুদ্ধির মাধ্যমে সেই পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে হবে। কবি বিষ্ণুশর্মা তৎকালীন সমাজের অন্ধ স্বদেশ অনুরাগকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। দেশপ্রেম নামক সঙ্কীর্ণতা তথা অলসতাকে কঠোরভাবে আঘাত করেছেন। সেই সঙ্গে কূপমণ্ডূকতারূপ মানসিকতাকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই একই রকম কূপমণ্ডূকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় *মিত্রভেদ* অংশের *অনাগতবিধাতাপ্রত্যুত্পন্নমতিযত্ভবিষ্য* কথাতে।

## ১:২ *বেতালপঞ্চবিংশতি* গল্পে হাস্যরস

*বেতালপঞ্চবিংশতি*তে রাজাবিক্রম সেনকে শবদেহে অধিষ্ঠিত বেতাল একটি করে গল্প বলতে থাকে। চিত্তাকর্ষক, বৈচিত্র্যময়, কল্পনার রঙে রঙিন, অভিনব এবং অন্যান্য গল্প থেকে স্বতন্ত্র বেতাল বর্ণিত প্রত্যেকটি গল্পে কবি অদ্ভুত কৌশল প্রয়োগ করে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় উপস্থাপিত করেছেন। পঁচিশটি গল্পের মধ্যে বেশকিছু গল্পে হাস্যরসের নিদর্শন উপস্থাপিত হয়েছে। সেই গল্পগুলিকে ক্রমানুযায়ী বর্ণনা করা হলো।

অষ্টমকথাতে বর্ণিত শোভাবতী নগরে বসবাসকারী শুদ্ধপটের দুহিতা মদনসুন্দরী গৌরী দেবীর আরাধনা করতেন। ধবল নামক রাজকুমার মদনসুন্দরীকে দেখে কামপীড়িতবশত বিবাহ করতে ইচ্ছুক হলেন। শুদ্ধপট জানালেন গৌরী দেবী যাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন, সেই ব্যক্তি তাঁর পুত্রীর পতি হবেন। শোভাবতী নগরের রাজকুমার দেবীকে প্রসন্ন করার নিমিত্ত নিজের শিরশ্ছেদ করবেন মনস্থির করলেন। গৌরীদেবী তাতে প্রসন্ন হলেন। মদনসুন্দরীর সাথে ধবল রাজপুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হলো। এরূপ বিধি সম্পন্ন হলে ধর্মবান ধবল গৌরীমণ্ডপে গিয়ে দেবীর খরগের

দ্বারা শিরশ্ছেদ করলেন। শুদ্ধপটের পুত্র শ্বেতপট ভগিনীপতির এরূপ অবস্থা দেখে নিজেও শিরশ্ছেদ করলেন। তখন মদনসুন্দরী ভ্রাতা ও পতির শিরশ্ছেদ দেখে দেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন। দেবী প্রসন্ন চিত্তে তাঁদের স্কন্ধে মস্তক স্থাপনের আদেশ দিলেন। ভ্রমবশত মদন সুন্দরী ভ্রাতার স্কন্ধে পতির শির এবং পতির স্কন্ধে ভ্রাতার শির স্থাপন করলেন-

ততস্তয়া সংভ্রমেণ পতিস্কন্ধে ভ্রাতুঃ শিরো ভ্রাতুঃ স্কন্ধে পতিশিরো নিযুজ্য

দেবীবরপ্রসাদেন জীবয়িতৌ। [৭]

উপরি উক্ত গল্পে ধবল ও শ্বেতপট হলো আলম্বনবিভাব, গৌরী দেবী প্রসন্নতার ফলে ভ্রমবশত পতির স্কন্ধে ভ্রাতার শির এবং ভ্রাতার স্কন্ধে পতির শির স্থাপন বিষয়ক ব্যাপার হলো উদ্দীপনবিভাব। বিকলাঙ্গ দর্শন হেতু এখানে বিভাব সৃষ্টি হয়েছে। মদনসুন্দরীর ব্যাকুলিভূত অবস্থা হলো অনুভাব। শারীরিক অসঙ্গতি ও তদ্রূপ কারণেই বিপর্যয় হেতু এখানে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। শারীরিক অসঙ্গতি হেতু যে ব্যঙ্গরসের সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্ত্যের এই বিষয় **ফান** (Fun) শ্রেণীর হাস্যরসের অনুরূপ।

ত্রয়োদশকথাতে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর দেশের রাজা নয়পাল এবং রানী পদ্মাবতীর রূপ ও যৌবন সম্পন্না শশিপ্রভা নামক কন্যা ছিল। ভট্টরকের পুত্র মনঃস্বামী শশিপ্রভাকে দেখে কামাসক্ত হয়েছিলেন। শশিপ্রভার তাঁর প্রতি কামাসক্ত হন। শশিপ্রভাকে পাওয়ার নিমিত্ত মনঃস্বামী শশিদেব মূলদেবের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তদন্তর মূলদেব মনঃস্বামীকে একটি বিদ্যা প্রদান করেন। যে বিদ্যার দ্বারা তিনি পুরুষ ও স্ত্রী রূপ ধারণ করতে পারবেন-

ভট্টপুত্র, তুম্যমহমেকাং বিদ্যাং দদামি যয়া স্ত্রীরূপং পুরুষরূপং চ ধার্যতে।[৮]

বিদ্যার প্রভাবে স্ত্রীরূপী মনঃস্বামী রাজা নয়পালের রাজ্যে উপস্থিত হলেন। শশিপ্রভার নিকটে উপস্থিত হলেন । শশিপ্রভার প্রিয়সখি হিসাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। এমতো অবস্থায় শশিপ্রভার প্রিয়সখি (মনঃস্বামীকে) দেখে মন্ত্রীপুত্র বিজয় সেনের হৃদয়ে কামের উদ্রেক হয়-

তত্র মনঃস্বামিনং কুমারীবেষধরমবলোক্য বিজয়সেনঃ কামপীড়িতোঽভবত্।[৯]

তাঁকে বিবাহের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। শশিপ্রভাকে দুঃখিত দেখে মনঃস্বামী মূলদেবের প্রদত্ত বিদ্যার দ্বারা নিজের রূপ ধারণ করেন এবং শশিপ্রভাকে বিবাহ করেন। এই গল্পে মনঃস্বামী হলো আলম্বনবিভাব। অর্থাৎ মূল দেবের বিদ্যার প্রভাবে ভট্ট পুত্রের স্ত্রী ও পুরুষ রূপ ধারণ বিষয়ক ব্যাপার হলো আলম্বনবিভাব। কুমারী বেশধারী মনঃস্বামীকে বিজয় সেনের কামপীড়নের উদ্ভব হলো অনুভাব। কুমার বেশধারী মনঃস্বামীকে দর্শন হেতু শশিপ্রভার আনন্দ ও বিস্মিত বিষয়ক ব্যাপার হলো ব্যভিচারীভাব। অতিরঞ্জিত চরিত্রের মাধ্যমে এখানে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। শারীরিক বিপর্যয় হেতু এখানে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে **ফান** (Fun) শ্রেণীর হাস্যরসের অনুরূপ।

ঊনবিংশতিকথাতেও হাস্যরস উল্লেখনীয়। এই কথার সংক্ষিপ্তসার হলো নিম্নরূপ- ব্রহ্মপুর নামক নগরে দরিদ্র বিষ্ণুস্বামী ব্রাহ্মণের চার পুত্র বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুস্বামী পরলোকে গমন করলেন। অতঃপর চার ব্রাহ্মণপুত্র মাতুলালয়ে গমন করলেন। দারিদ্যক্লিষ্ট মাতুলালয় থেকে তাঁরা সেখান থেকে প্রতারিত হলেন। অভাবের তাড়নায় চার ব্রাহ্মণপুত্র মৃত্যুর পথ অবলম্বন করতে উদ্যত হলেন। এমত অবস্থায় এক সজ্জন ব্যক্তির নিকটে বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে সর্বসুখ অনুভব করলেন। প্রথমপুত্র মৃতাস্থিতয়েনবিদ্যা (মৃত ব্যক্তির অস্থি সমাবেশর বিদ্যা), দ্বিতীয়পুত্র মাংসশোণিবসংচারবিদ্যা (মাংস এবং রক্ত সমাবেশর বিদ্যা), তৃতীয়পুত্র

নখকেশরসংচারবিদ্যা (নখ ও চুল সমাবেশর বিদ্যা), চতুর্থ পুত্র জীবনদান বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চার ব্রাহ্মণপুত্র সকলে মিলে তাঁদের অধিগত বিদ্যার দ্বারা একটি ব্যাঘ্রকে জীবিত করলেন। শেষে ব্রাহ্মণপুত্রের অধিগত বিদ্যার প্রভাবে জীবিত ব্যাঘ্রের দ্বারা চার ব্রাহ্মণপুত্র ভক্ষিত হলেন। কবি শিবস্বামী অসৎ প্রলাপ হেতু যে অস্বাভাবিক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তা হলো **ফান** জাতীয় হাস্যরসের অনুরূপ। ব্যাঘ্র হলো আলম্বনবিভাব, বিদ্যার দ্বারা জীবন দানরূপ ঘটনা হলো উদ্দীপনবিভাব। চারব্রাহ্মণ পুত্রের বিদ্যার দ্বারা জীবিত ব্যাঘ্রের ব্রাহ্মণ পুত্রদের ভক্ষণ রূপ ঘটনা অনুভাব। উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত চরিত্রের মাধ্যমে এখানে যে হাস্য-কৌতুকের সৃষ্টি করা হয়েছে তা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের **ফানে**র (Fun) অনুরূপ।

### ১:৩ *বিক্রমাঙ্কচরিত বা সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* গল্পে হাস্যরস

*বিক্রমাঙ্কচরিত বা সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকাতে* বর্ণিত আখ্যানগুলি বেশ কৌতূহল উদ্দীপক এবং চমকপ্রদ। প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই গল্প বলার এবং শোনার এক অভিনব কৌশল বিদ্যমান। কৌতূহল উদ্দীপক এবং চমকপ্রদ প্রভৃতি গুণের সমন্বয়ে হাস্যরস পরিবেশনের উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়েছে নিম্নলিখিত গল্পটিতে।

রাজাবিক্রমাদিত্য রাজধানীতে ফিরে নিজের যাবতীয় কর্ম সমাপ্ত করে বিশ্রাম করতে গেলেন। বিশ্রাম কালীন অবস্থায় রাজা বিক্রমাদিত্য বৃষের পিঠে চরেছেন এরূপ স্বপ্ন দেখলেন। তিনি এই স্বপ্ন দেখে ভীত হলেন এবং কুলোপুরহিতদেরকে তাঁর স্বপ্নের কথা জানালেন। কুলোপুরোহিতরা রাজাবিক্রমাদিত্যকে জানালেন স্বপ্ন দুই প্রকার এক শুভ স্বপ্ন অন্যটি অশুভ স্বপ্ন। হাতির পিঠে চড়া, ক্রন্দন, শাঁখ, মৃত্যু, বামন, সোনা, নদী ইত্যাদি স্বপ্নে দেখলে তা সৌভাগ্যের

কারণ হয় এবং এগুলি শুভ স্বপ্ন। অন্যদিকে গাধা, মহিষ, শুকর, বাঁদর, কাঁটা গাছ, ভস্ম ইত্যাদি স্বপ্নে দর্শন করলে তা অশুভ সঙ্কেত। রাজাবিক্রমাদিত্য স্বপ্নে মহিষকে দর্শন করেছেন এবং কুলোপুরোহিতদের মতানুযায়ী তা রাজার পক্ষে অশুভ সঙ্কেতের সূচক। রাজাবিক্রমাদিত্য কুলোপুরোহিতদের কাছ থেকে স্বপ্নের প্রতিবিধান জানতে চাইলেন। প্রত্যুত্তরে তাঁরা জানালেন, পূজা এবং তার সাথে পুরোহিতদের নতুন বস্ত্র, অলঙ্কার, গাভী, ধান সহ দশরকম দ্রব্য প্রদান, অসহায়, অনাথ, বৃদ্ধ, দীন ও দুখী ব্যক্তিদের উপহার প্রদানের মাধ্যমে স্বপ্নের অশুভ দোষের প্রতিকার সম্ভব। কুলোপুরোহিতদের কথামত রাজা বিক্রমাদিত্য অনুরূপ কর্ম সম্পাদন করলেন। আপাতদৃষ্টিতে কবি রাজাবিক্রমাদিত্যের দানশীলতা ও মহানুভবতার কথা গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শুধু তিনি রাজা গুণের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেনি। তার সাথে তিনি তৎকালীন সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিকটিকে এবং লোভাতুর কুলোপুরোহিত চরিত্রকে উদ্ঘাটন করে তির্যক দৃষ্টি জ্ঞাপন করেছেন। কুসংস্কারচ্ছন্ন রাজার দুর্বলতার সুযোগে কুলোপুরোহিতের নিজের স্বার্থ চরিতার্থকে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপহাস করে **স্যাটায়ার**রূপ (Satire) হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

### ১:৪ *শুকসপ্ততি* গল্পে হাস্যরস

কবি বিদ্যাপতি রচিত *শুকসপ্ততি* গল্পে *পঞ্চতন্ত্র* ও *হিতোপদেশের* ন্যায় নীতিশাস্ত্রের উপদেশ বর্তমান থাকলেও বিবিধ গল্পের মধ্যে জন-মনোরঞ্জনের ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সচল এবং সজীব সমাজের বিভিন্ন দিকের কথা কবি বা সাহিত্যিকগণ ভণিতি বৈচিত্র্যের মাধ্যমে জনসমক্ষে উন্মোচিত করেছেন। বেশ কয়েকটি গল্পে চতুরতা এবং হাস্যরসাত্মক পরিণতি সহৃদয়

পাঠকগণের চিত্তে অলৌকিক আনন্দের সৃষ্টি করে। সেই সমস্ত গল্পগুলি প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমকথাতে হাস্যরসের উপস্থিতি উল্লেখনীয়। চন্দ্রাবতী শহরের রাজা ভীম সেনের রাজত্বকালে এক বণিকের পুত্র সুজন বসবাস করতেন। অতিশয় রূপ থাকার জন্য তাকে মোহন বলা হত। সুধন ওই শহরের বাসিন্দা হরি দত্তের রূপ যৌবন সম্পূর্ণা স্ত্রীর লক্ষ্মীর প্রতি আসক্ত ছিল। লক্ষ্মীর স্বামী শহরের বাইরে গেলে নিজের মনোবাসনা পূরণের জন্য লক্ষ্মীকে রাজি করানোর নিমিত্ত অর্থের বিনিময়ে পূর্ণা নামে কুটনি মাসির দ্বারা লক্ষ্মীকে রাজি করানো হয়। লক্ষ্মী পূর্ণা মাসির কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সেগুলি সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে এমনটাই অঙ্গীকার করেছিল। এই অঙ্গীকার করেছিল যে ভদ্রলোকের অঙ্গীকার এমন হওয়াই উচিত, যে তাঁর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করবে। সুজন ভদ্রলোকেরা অঙ্গীকার রক্ষা করে থাকেন বলেই তো মহাদেব তাঁর কণ্ঠে বিষ, কূর্মরূপী বিষ্ণু, পৃথিবী, সমুদ্র দুঃসহ বাড়বাগ্নির দহন এখনো সহ্য করে চলেছেন-

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং, কূর্মো বিভ্রান্তি ধরণীং খলু চাত্মপৃষ্ঠে।

অম্ভোনির্ধিবহতি দুঃসহবাড়বাগ্নিমঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি।।[১০]

পূর্ণা (কুটনি মাসি) লক্ষ্মীকে পর পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যথাযথ স্থানে নিয়ে এল। সুধন কাজের কারণে যথা নির্ধারিত স্থানে হাজির হতে পারেননি। লক্ষ্মীর উদ্যোত কাম তাড়নার নিরসনের জন্য পূর্ণা (কুটনি মাসি) লক্ষ্মীর স্বামীকে(হরিদত্তকে) ভ্রমবশত রমণার্থী রূপে উপস্থিত করে। এই গল্পে রূপযৌবনসম্পূর্ণা হরি দত্তের স্ত্রী লক্ষ্মী হলো আলম্বনবিভাব । কুহক বা অসৎ প্রলাপের দ্বারা লক্ষ্মীকে সুধনের (শেঠের পুত্র) সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উপযুক্ত স্থান হলো উদ্দীপনবিভাব। উপযুক্ত সময়ে সুধনের যথাযথ স্থানে অনুপস্থিতির কারণে লক্ষ্মীর কামের জন্য

ঔৎসুক্য অবস্থা হলো অনুভাব। লক্ষ্মীর কামতাড়নার নিমিত্ত পূর্ণা মোহবশত লক্ষ্মীর স্বামীকে রমণার্থী হিসেবে উপস্থিত করা রূপ ব্যাপার হলো ব্যভিচারীভাব। কবি উপরি উক্ত গল্পের মাধ্যমে তথাকথিত সমাজে নারীদের তাড়নাপীড়িত নগ্নচিত্র তিনি ব্যঙ্গের মাধ্যমে উন্মোচন করেছেন। এই রূপ পরিস্থিতির নারীরাই নয় পুরুষেরাও সমানভাবে দায়ী। ব্যঙ্গের মাধ্যমে কবি নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের কেউ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপহাস করে **স্যাটায়ার**ধর্মী (Satire) হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

অতঃপর তৃতীয়কথাতে কবি বিশৃঙ্খল ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ সামাজিক চিত্রকে সহৃদয়ের সামনে উন্মোচিত করে কৌতুকময় নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। রাজাসুদর্শনের বিশাল নগরে বিমল নামক বণিক দুই পত্নী সহযোগে বসবাস করতেন। বিমল বণিকের দুটি পত্নী রূপবতী ও সৌভাগ্যবতী। একবার রূপবতী ও সৌভাগ্যবতী বণিকের দুই পত্নীকে এক ধূর্ত কুটিল আত্মসাৎ করতে উদ্যত হলেন। বণিক বিমলের অনুপস্থিতিতে ধূর্ত কুটিল দেবী অম্বিকার আরাধনার দ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করে বিমল বণিকের অবিকল আকৃতি রূপ বর লাভ করলেন। বিমল বণিকের অবিকল আকৃতি রূপধারী ধূর্ত কুটিল বিমল বণিকের গৃহে প্রভুত্ব আরম্ভ করলেন। সেইসঙ্গে বিমলের রূপবতী ও সৌভাগ্যবতী পত্নীদুটিকে ভোগ করতে লাগলেন। আসল বণিক বিমল গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে ধূর্ত কুটিলের প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পেরে রাধা সুদর্শনের সাহায্যে তাঁর (ধূর্ত কুটিলের) কীর্তিকলাপ জনসমক্ষে প্রকাশ করলেন। এই গল্পে বিশালা নগরে বণিক বিমলের দুটি পত্নী হলো আলম্বনবিভাব। পত্নী দুটির রূপ যৌবন হলো উদ্দীপনবিভাব। বিমল বণিকের রূপবতী পত্নীদুটিকে সম্ভোগ করার জন্য অম্বিকা দেবীর আরাধনা দ্বারা ধূর্ত কুটিলের নিজের রূপ পরিবর্তন করে যথাসাধ্য ভোগ সম্পন্নরূপ ব্যাপার হলো অনুভাব। আসল বণিক বিমলের অনুপস্থিতিতে ধূর্ত কুটিলের কার্যের চপলতা নিদর্শন যেমন- ঝি চাকরদের টাকা-পয়সার দ্বারা বশীকরণ, এবং আসল

সত্য ঢাকা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন অসূয়া বাক্যের উপস্থাপন হলো ব্যভিচারীভাব। কবি ধূর্তকুটিলের চরিত্র কল্পনার দ্বারা বিশৃঙ্খল ও অরাজকতার সৃষ্টি করে যে কৌতুকময় নির্মল হাস্যরসের প্রতিস্থাপন করেছেন তা **ফান** (Fun) জাতীয় হাস্যরসের অনুরূপ।

চতুর্থকথাতেও কিন্তু হাস্যরসের উপস্থিতি লক্ষণীয়। সোমপ্রভ নামে বামন পাড়ার এক বিদ্বান এবং ধার্মিক ব্যক্তি বসবাস করতেন। যাঁর নাম ছিল সোম শর্মা। সোম শর্মার একমাত্র কন্যা মোহিনী। সে ছিল যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী। তাকে সকলে বিষকন্যা বলে চিনত। সোম শর্মার একমাত্র কন্যার বিয়ে দিলেন গোবিন্দ নামে এক বামন ব্যক্তির সঙ্গে। তিনি ছিলেন জড় বুদ্ধিসম্পন্ন এবং নির্ধন। মূর্খ ও নির্ধন গোবিন্দকে পতিরূপে পেয়ে সোম শর্মার কন্যা দুঃখ অনুভব করত। এমত অবস্থায় গোবিন্দপত্নী মোহিনী পিতৃগৃহে যাত্রাকালে আগন্তুক বিষ্ণু নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। গোবিন্দ পত্নী ও বিষ্ণুর নামক ব্রাহ্মণ পরের পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়। অতঃপর তথাকথিত রূপবতী, গুণবতী বিষকন্যাকে কেন্দ্র করে (মোহিনী) মূর্খ গোবিন্দ এবং আগন্তুক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর মধ্যে প্রহষর্ণের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত গ্রামপতির উপস্থিতিতে সবকিছু রক্ষা পায়। কবি বর্ণিত এই গল্পে সোম শর্মার কন্যা মোহিনী তথাকথিত বিষকন্যা এখানে আলম্বনবিভাব। মোহিনীর রূপ ও গুণ হলো উদ্দীপনবিভাব। মোহিনীর প্রতি আগন্তুক বিষ্ণু ব্রাহ্মণের সম্ভোগে আসক্তি হলো অনুভাব। মোহিনী অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি স্নেহবশত গোবিন্দের বিভিন্ন কথোপকথন, আগন্তুক বিষ্ণু মোহিনীর রূপের প্রতি আসক্তিবশত পরস্ত্রীকে গ্রহণ করার নিমিত্ত উন্মাদনা অর্থাৎ মোহ হলো ব্যভিচারীভাব। মোহিনী, গোবিন্দ, বিষ্ণু চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বাক্‌বিন্যাস বা বাক্‌চতুরালির দ্বারা যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে তা হলো **পুন** (Pun) জাতীয় হাস্যরস।

পঞ্চমতম গল্পে কবি উজ্জয়িনীর কুলোপুরোহিতের কন্যা বালপণ্ডিতা নামক নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন রাজার রাজনৈতিক দলের প্রকৃতরূপকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। এর

মধ্যে কবির তীব্রকটাক্ষ যুক্ত হাহ্যরসাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। উজ্জয়িনীর রাজাবিক্রমাদিত্য ও তাঁর পত্নী কামলীলা। রাজাবিক্রমাদিত্য স্ত্রী কামলীলার সাথে আহারে বসলে দাসীরা রানীর খাবার পাতে ভাজা মাছ রাখলে রানী আঁতকে উঠে বললেন-

স্বামিন্! নাহমেতান্ পুরুষানবলোকয়িতুমপি সমর্থা কিং পুনঃ স্পর্শনম্।[১১]

অর্থাৎ মাছ গুলি পুরুষ মাছ, তিনি রাজা ব্যতীত অন্য পর-পুরুষকে দেখতেও চান না, এমনকি স্পর্শ করতে চান না। রাণীর কথা শুনে খাবারের পাত্রে থাকা ভাজা মাছ হেসে উঠলে রাজাবিক্রমাদিত্য মন্ত্রী, কুলোপুরহিত, জ্যোতির্বিদ, পক্ষীবিদ, পশুবিদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নিকট থেকে মাছেদের হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করে তার সঠিক উত্তর জানতে চাইলেন। রাজা এও জানালেন যে মাছেদের হাসির সঠিক কারণ যদি পাঁচ দিনের মধ্যে ঐ সকল পণ্ডিতগণ দিতে না পারেন তাহলে তাঁদেরকে রাজার রাজ্য থেকে নির্বাসন হতে হবে। উজ্জয়িনীর রাজাবিক্রমাদিত্যের কুলোপুরোহিতের বিষন্নগ্রস্থ ও চিন্তান্বিত অবস্থায় দেখে তাঁর বালপণ্ডিতা নামক পুত্রী পিতাকে শান্ত করার নিমিত্ত নীতি বাক্য উচ্চারণ করে কঠোর বাস্তবকে বুঝিয়ে দিল। এ বিষয়ে বালপণ্ডিতা তার পিতাকে বলেছিল যে রাজাদের তুষ্ট করার কিছু সুবিধাও বর্তমান আছে কারণ রাজা যদি তুষ্ট হন, তবে অপ্রধান নগণ্য ব্যক্তি ও প্রধান পুরুষ হয়ে উঠতে পারেন রাজসভায়। আর রাজাও অসন্তুষ্ট হলে প্রধান পুরুষ হয়ে ওঠে গৌণ। রাজপুরুষের চিরন্তন স্বভাব বর্ণনা করে বালপণ্ডিতা তাঁকে আরও বলেছিল যে-

আসন্নমেব নৃপতিভর্জতে মনুষ্যং বিদ্যাবিহীনমকুলীনমসংস্তুতং বা ।

প্রায়েণ ভূমিপতয়ঃ প্রমদা লতাশ্চ যঃ পার্শ্বতো ভবতি তং পরিবেষ্টয়তি।।[১২]

অর্থাৎ রাজাদের স্বভাব হলো কাছে থাকা সন্নিহিত ব্যক্তিকে আঁকড়ে ধরা, সে বিদ্যাহীন হোক, মন্দবংশের মানুষ হোক, অথবা যাকে কেউ মর্যাদা দেয় না সেই হোক, পাশে যে আছে তাকেই রাজা আঁকড়ে ধরেন। এ ব্যাপারে রাজারা হলেন রমণীর মতো, লতার মতো যাকে পাশে পান তাকেই আঁকড়ে ধরেন। এই ভাবে সে পিতাকে শান্ত করে, প্রকৃত কারণ জেনে তার বুদ্ধি প্রতিভার বলে উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা ভাজা মাছদের হাসির কারণ রাজাকে ব্যক্ত করল। এইভাবে সে তার পিতাকে তথা কুলোপুরোহিতকে রাজ্য থেকে নির্বাসনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। কবি বালপণ্ডিতা নামক চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের রাজনৈতিকভাব প্রখরতার দিনে রাজনৈতিক দলগুলির স্বপ্রয়োজনে ছত্রচ্ছায়া প্রদান এবং তাদের কাছে নতমস্তক, বিদ্বান-বুদ্ধিজীবীদের মস্তক বিক্রয়ের যে ভণিতা করেছেন তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। রাজপুরুষ তুষ্ট হলে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের লাভ বেশী। সেকালের দিনে গণতন্ত্র ছিল না, কিন্তু গণতন্ত্রের মন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে রাজতন্ত্রী রাজাদের স্বভাবের কোনো পার্থক্য নেই বলে রাজার ব্যবহার এবং তৎসম্বন্ধে মানুষের উন্নতি দুটোই আজ-কালকার দিনে গণতন্ত্রের মতোই প্রাসঙ্গিক। বিদ্বান ব্যক্তিদের মাথার উপর ছত্রচ্ছায়ারূপ রাজনৈতিক দলের কাছে বিদ্যার মর্যাদা অতি নগণ্য। বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কর্ম জ্ঞানহীনতা ও মেরুদণ্ডহীন, মূর্খ, বিচারক্ষমতাহীন রাজনৈতিক দলের আসল রূপকে তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ করে **স্যাটায়ার**রূপ (Satire) হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

অন্যদিকে ষষ্ঠগল্পে হাস্যরসের উপস্থিতি উল্লেখনীয়। জয়ন্তী নগরীতে সুমতি নামে এক বণিকের ছেলে এবং তাঁর পত্নী পদ্মিনী বসবাস করতেন। সুমতি বণিকের পুণ্যফল শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়লে নগরবাসী লোকজনেরা তাঁর কাছ থেকে সর্বদা দূরে থাকতেন। সত্যি কথা বলতে এই জগতে যার টাকা পয়সা আছে তাঁর বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজন ও বর্তমান থাকে, টাকা পয়সা থাকলে অনেক পর মানুষও আপন হয়ে যায়। অর্থ থাকলে

লোকজনেরা সেই পুরুষকে যথার্থ পুরুষ বলে মনে করেন, এমনকি পণ্ডিত বলেও সেই ব্যক্তিকে গণ্য করে থাকেন। *মহাভারতে* পাঁচ প্রকার ব্যক্তিগণকে মৃত বলে মনে করা হয়েছে। সেগুলি হলো এক দরিদ্র মানুষকে, দ্বিতীয় রোগব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে, তৃতীয়ত মূর্খ ব্যক্তিকে চতুর্থত স্বদেশ ত্যাগ করে যে ব্যক্তি বিদেশে বসবাস করেন সেই ব্যক্তিকে, পঞ্চমত যে ব্যক্তি সারা জীবন পরের সেবা করে চলেন। অর্থ না থাকার কারণে সুমতি নামক ব্রাহ্মণ বণিকের আত্মীয়-স্বজনরা দুর্ব্যবহার করলে বন থেকে ঘাস, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে নগরে বিক্রি করে দিনযাপন করতে শুরু করলেন। এইভাবে চলতে থাকলে সুমতি বনের মধ্যে একটি মজবুত কাঠের তৈরি গণেশের মূর্তি পেলেন। বিঘ্ন বিনাশক গণেশ অর্থাৎ গণেশ তিনি সমস্ত প্রকার বিঘ্নের নাশক। বণিক ভাবলেন যে গণেশের মূর্তি দিয়ে তাঁর কি বা হবে? যদি এই মূর্তিটিকে কাঠ হিসাবে বিক্রি করতে পারেন তাহলে তাঁর টাকা রোজগার হবে এবং তা দিয়ে তাঁর ক্ষুধা নিবারণ করবেন। এই গল্পের পটভূমিকায় দারিদ্র এক অতি বাস্তবচিত্র। এই সমাজের মানুষ ধর্মীয় বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেকে বেঁধে রাখে। সে কারণেই মনের মধ্যে ধর্মীয় দার্শনিকতা জাগিয়ে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে যে মানুষকে পুণ্য ক্ষয়ের ফলে দারিদ্র ভোগ করতে হয়-

পুণ্যক্ষয়াত্ ধনং ক্ষীণম্।[১৩]

দরিদ্র হওয়ার ফলে সুমতি নামক ঐ বণিকের সাথে নগরের লোকজন তাঁর সঙ্গ দেননা। টাকা থাকলে সেই ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন টিকে থাকে এমনকি টাকার বলেই মানুষ বল বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে বলবান এবং পণ্ডিত বলে ভাবতে শুরু করে। এই কঠিন বাস্তবকে সুমতি বণিকের হৃদয়ে চরমপীড়া দেয়। আর সেই কারণেই বনের মধ্যে কাঠের নির্মিত গণেশের মূর্তি পেয়ে দারিদ্রতার কারণে তাঁকে বেচে দেবে এই কথা ভাবতেও পিছপা হননি। আসলে দারিদ্রতার কারণে নিজের ক্ষুধা নিবারণের জন্য এই রূপ বিধিসম্মত পাপ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

কারণ ভদ্র সজ্জনেরা যেসব নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান মেনে চলেন ক্ষুধার্থ ব্যক্তির পক্ষে তা মেনে চলা কখনোই সম্ভব নয়। এই সহজ সত্যটিকে কবি উপযুক্ত গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করে নির্মল ব্যঙ্গ রচনা সৃষ্টি করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে **হিউমার** (Humour) শ্রেণীর হাস্যরসের অনুরূপ।

অতঃপর একাদশকথাতেও হাস্যরসের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়েছে। গ্রাম প্রধান ত্রিলোচনের স্ত্রী রম্ভিকা পুকুরের ঘাটে জল আনতে গিয়ে একটি নিরীহ যুবককে চোখের ইঙ্গিতে কাছে আসতে বললেন । এরপর রম্ভিকা যুবকটিকে অনুসরণ করতে বলে তাকে একেবারে স্বামীর কাছে (ত্রিলোচন) নিয়ে এলেন। স্বামীর কাছে রম্ভিকা যুবকটিকে তাঁর মাসির ছেলে বলে পরিচয় দিলেন। স্বামী ত্রিলোচন স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করে মাসির ছেলের যথোচিত আদর যত্ন করতে বলে রাত্রিবেলায় শুতে গেলেন। রম্ভিকা যুবকটির কাছে এবার নিজে স্বার্থ চরিতার্থের জন্য কু-প্রস্তাব করতেই যুবক পুরুষ নিজের মুখে বলা মাতৃ পরিচয়ের মর্যাদা খ্যাপন করে একটি নীতিশাস্ত্র শ্লোক বললেন। সেই শ্লোকের অর্থ হলো এইরূপ - মাথায় বাজ পড়ুক, কারাগারে বন্ধন জুটুক অথবা সম্পত্তি চলে যাক, ভদ্রলোক নিজের প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখেন। নিজের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যাকে রম্ভিকা ঘরে এনেছেন তাঁর মুখে এসব নীতিকথা শুনে রাগ হলো। নীতি কথার উত্তরে সেও নীতিবাক্য উদ্ধার করে রোম্ভিকা নিজেকে সমর্থন করার জন্য শেষ পর্যন্ত হরি-হর-ব্রহ্মার কামরস স্খলনের কথাও উল্লেখ করলেন। উপরি উক্ত গল্পের মাধ্যমে যে নীতিবাক্যের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে যে কৌতুক রসের সৃষ্টি করেছেন তা সত্যিই অনবদ্য। পুরাণ-ইতিহাসে পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ এবং মহাদেবের যেসব স্খলনের কথা উল্লিখিত হয়েছে তার বহু দার্শনিক ব্যাখ্যা ও বর্তমান। তাঁদের সম্বন্ধে এমনও কথা বলা হয়েছে যে মহান এবং অতিতেজস্বী ব্যক্তিদের স্খলন তাঁদের সাময়িক ধৈর্যচ্যুতি ঘটালেও সামগ্রিক অবনমন ঘটায় না। কিন্তু সেই দৃষ্টান্তে অল্প সত্ত্ব ব্যক্তি প্রভাবিত হলে তাদের সর্বনাশ ঘটে যেমনটা ঘটেছে নিরীহ যুবককের

ক্ষেত্রে। লেখক অতি সুন্দর ভাবে রুক্মিণীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ভ্রাতৃস্বরূপ শিশুপালের বাগদত্তা স্ত্রীকে কৃষ্ণ কিভাবে লঙ্ঘন করেছিলেন, তাঁর সমর্থন জুগিয়েছেন রম্ভিকার মুখে কেননা সে ভ্রাতৃস্বরূপ পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত যুবককে নিজের প্রেমপাশে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। আসলে সমাজে এমন কতকগুলি মানুষ আছেন যাঁরা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আপনজনকে পর এবং পরব্যক্তিকেও আপন করতে দ্বিধাগ্রস্থ বোধ করেন না। এই সহজ সত্যটিকে বোঝানোর নিমিত্ত কৌতুক মিশ্রিত বুদ্ধির বলে যে গল্পের উপস্থাপন করেছেন **উইট** (wit) জাতীয় হাস্যরসের অনুরূপ।

ঊনবিংশতিকথাতে কবি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসের পরিচয় দিয়েছেন। শুভস্থান নামক নগরে এক দরিদ্র বণিকের বাড়িতে চুরি করতে পারবেন করল। সেই ঘরে মজুত রাখা সরষে চুরি করে নিয়ে গেল। দুর্ভাগ্যবশত রাজপুরুষেরা চোরকে ধরে ফেললেন। যে পরিমাণ সরষে দরিদ্র বণিকের বাড়িতে চোরটি চুরি করেছিল, তা থলে বন্দি করে চোরের গলায় ঝুলিয়ে নগরের রাস্তায় ঘোরাতে লাগলেন। রাস্তায় বিভিন্ন নাগরিকরা চোরটির কাছে সরষে ব্যতীত অন্য কোনো চুরির জিনিস আছে কিনা তা প্রশ্ন করলে চোরটি মিথ্যা উত্তর দেয়। মিথ্যা উত্তর দেওয়ার জন্য চোরটিকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজার কাছে চোরটি উত্তর দিয়েছিল যে লোকেরা নিজের সুরক্ষার জন্য পাঁচ রকমের সরষে হাতে বাঁধে। চোরটির হাতে এত সরষে থাকার সত্বেও রাজপুরুষের হাতে বন্দী হয়েছে। রাজা চোরটির মিথ্যা কথার কারণ জানতে চাইলে বুদ্ধিদীপ্ত প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে রাজার হাত থেকে চোরটি নিষ্কৃতি পায়। চোরটি দরিদ্র বণিকের গৃহ থেকে সরষে চুরি করে নিয়ে আসার সময় ধরা পড়লে বিভিন্ন মিথ্যা কথার দ্বারা তা নিরসনের চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে চোরটি নানা অসূয়া বাক্যের উপস্থাপন করে। রাজার কাছে উপস্থিত হয়েও চোরটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে রাজার হাত থেকে নিষ্কৃতি

পায়। আসলে কবি এখানে চোর নামক চরিত্রের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের প্রথাকে বাক্যবাণে জর্জরিত করে **স্যাটায়ার**রূপ (Satire) হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

পঞ্চবিংশতিকথাতে কবি বৌদ্ধ ও জৈন সাধুর চরিত্রে কার্যকলাপ ও তাঁদের বাক্যালাপের মাধ্যমে চাতুর্যপূর্ণ কৌতুকহাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্রপুরী নগরীতে সিদ্ধসেন নামে এক উলঙ্গ বৌদ্ধ সাধু বসবাস করতেন। যিনি সাধারণ মানুষের কাছে সমাদৃত ছিলেন। অতঃপর সেই নগরে সিতপট নামে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত মহাগুণী জৈন সাধুর আগমন ঘটল। জৈন সাধুর প্রতি সাধারণ মানুষেরা আকৃষ্ট হলেন। এমনকি বৌদ্ধ সাধুর শিষ্য-সামন্তরাও মহাগুণী জৈন সাধুর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকলেন। শত্রুতাবশত বৌদ্ধ সাধু ক্ষপণকের সাহায্যে মহাগুণী জৈন সাধুকে দুশ্চরিত্র অপবাদের মাধ্যমে বিপদে ফেলার চেষ্টা করলেন। জৈন সাধুও উপস্থিত বুদ্ধি বলে বৌদ্ধ ধর্মচর্য পালনকারী সাধুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন। কবি উক্ত গল্পের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নগ্ন রূপটিকে জনসমক্ষে উন্মোচিত করেছেন। সেইসঙ্গে জৈন ধর্মের প্রাধান্যতার বিষয়টিকে পরিস্ফুট করেছেন। সচেতন ও মননশীল দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বৌদ্ধ ও জৈন সাধুর চরিত্রের কার্যকলাপের মাধ্যমে যে চাতুর্যপূর্ণ কৌতুকহাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তা **উইট**জাতীয় (Wit) হাস্যরসের অনুরূপ।

ষড়বিংশতিকথাতে হাস্যরসের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়েছে। জলউদা গ্রামে ক্ষেমরাজ এক বীর রাজপুত্রের পত্নী রত্নাদেবী। সেই গ্রামের মোড়ল দেবসাখ্য ও তাঁর একমাত্র ছেলে ধবল দুজনেই রত্না দেবীর প্রণয় প্রার্থী ছিলেন। দুজনের কেউই অবশ্য এ ব্যাপারে জানতেন না যে তাঁরা অর্থাৎ পিতা ও পুত্র একই রমণীর প্রতি প্রণয় আসক্ত। একদিন পিতা ও পুত্র উভয়ই রত্না দেবীর বাড়িতে পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হলেন। এইদিকে রত্না দেবীর স্বামী ক্ষেমরাজ ওই সময়ে বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। একই সময়ে তিনজনের উপস্থিতি দেখে রত্না দেবী প্রথমে ঘরের

মধ্যে থেকে বাইরে থাকা গ্রামের মোড়ল তথা দেবসাখ্য নামক প্রণয়ীকে ধমকাতে শুরু করলেন। ধমকানো দেখে রত্না দেবীর স্বামী স্বভাবতই ভীত অনুভব করলেন। রত্নাদেবী তাঁর স্বামীকে অর্থাৎ রাজপুত্রকে ঘরের মধ্যে থাকা অন্য প্রণয় অর্থাৎ দেব সাখ্যের পুত্র ধবলের প্রতি বিনয় প্রার্থী হয়ে বললেন যে ওই ব্যক্তিটির ছেলে রত্না দেবীর স্বামীর শরণাগত হয়েছে অর্থাৎ তাঁর গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন। শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া একজন ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্তব্য। সেই কারণের জন্যই গ্রামের মোড়লকে রত্নাদেবীর ধমক দিয়ে বাড়ির বাইরে তাড়িয়েছেন। রত্না দেবীর উপস্থিত বুদ্ধির বলে প্রণয়ীদেরকে স্বামীর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন এবং নিজের সতীত্বকে অটুট রেখেছেন। স্ত্রীর কথা শুনে রাজপুত্র সগর্বে ছেলেকে পিতার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কবি এই গল্পের মাধ্যমে যে ঘটনার উপস্থাপন করেছেন তা সত্যি চাতুর্যপূর্ণ। আসলে রত্না দেবী তাঁর স্বামীর কাছে নিজের সতীত্ব বাজায় রাখতে যেমন তৎপর হয়েছেন, তেমনি তৎপর হয়েছেন তাঁর প্রণয়ীর প্রাণ রক্ষা করতে। এইজন্য তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। রত্না দেবীর স্বামী ক্ষত্রিয় ধর্মের অধিকারী। রত্নাদেবী অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ মনোভাবের দ্বারা ক্ষত্রিয় নামক ধর্মীয় বেড়াজালকে সামনে রেখে নিজেকে সবার থেকে বাঁচিয়েছে। রত্নাদেবী নামক চরিত্রের মাধ্যমে যে ভণিতির উপস্থাপন করেছেন তা সত্যিই মননশীল এবং সচেতনশীল ও কৌতুকময় রচনা। এই জাতীয় কৌতুকময় রচনা **উইট** (Wit) জাতীয় হাস্যরসের অনুরূপ।

চৌত্রিশতমকথাতেও কিন্তু হাস্যরসের উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। শম্ভু নামেে এক বাহ্মণ জুয়াড়ি ছিলেন। রাস্তায় রাস্তায় জুয়া খেলা তাঁর প্রধান কাজ। রাস্তায় জুয়া খেলার সময় শম্ভু নামে বাহ্মণ নিম্নজাতীয়া রমণীকে কৃষি ক্ষেত্রে পাহারাদারি করতে দেখলেন। নিম্নজাতীয়া সরলা রমণীকে দেখে, তাকে কথার ছলে ভুলিয়ে একটি মাত্র শাড়ীর পরিবর্তে ব্রাহ্মণ শম্ভু তাঁর ভোগবাসনা চরিতার্থ করতে উদ্যত হন। শেষে ব্রাহ্মণ শম্ভু নিজের কূটবুদ্ধিবলে শেষ পর্যন্ত সরলা

রমণীর কাছ থেকে নিজের প্রদত্ত শাড়িটিও কেড়ে নেন। কবি এই গল্পটির মাধ্যমে ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণ ব্যক্তিরা সমাজ রক্ষক হিসেবে পরিগণিত হতো। কিন্তু এই গল্পের মধ্যে সমাজ রক্ষক ভূমিদেব ব্রাহ্মণকে তার ব্রাহ্মণ্যজাতি নিয়ে মাথা ঘামানোর পরিবর্তে তিনি গ্রামের সরলা রমণীর সঙ্গে নির্দ্বিধায় ভোগবাসনা চরিতার্থ করেছেন। শম্ভু নামক ব্যক্তিটি জাতিতে ব্রাহ্মণ হোলেও জুয়া খেলার মতো নিম্ন বৃত্তি গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষা থেকেও যেটার প্রতি কবি অধিকমাত্রায় দৃষ্টিপাত করেছেন সে বিষয়টি হলো শম্ভু নামক ব্রাহ্মণটি গ্রাম্য সরলা রমণীর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অথবা তার দারিদ্রোত্থিত লোভের সুযোগ নিয়ে তাকে ভোগ করার চিত্র উপস্থাপন করে ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতি ও দারিদ্রক্লিষ্ট সমাজের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ করে যে কৌতুময় গল্পের উপস্থাপন করেছেন তা প্রকৃতই **স্যাটায়ারে**র (Satire) অনুরূপ।

### ১:৫ *হিতোপদেশ* গল্পে হাস্যরস

পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা *হিতোপদেশে* সহজ স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় নীতিশিক্ষা এবং সাংসারিক জাগতিক জ্ঞানের দীক্ষা প্রসঙ্গে কাহিনীগুলিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অসংখ্য প্রকৃতির চরিত্র নির্মাণে অভিনবত্বের কবির পরিচয় পাওয়া যায়। আখ্যান ও কাহিনী গুলিতে লোক চরিত্রের বিভিন্ন প্রকার ত্রুটিকে ব্যঙ্গ করে ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে উপভোগ্য সরস বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের পরিচয় প্রদান করে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। আখ্যান ও কাহিনী গুলির মধ্যে পশু-পক্ষী, জীব-জন্তুর চরিত্র শুধু স্থান পায়নি বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মনুষ্য চরিত্রের উপস্থিতিও স্থান পেয়েছে।

*মিত্রলাভ* অংশে *বৃদ্ধব্যাঘ্রসুবর্ণকঙ্কণলোভীপথিককথাতে* হাস্যরসের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই গল্পে বর্ণিত দক্ষিণারণ্যে বিচরণকারী এক পথিক স্নাত বৃদ্ধব্যাঘ্র সোনার কঙ্কন হাতে বসে থাকতে দেখলেন। বৃদ্ধব্যাঘ্র পথিককে সোনার কঙ্কন গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে আহ্বান জানালেন। এতে পথিকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধব্যাঘ্র পথিককে নানা রকম ভালো কথা বলে শেষ পর্যন্ত সোনার কঙ্কন নিতে অনুরোধ করলেন। পথিক বৃদ্ধবাঘের কথা বিশ্বাস করে জলে স্নান করতে নামলে পাঁকে আটকে পড়ল। বৃদ্ধব্যাঘ্র তখন ধীরে ধীরে পথিকের কাছে এগিয়ে আসতে লাগলেন। এহেন অবস্থায় পথিক ভাবতে শুরু করলো বৃদ্ধব্যাঘ্রকে বিশ্বাস করে সে (পথিক) মোটেই ঠিক করেনি। কারণ-

ন ধর্মশাস্ত্রং প্রতীতি কারণং ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।[১৪]

অর্থাৎ দুরাত্মা ধর্মাচরণ করছে, এটা যেমন বিশ্বাসের কারণ হতে পারে না। তেমনি দুরাত্মা বেদ পড়ছে, এটাও তার বিশ্বাসের কারণ হতে পারে না। পথিক আরো চিন্তা করতে শুরু করলো যে-

নদীনাং শস্ত্রপাণীনাং নখিনাং শৃঙ্গিনাং তথা।

বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।।[১৫]

অর্থাৎ নদী, অস্ত্রধারী, নখযুক্ত প্রাণী, শিংযুক্ত প্রাণী, স্ত্রীলোক ও রাজকুলের লোককে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। অবশেষে সেই পথিক নিজের ভুলের জন্য এবং অতিশয় লোভের কারণে বৃদ্ধব্যাঘ্রের হাতে নিহত হলো। আলোচ্য গল্পে পথিক হলো আলম্বনবিভাব, স্নাতক বাঘের কুশধারণ রূপ হস্ত এবং পথিককে সুবর্ণ গ্রহণের জন্য আহ্বানরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা হলো উদ্দীপনবিভাব। পাঁকে পতিত পথিককে দেখে বাঘের হৃদয়ের যে বাসনা এবং অন্যদিকে পাঁকে পতিত পথিকের দিকে বৃদ্ধবাঘকে আসতে দেখে পথিকের মনে জাগ্রত অনুশোচনা হলো অনুভাব। বৃদ্ধবাঘ

পথিককে পাওয়ার জন্য নানারূপ অসূয়া বাক্যের প্রয়োগ এবং স্বপ্নরূপ বাসনা হলো ব্যভিচারীভাব। এই গল্পে বৃদ্ধবাঘের কথোপকথনের মধ্যে বাক্‌বিন্যাস এবং বুদ্ধিদীপ্ত বাক্‌চতুরালির মাধ্যমে হাস্যের উদ্রেক ঘটিয়েছেন। এরূপ হাস্যরস **উইট** (Wit) জাতীয় হাস্যরসের অনুরূপ।

একই অংশের অন্য একটি গল্প *অজ্ঞাতকুলশীলমৃগজম্বুককথা*তে হাস্যরস উল্লেখনীয়। মগধদেশে চম্পকবতী নামে একটি বনে চিত্রাঙ্গ নামে একটি হরিণ এবং সুবুদ্ধি নামে একটি কাক বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করত। চিত্রাঙ্গ হরিণ হৃষ্টপুষ্ট হলে তাকে দেখে ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে একটি শৃগালের লোভের সৃষ্টি হয়। দুর্বুদ্ধিবশত ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে কাকটি চিত্রাঙ্গ নামক হরিণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে একসাথে বসবাস করতে আরম্ভ করল। সুবুদ্ধি নামক কাকটি তৃতীয় জনকে দেখে চিত্রাঙ্গ নামক হরিণ বন্ধুকে তার হিতার্থে অভয় বাণী বলেছিল। এ প্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গ নামক হরিণকে সুবুদ্ধি নামক কাক বলেছিল –

অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো ন দেয়ো ন কস্যচিত্।[১৬]

অর্থাৎ বংশ পরিচয় এবং চরিত্র না জানা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া কখনই উচিত নয়। এই গল্পে হরিণ হলো আলম্বনবিভাব, হৃষ্টপুষ্ট হরিণকে দেখে লোভাতুর শৃগালের অসৎ বাক্য প্রয়োগ করে বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক পরস্পর একই স্থানে বসবাস হলো উদ্দীপনবিভাব। চিত্রাঙ্গ হরিণকে পাওয়ার নিমিত্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামক শৃগালের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং তার প্রতি বিশ্বাসভাজন হওয়া ব্যাপার হলো অনুভাব। সুবুদ্ধি নামক কাকের কথোপকথনের মাধ্যমে হরিণের চরিত্রে অজ্ঞাতকুলশীল চরিত্রে আস্থা স্থাপনরূপ প্রবৃত্তির জাগরণ হলো ব্যভিচারীভাব। চিত্রাঙ্গ হরিণ ও সুবুদ্ধি কাকের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলেও সেই বন্ধুত্বতাকে নষ্টের জন্য তৎপর ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামক লোভী শৃগালের অসৎ প্রলাপের মাধ্যমে বুদ্ধিদীপ্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে সুবুদ্ধি

নামক কাক বন্ধুর হিতার্থে বুদ্ধিদীপ্ত অভয় বাণী তা **উইট** (wit) নামক হাস্যরসের অনুরূপ। সুবুদ্ধি নামক কাক চিত্রাঙ্গ নামক হরিণকে যে অভয়বাণী দান করেছিল তা সত্যিই যুগোপযোগী।

*অন্ধগৃধ্রমার্জারপক্ষিকথা*তে অসৎ বিড়াল সৎ অন্ধশকুনের সান্নিধ্যে এসে চাতুর্যপূর্ণ মিথ্যা বাক্যের দ্বারা বিশ্বাসভাজন হওয়ার মধ্যে হাস্যরস লক্ষণীয়। ভাগীরথী নদীর তীরে গৃধ্রকূট পর্বতে পাকুড়গাছে জরদ্গব নামে একটি বৃদ্ধশকুন বসবাস করতেন। যাঁর দৈব দুর্বিপাকবশত চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই গাছে অন্যান্য বসবাসকারী পাখিদের দেওয়া খাবার খেয়ে অন্ধশকুন জীবন ধারণ করতেন। পরিবর্তে সেই গাছে থাকা পাখিদের শাবকদের রক্ষা করার দায়িত্ব অন্ধশকুন গ্রহণ করতেন। একদিন দীর্ঘকর্ণ নামে দুষ্টু বিড়াল পাখির শাবকদের খাবার জন্য সেখানে উপস্থিত হলো। তাকে দেখে পাখির শাবকরা  ভয়বশত কোলাহল শুরু করল। অন্ধশকুনকে অসূয়া বাক্যের দ্বারা দুষ্টু বিড়াল অন্ধশকুনের বিশ্বাস ভাজন হওয়ার চেষ্টা করে। বৃদ্ধ এবং অন্ধজরদ্গব নামক শকুন বিড়ালের আসার কারণ জানতে চাইলেন। তাঁর বিশ্বাসের পাত্র হবার জন্য মিথ্যা কথা আশ্রয় করে বলল যে পাখিরা সর্বদা আপনার (অন্ধশকুনের) প্রশংসা করে থাকে। এবং অন্ধশকুন সম্বন্ধে ভালো কথা বলে তাঁর বিশ্বাসভাজন হয়ে পক্ষী শাবকদের খেতে শুরু করল। অন্যদিকে সন্তানহারা পাখিরা শোকার্ত হয়ে শাবকদের খুঁজতে থাকলে গাছের কোঠরে বাচ্চাদের হাড় দেখতে পেল। সুযোগ বুঝে অসৎ বিড়াল গাছের কোটর থেকে পালিয়ে গেল। অন্ধজরদ্গব শকুনই তাদের বাচ্চাদের ভোক্ষণ করেছে এই কথা সব পাখিরা মনোস্থির করে অন্ধবৃদ্ধশকুনকে মেরে ফেলল। উপরি উক্ত গল্পে দীর্ঘকর্ণ নামক বিড়াল হলো আলম্বনবিভাব। জরদ্গব নামক অন্ধ শকুনের বিশ্বাস অর্জন করার নিমিত্ত, তাঁর সম্বন্ধে নানা অসৎ প্রলাপ করতে আরম্ভ করে। যেমন –

অতো ভবদ্ভ্যো বিদ্যাবয়োবৃদ্ধেভ্যো ধর্মং শ্রোতুমিহাগতঃ।[১৭]

অর্থাৎ তাঁর (অন্ধশকুনের) মতো বিদ্বান ও বয়সে প্রবীণ ব্যক্তির কাছে ধর্মকথা শোনার জন্যই এসেছে। দুষ্ট বিড়াল নিজেকে একজন ব্রহ্মচর্য ও চন্দ্রায়ণব্রত পালনকারী ব্যক্তি হিসেবে এবং অন্ধশকুনকে বিদ্বান ও ধর্মগুরু হিসেবে চিহ্নিত করে। অন্ধশকুনের বিশ্বাসভাজন হয়ে একসাথে পাকুড় গাছের কটোরে বসবাস করতে থাকে। এইরূপ কর্ম হলো অনুভাব। বিড়ালরেরা মাংস ভালোবাসে এইরূপ কথা অন্ধজরদ্গাব শকুন দীর্ঘকর্ণ নামক বিড়ালকে জানালে, বিড়াল নানাবিধ অসূয়াবাক্য বলতে থাকে যেমন- অহিংসা পরমধর্ম, বন্ধুত্বই হলো একমাত্র ধর্ম যা মৃত্যুর পরেও অমর থাকে, শাক দিয়ে পেটভরানো চলে ইত্যাদি অসূয়ারূপ বাক্য হলো ব্যভিচারীভাব। দীর্ঘকর্ণ নামক দুষ্ট চরিত্রের বিড়ালের নিজে অসৎ হয়ে সৎ হবার কামনার মধ্যে অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে যা হাস্যরসের উদ্রেক ঘটিয়ে থাকে। অসৎ বিড়ালের  মুখে এরূপ সৎপ্রলাপ, সৎ অন্ধশকুনের কাছে বিশ্বাস ভাজনের জন্য যে সকল বুদ্ধিদীপ্ত এবং চাতুর্যপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করে ব্যঙ্গের সৃষ্টি করেছে তা **উইট** (Wit) নামক হাস্যরসের অনুরূপ। আমাদের জগৎ সংসারে অসৎ বিড়ালের ন্যায় সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি অন্ধশকুনের ন্যায় সৎ ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে নিজের কার্য হাসিল করার নিদর্শনের ঘটনা কম নেই।

*মিত্রলাভের বৃদ্ধশৃগালহস্তীকথা*তে বিদ্রূপাত্মক উক্তির মধ্যে হাস্যরস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরতিলক নামক হাতিকে শৃগালেরা দেখল। অতঃপর শৃগালেরা হাতিকে হননের উপায় চিন্তা করতে লাগল। অবশেষে বৃদ্ধশৃগালের বুদ্ধি বলে হাতিকে বনের রাজপদে অভিষিক্ত করার লোভ দেখান হলো। রাজ্য আকৃষ্ট কর্পূর তিলক শৃগালের পিছনে ছুটতে ছুটতে পাঁকে পতিত হলে শৃগালদের দ্বারা নিহত ও ভক্ষিত হলো। এই গল্পে কর্পূর তিলক নামক হাতি এখানে আলম্বনবিভাব। হাতিকে ভক্ষণ করার জন্য কর্পূরতিলক হাতিকে বনের রাজপদে অভিষিক্ত করার লোভ রূপ ঘটনা হলো উদ্দীপনবিভাব। রাজ্য লোভাতুর কর্পূর তিলক হাতির সঙ্গে শৃগালদের সঙ্গে

বন্ধুত্ব স্থাপনের ঘটনা হলো অনুভাব। রাজপদে অভিষিক্ত করার নিমিত্ত শৃগালরা কর্পূরতিলক হাতিকে বিভিন্ন অসূয়া বাক্য বলতে থাকে যেমন-বনরাজ্যে রাজপথে অভিষিক্ত হওয়ার মতই সকল গুণে গুণান্বিত একমাত্র হাতিই আছে ইত্যাদি বাক্য হলো ব্যভিচারীভাব। কবি নারায়ণ শর্মা উপরিউক্ত গল্পের মধ্যে শৃগাল ও হাতির কথোপকথনের মধ্যে তথাকথিত সমাজের অসৎ পুরুষের উপর বিশ্বাস স্থাপনরূপ অবিমৃশ্যকারীকে বর্ণনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে অসৎ পুরুষের বিশ্বাসভাজনরূপ কারণকে তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করে তৃপ্তিলাভ করেছেন। সৎসঙ্গে প্রাণের লাভ আর অসৎ সঙ্গে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শৃগালদের ও হাতির কথোপকথনের মধ্যে এখানে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে তা **স্যাটায়ারধর্মী** (Satire) হাস্যরসের অনুরূপ।

অতঃপর *সুহৃদভেদের সিংহবৃষশৃগালকথা*তেও হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া পাওয়া যায়। দক্ষিণদেশে সুবর্ণবতী নগরের বর্ধমান নামক বণিক সঞ্জীবক নায়ক বৃষের সঙ্গে জিনিসপত্র নিয়ে রওনা দিলেন। ভ্রমণকালে বনের মধ্যে সঞ্জীবক নামক বৃষের জানু ভেঙে গেলে বণিক অন্য বৃষ কিনে পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। সঞ্জীবক নামক বৃষ বনের মধ্যে পড়ে থাকল। সেখানে বৃষ কিছুদিন থাকার ফলে সুস্থ হয়ে উঠল এবং বনের খাবার খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হলো। সঞ্জীবকের গর্জন শুনে সেই বনে বসবাসকারী পিঙ্গলক নামক সিংহ তাঁর দুই সেবক দমনক ও করটককে এ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। দমনক ও করটক ইতিমধ্যেই জেনেছে ওই গর্জন বৃষের। কিন্তু একথা তারা বনের রাজা পিঙ্গলক নামক সিংহের কাছে প্রকাশ করল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর (সিংহের) ওই দুই সেবক ইচ্ছাকৃতভাবে রাজাকে ভয়ের মধ্যে রেখে নিজেদের সুবিধা আদায় করতে চাইলেন। দুই সেবক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে এ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া দরকার নেই। সেই সঙ্গে দুই সেবক এ কথাও চিন্তা করলেন অন্য ব্যক্তির কাজের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিলে মূর্খগর্দভের মত অবস্থা হবে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে কর্পূরপট রজকের

গৃহে চুরির আগমন ঘটলে কুকুর তার কর্তব্য পালন থেকে বিরত থাকলে গর্দভ তার প্রভুর অশোকের ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টা করতে থাকে। মূর্খগর্দভ কুকুরের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিল। কিন্তু প্রভুর কাছে পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিল অকারণ প্রহার। এখানে মূর্খগর্দভ আলম্বনবিভাব। কর্পূরপট রজকের দেওয়ার দায়িত্ব কুকুর নিজে অবিচল থেকে সেই কাজে গর্দভকে উদ্বুদ্ধকরা রূপ ব্যপার হলো উদ্দীপনবিভাব। প্রভুর কাছে অকারণ প্রহার হলো অনুভাব। যে কাজের জন্য কুকুরকে রজক নিয়োজিত করেছিল সেই কাজ থেকে নিজেকে বিরত থেকে অলসতার পরিচয় দিয়েছে। অলসতা হলো ব্যভিচারীভাব। পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা মূর্খগর্দভ ও কুকুরের গল্পের অবতারণা করে তথাকথিত সমাজে কিংকর্তব্য বিমূঢ় প্রভুদের প্রতি আক্রমণাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক উপহাস করে বলেছেন-

পরাধিকারর্চ্চাম্ [১৮]

এই বাক্যের মাধ্যমে খুবই সমাজকে কিছুটা উপহাস করে কবি বলেছেন অন্যের ব্যাপারে মাথা না গলানোই ভালো। প্রকৃতপক্ষে রাজার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাকে, এবং গর্দভের প্রভুর প্রতি দায়িত্ববোধ পালন করলেও তা প্রভুর নিকটে অকাজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এরূপ মূর্খামিকে তীব্র উপহাসের মাধ্যমে যে ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস সৃষ্টি করেছে তা **স্যাটায়ারধর্মী** (Satire) হাস্যরসের অনুরূপ।

*সুহৃদভেদের সিংহশশককথা*তে হাস্যরসের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। মন্দারপর্বতে দুর্দান্ত নামে সিংহ সর্বদায় পশুবধ করতেন। বনের অন্যান্য পশুরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিল যে দুর্দান্ত নামে সিংহ বনের রাজা, তাই অন্যান্য পশুরা রাজাকে প্রতিদিন একটি করে পশু উপহার দেবে। এই সিদ্ধান্তে বনের রাজা সিংহ অভিমত পোষণ করলেন। এক

বৃদ্ধখরগোশের উপস্থিত হলে নিজেকে বাঁচানোর জন্য একটি বিশেষ ফন্দি আটল। সেই বৃদ্ধখরগোশ নিজে দেরী করে বনের রাজা সিংহের কাছে উপস্থিত হলো। ক্ষুধাপীড়িত সিংহ বৃদ্ধখরগোশকে তার দেরিতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বৃদ্ধখরগোশ সিংহকে জানায় পথের মধ্যে অন্য এক সিংহ তাকে ধরেছিল এজন্যই তার এখানে আসতে দেরি হলো। এই কথা শুনে দুর্দান্ত নামের সিংহ অপর দ্বিতীয় দুরাত্মা সিংহকে দেখার জন্য বৃদ্ধখরগোশের কাছে অনুনয় জানালেন। বৃদ্ধখরগোশ গভীর কূপের কাছে নিয়ে এল। দুর্দান্ত নামে সিংহ গভীর কূপের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে অন্য সিংহ মনে করলেন। নিজেকে সেই গভীর কূপে নিক্ষেপ করলেন এবং নিহত হলেন। বৃদ্ধখরগোশের বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বনের অন্যান্য পরশুরা রক্ষা পেল। বাকচাতুর্যের দ্বারা বৃদ্ধখরগোশ সিংহকে উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে। বৃদ্ধখরগোশ সিংহের তুলনায় আকারে ছোট হলেও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সিংহকে জব্দ করেছিল। বৃদ্ধ খরগোশ ও দুর্দান্ত নামক সিংহ এখানে আলম্বনবিভাব। ক্ষুধাপীড়িত সিংহের নিকট বৃদ্ধখরগোশের দেরিতে আগমন হলো উদ্দীপন বিভাব। ক্ষুধাপীড়িত সিংহের মধ্যে কোপের উদ্ভব হলো অনুভাব। সিংহকে জব্দ করার নিমিত্তে বৃদ্ধ খরগোশের বিভিন্ন অসূয়া বাক্যের প্রয়োগ যেমন-

অগচ্ছন্ পথি সিংহান্তরেণ বলাদ্ধৃতঃ।[১৯]

অর্থাৎ এখানে আসার সময় অন্য একটি সিংহের দ্বারা সে ধৃত হয়েছিল। কবি নারায়ণ শর্মা উপরি উক্ত গল্পের মধ্যে বৃদ্ধখরগোশের উক্তির মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত সরস বাকচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।[২০]

অর্থাৎ বুদ্ধি যার বল তার এই সহজ সত্যটাকে প্রতিস্থাপন করেছেন। এই জাতীয় সরস কৌতুকময় চাতুর্যপূর্ণ হাস্যরস **উইটের** (Wit) অনুরূপ।

*বিগ্রহ* অংশে *ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতাগর্দভকথা*তে গর্দভের বিকৃতবেশ জনিত কারণে কৌতুকপূর্ণ হাস্যরস উল্লেখযোগ্য। হস্তিনাপুরে বিলাস নামে রজকের বাড়িতে একটি গাধা ছিল। সে ভার বহন করতে করতে অত্যন্ত মুমূর্ষ হয়ে পড়েছিল। রজক তাকে শক্তিশালী করার জন্য চিতাবাঘের চর্ম পরিয়ে শস্যক্ষেতে ছেড়ে দিত। এবং সেই ক্ষেতের শস্য ভক্ষণ করে গাধাটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। চিতাবাঘের ভয়ে ক্ষেতমজুররা ক্ষেতে প্রবেশ করা ছেড়ে দিয়েছিল। অবশেষে ধূসর কম্বল আবৃত ধনুর্বাণ যুক্ত শস্যরক্ষক লক্ষ্য করল এবং সেই ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত গর্দভটি তাকে গর্দভী মনে করে চেঁচাতে লাগল। কৃষকেরা তার আসল রূপ বুঝতে পেরে গর্দভটিকে মেরে ফেললেন। এই গল্পে রজকের গর্দভ হলো আলম্বনবিভাব। ব্যাঘ্রচর্ম দ্বারা মুমূর্ষ গর্দভকে আবৃত করা হলো উদ্দীপনবিভাব। ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত গর্দভকে দেখে কৃষকদের পলায়ন এবং মুমূর্ষ গর্দভ ক্ষেতের শস্য ভক্ষণ করে ক্রমশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে এইরূপ ব্যপার হলো অনুভাব। ধূসরকম্বল আবৃত ধনুর্বাণযুক্ত শস্যরক্ষককে দেখে গর্দভী মনে করে ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত হৃষ্টপুষ্ট গর্দভের মোহবশত চিৎকার হলো ব্যভিচারীভাব। উপরিউক্ত গল্পের মাধ্যমে কবি নারায়ণ শর্মা ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত শারীরিক ভারসাম্যহীনতার ও বিকৃতবেশ এবং তদ্রূপ কারণে যে কৌতুকপূর্ণ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে তা **ফান** ( Fun) জাতীয় হাস্যের অনুরূপ।

*নীলবর্ণশৃগালকথা*টি হাস্যরসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই গল্পে একটি মূর্খশৃগালের কাহীনিকে কবি উপস্থাপন করেছেন। অরণ্যবাসী একশৃগাল নগরের প্রান্তে ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ করে নীল রঙের পাত্রে পড়ে যায় এবং নীলবর্ণ ধারণ করে। সেই পাত্রের থেকে সে উঠতে না পারায় মৃতের ভাণ করে পড়ে থাকে। নীল ভাণ্ডারের মালিক শৃগালকে দেখে মৃত বলে মনে করেন এবং

পাত্র থেকে তুলে ফেলেদেন। এর ফলে নীলবর্ণ ধারণকারী শৃগাল নীল ভাণ্ডারের মালিকের হাত থেকে রক্ষা পায়। অরণ্যে অন্যান্য শৃগাল নীলবর্ণ শৃগালকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করল। নীলবর্ণ ধারণকারী শৃগাল অন্যান্য শৃগালদের আহ্বান করে জানালো তাকে ( নীল বর্ণ শৃগালকে) ভগবতী বনদেবী নিজের হাতে অরণ্য রাজ্যের সমস্ত ঔষধের রসে অভিষিক্ত করেছেন –

অহং ভগবত্যা .... সর্বৌষধিরসেনাভিষিক্তঃ।[২১]

সে নিজেকে বনের রাজা বলে প্রচার করল। অন্যান্য শৃগালরা তাকে (নীলবর্ণের শৃগালকে) মহারাজ হিসাবে মেনে নিল এবং অরণ্যবাসীর মধ্যে তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। বাঘ-সিংহ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর অনুচর পেয়ে তার সভায় স্বগোত্রীয় অন্যান্য শৃগালদের দেখে লজ্জা বোধ করল। অতঃপর অবজ্ঞার সঙ্গে নিজের জ্ঞাতিদের তাড়িয়ে দিল। শৃগালদের বিষন্নতা দেখে এক বৃদ্ধশৃগালের বুদ্ধি বলে নীলবর্ণ ধারণকারী শৃগালের চালাকি ধরা পড়ে যায়। অবশেষে নীলবর্ণ ধারণকারী মূর্খশৃগালকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা এই গল্পের মাধ্যমে সমাজে ভণ্ড লোকের ভণ্ডামিকে শৃগালের চরিত্রের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সমাজে ভণ্ডব্যক্তির কার্যকলাপের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে **স্যাটায়ার**ধর্মী ( Satire) হাসরসের সৃষ্টি করেছেন। একই সঙ্গে কবি এই গল্পে চমৎকৃত ও বিকৃত রূপ নীলবর্ণের শৃগালের চরিত্রে যে কৌতুকপূর্ণ হাস্যরসের উদ্ভব ঘটিয়েছেন তা **ফান** (Fun) জাতীয় হাস্যের অনুরূপ।

### ১:৬ *পুরুষপরীক্ষা* গল্পে হাস্যরস

বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি *পুরুষপরীক্ষা*তে যথার্থ পুরুষের আচরণবিধি প্রসঙ্গে বিভিন্ন গল্পের অবতারণা করেছেন। এই গল্পগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি গল্প হাস্যরসের নিদর্শন লক্ষিত হয়।

*অথবর্ব্বরকথা*তে হাস্যরসের উপস্থিতি উল্লেখনীয়। এই গল্পে কৌশাম্বীনগরে দেবধর গণকের পুত্র শান্তিধর জ্ঞানশূন্য এবং স্বভাবে বর্ব্বর প্রকৃতির ছিলেন। বর্ব্বর ব্যক্তি প্রকৃতি বিষয়ে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে-পিতা সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রদেরকে যথাসর্বস্ব দিতে পারেন কিন্তু ভাগ্য ও বুদ্ধি দিতে পারেন না। কারণ ভাগ্য ও বুদ্ধি এই দুটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। শান্তিধরের পিতা পুত্রকে শাস্ত্রজ্ঞ করে তোলার জন্য উদগ্রীব হলেন। বহুকষ্টে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করালেন। শান্তিধর শাস্ত্রাভ্যাস করলেও তার প্রকৃত পদার্থবোধ বা তত্ত্ববোধের জ্ঞান জন্মালো না। কারণ শাস্ত্রজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো চরিত্রের বোধশক্তির বিকাশ। দেবধর তাঁর শাস্ত্রজ্ঞ পুত্রকে রাজার সমীপে কৃতকার্য করার নিমিত্তে উপস্থিত করালেন। রাজা তাঁর (শান্তিধর) শাস্ত্রাভ্যাসের যথাযথ জ্ঞানার্জন হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার নিমিত্ত স্বর্ণাঙ্গুলী মুষ্টি মধ্যে কি আছে তা জানতে চাইলেন। জ্যোতিশাস্ত্রজ্ঞ শান্তিধর খড়ির দ্বারা গণনা করে প্রথমে ধাতু, দ্বিতীয় বার চক্রাকার ও তৃতীয় বার ভারী দ্রব্য আছে একথা বললেন। প্রত্যুত্তরে রাজা তার প্রশংসা করলেন। চতুর্থবার রাজা বিশেষ রূপে কোন দ্রব্য মুষ্টির মধ্যে আছে সেটি শান্তিধরের কাছে জানতে চাইলেন। শান্তিধর গণনা ছেড়ে নিজেও বুদ্ধিবলে পাথরের মত কিছু আছে এরূপ রাজাকে উত্তর করলেন। এতে রাজা সহাস্যের সঙ্গে শান্তিধরের পিতা দেবধরকে বললেন যে তাঁর পুত্র শাস্ত্রাভ্যাস করলেও যথাযথ শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেনি। বুদ্ধিহীন ও প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তিরা বারংবার শাস্ত্র অভ্যাস করলেও প্রকৃত পণ্ডিত হতে পারে না, প্রকৃত পাণ্ডিত্যের জন্য চাই বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা। কবি এই গল্পের মধ্যে নির্বোধ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শান্তিধর নামক চরিত্রের মাধ্যমে যে গল্পের অবতারণা করেছেন, তারমধ্যে কৌতুক হাস্যরস বিদ্যমান। রাজা শান্তিধরের প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করলেন । তার পাণ্ডিত্যের কথা বলতে গিয়ে রাজা শান্তিধরের পিতাকে কথাগুলি বলেছিলেন তা যথার্থই বিদ্রূপাত্মক। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি হলো পাণ্ডিত্যের প্রধান উপাদান যা মানুষের জন্মগত উপাদান।

বারংবার শাস্ত্র অভ্যাসের দ্বারা তা সম্ভব নয় এই সহজ সত্যটাকে জনসমক্ষে পরিস্ফুট করার নিমিত্ত সচেতন ও মননশীল গল্পের অবতারণা করেছেন এবং এই জাতীয় গল্পের মধ্যে বৈদগ্ধপূর্ণ হাস্যরস বিদ্যমান, যা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের **উইটের** (Wit) অনুরূপ।

*অথসংসর্গবর্ব্বরকথার* মধ্যে কবি যে গল্পের উপস্থাপন করেছেন তা প্রকৃতই হাস্যাস্পদ। প্রাচীনকাল থেকে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে সেটি হলো সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস এবং অসৎ সঙ্গে নরকবাস। তেমনি প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তিদের নিকট অবস্থান করলে তার নিকটে থাকা ব্যক্তিরটিও সংসর্গ দোষে প্রজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। গণ্ডকী নদীর তীরে তৃণপরিপূর্ণ স্থানে বহু গোপজাতির বসবাস ছিল। সেখানে এক গোপের শলভ নামে পুত্র জন্মাল। শলভ নামক পুত্র গোপজাতিদের সঙ্গে থেকে গোপালাদি কাজ শিখল কিন্তু নগরস্থ লোকের ব্যবহারের প্রতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। শলভের মাতা অসুস্থ হলো। তার পিতার অনুরোধে অসুস্থ মায়ের শুশ্রুষা করতে উদ্যত হলো। লোকব্যবহার শলভের কাছে অজ্ঞাত থাকার কারণে গো শুশ্রুষার ন্যায় অসুস্থ মাকে শনদ্বারা নির্মিত দড়ি দিয়ে বেঁধে, তুষের ধূমকরে ঘাস আহার দিয়ে শুশ্রূষা করতে প্রবৃত্ত হলো। এমত অবস্থায় শলভের মা দুর্বল ও কণ্ঠাগত প্রাণ হয়ে চিৎকার আরম্ভ করলে সকলে এসে দড়ির বন্ধন খুলে শলভের মাকে রক্ষা করল। শলভকে তার এই নির্বোধ কার্যকলাপের জন্য সকলে মিলে তিরস্কার করল। কবি বিদ্যাপতি শলভ নামক চরিত্রের কার্যকলাপের মধ্যে উদ্ভট ও অস্বাভাবিক ঘটনা প্রতিস্থাপন করেছেন। গোশুশ্রুষার ন্যায় মাতৃশুশ্রুষা, অর্থাৎ পশুর সেবার ন্যায় মানবসেবা এই দুটি বিষয় একেবারেই আলাদা। এই উদ্ভট এবং অস্বাভাবিক ঘটনা প্রতিস্থাপন করে কৌতুকময় হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। এই জাতীয় হাস্যরসকে **ফান** (Fun) জাতীয় হাস্যরস বলা হয়।

*অথশাস্ত্রবিদ্যকথা*তে কবি তথাকথিত সমাজে শাস্ত্রবেদাজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। অন্যদিকে তিনি ধর্মজালে আবদ্ধ ধর্মভীরু ব্রাহ্মণব্যক্তিদের প্রতি কটাক্ষকরে বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। উজ্জয়িনী নগরে ব্রাহ্মণ শিরোপীড়াতে ব্যাকুল হয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাজা সেই ব্রাহ্মণের প্রতি সকরুণ চিত্ত হয়ে তার ব্যাধি নিরাময়ের জন্য বরাহ নামক জ্যোতিশাস্ত্রবেত্তাকে ডেকে শিরোপীড়া রোগের উপশমের কারণ জানতে চাইলেন। জ্যোতিশাস্ত্রবেত্তা বরাহ রাজাকে সেই রোগের উপশমের কারণ হিসেবে মদ্যপানের কথা বলেন। মদ্যপান একজন ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ একথা জেনে রাজা জ্যোতিশাস্ত্রবেত্তা বরাহের উপদেশ মানতে অস্বীকার করেন। এরপর রাজা হরিশচন্দ্র বৈদ্যকে ডাকলেন এবং শিরোপীড়াতে ব্যাকুল ব্রাহ্মণের রোগের নাম এবং তাঁর উপশমের কারণ জানতে চাইলেন। হরিশচন্দ্র বৈদ্য রাজাকে জানালেন শিরোবেদনা রূপ রোগের নাম ব্রহ্মকীট এবং এই রোগের একমাত্র উপশমের উপায় হলো সুরাপান। রাজাবিক্রমাদিত্য পুনরায় ব্রাহ্মণকে সুরাপান করাতে অস্বীকার করেন। এরপর রাজা পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণের রোগ উপশমের নিমিত্ত ধর্মশাস্ত্রবেত্তা শবরস্বামীকে আহ্বান করলেন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মকীট নামক রোগের উপশমের কারণ জানতে চাইলে তিনি পুনরায় এই রোগের নিরাময়ের জন্য ব্রাহ্মণকে সুরাপানের পরামর্শ দেন। এরপর রাজা ব্রাহ্মণকে বাঁচানোর নিমিত্ত সুরাপানের আদেশ দিলেন। আতুর ব্রাহ্মণের জন্য সুরা আনা হলে আকাশবাণীর দ্বারা শবরস্বামীকে সুরাপান করানো রূপ দুর্সাহস কার্যের জন্য তাঁকে নিবারণ করা হয়। এই সময় শবরস্বামী ব্রাহ্মণকে বাঁচানোর নিমিত্ত আকাশবাণীকে বাক্যমাত্র এবং ধর্মশাস্ত্রে অসিদ্ধ এরূপ নিরূপণ করে ব্রাহ্মণের কঠিন রোগের উপশম ঘটালেন। দেবতারা তখন শবরস্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। কবি বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণের শিরোপীড়ারূপ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে গল্পের অবতারণা করেছেন, তাতে সমাজের ব্রাহ্মণধর্মে মানুষের প্রতি শাস্ত্রাধিগত

বাক্যকে অমৃতস্বরূপ মননশীল মনোভাবকে প্রকাশ করে যে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে **স্যাটায়ারধর্মী** (Satire)। সুরাপান বা মদ্যপান ব্রাহ্মণধর্মে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম সে কথা সকলেরই জ্ঞাত। কিন্তু সুরাপান যেখানে ব্যাধির উপশমের কারণ সেরূপ সুরাপান শাস্ত্র শুদ্ধ বাক্য না হলেও নিয়ম প্রসিদ্ধ বটে। তাই শবরস্বামী ব্রহ্মকীট রূপ মারণরোগে পীড়ীত ব্রাহ্মণকে উপশমের নিমিত্ত সুরা দিলে সেই সময় দেবতা প্রদত্ত আকাশবাণীকে অস্বীকার করেন। শবরস্বামী ধর্মজালে আবদ্ধ না হয় শাস্ত্রবেদাজ্ঞ বাক্যের দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আসলে শবরস্বামীর মুখ দিয়ে কবি দেবতা প্রদত্ত আকাশবাণীকে বাক্যমাত্র এবং শাস্ত্র অশুদ্ধ বাক্যের দ্বারা তীব্র কটাক্ষ করেছেন তথাকথিত ধর্মভীরু ব্যক্তিদের।

অতঃপর *অথনৃত্যবিদ্যকথা*তেও কবি উমাপতি ধর নামক মন্ত্রীর এবং গন্ধর্ব নামক পুংনটের কথোপকথনের মাধ্যমে যে হাস্যরসের পরিচয় তা প্রকৃতপক্ষে উল্লেখনীয়। গৌড়দেশের রাজা লক্ষণ সেনের মন্ত্রী উমাপতি ধর। গন্ধর্ব নামক পুংনট কপালে চন্দ্রবিন্দু তিলক সহযোগে রাজার সাথে দেখা করতে এলেন। উমাপতি ধর মন্ত্রী গন্ধর্ব পুংনটকে পরিহাসের ছলে বলেছিলেন যে শব্দের উপরে এক বিন্দু বা অনুস্বার থাকে সেই শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। সুতরাং গন্ধর্ব নামক নটের কপালে একবিন্দু চন্দ্র আছে অর্থাৎ তিনিও (গন্ধর্ব নট) ক্লীবনট। ক্লীবলিঙ্গে নট্ শব্দের অর্থ মূর্খ। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রী উমাপতি ধর গন্ধর্ব নটকে মূর্খ বলে পরিহাস করলেন। গন্ধর্ব নটও উমাপতি ধরের পরিহাসকে সম্পূর্ণরূপে অববোধন করে তার প্রত্যুত্তরে বললেন যে তাঁর (গন্ধর্ব নট) কণ্ঠেও আরেকটি চন্দ্রবিন্দু আছে সুতরাং তিনি হলেন পুংনট এবং নট বিষয়ে সর্বজ্ঞাত। এই কথা শুনে উমাপতি ধর রেগে গিয়ে নিজের নামের অর্থ গন্ধর্ব নটের কাছে জানতে চাইলেন। গন্ধর্ব নটও অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিহাসের ছলে তাঁকে (মন্ত্রী উমাপতি ধরকে) বললেন 'উমাপতি' শব্দের অর্থ 'মহাদেব'। উমাপতি ধরের অর্থ হলো তিনি মহাদেবকে ধারণ করে থাকেন অর্থাৎ বৃষ (ষাঁড়)।

একথা শুনে উমাপতি ধর রেগে গেলেন। কবি বিদ্যাপতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে গন্ধর্ব ও উমাপতিধর নামক চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে যে বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে তা হলো **স্যাটায়ারে**র (Satire) অনুরূপ। আসলে তথাকথিত সমাজের বিদগ্ধ পণ্ডিতদের কলহদ্বন্দ্ব রূপ ব্যাপারকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন।

*অথসাবধানকথা*তে কবি বিদ্যাপতি বর্ণিত কাহীনির মাধ্যমে কৌতুকপূর্ণ হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। জয়ন্তী নগরে বীরবিক্রম নামে নীতিজ্ঞ রাজা, নিজ যোগ্যতা অনুসারে ধন উপার্জন করে বহুপুত্র যুক্ত হয়ে সুখে কাল যাপন করতেন। এক দিন রাত্রে রাজা রোদনের শব্দ শুনে বাইরে এসে সর্বাঙ্গসুন্দরী, নবযুবতী, সর্বাভরণভূষিতা এবং উত্তমবস্ত্র পরিহিতা স্ত্রীকে দেখলেন। রাজা স্ত্রীকে তাঁর রোদনের কারণ জানতে চাইলে তিনি রাজাকে জানান, তিনি হলেন রাজার লক্ষ্মী। লক্ষ্মী অন্যত্র গমনের হেতু নীতিজ্ঞ ও ধার্মিক রাজার প্রতি তিনি রোদন করছেন। প্রত্যুত্তরে রাজা লক্ষ্মীর অন্যত্র গমনের কারণ জানতে চাইলেন। রাজার প্রতি তাঁর স্নেহ থাকা সত্ত্বেও কিসের জন্য তিনি রাজাকে পরিত্যাগ করছেন। অনন্তর লক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে রাজাকে জানালেন যে পুরুষ ভীত, মৃদু, লোভাতুর এবং বিরোধ যুক্ত ব্যক্তিদের গৃহে অবস্থান করেন না কারণ লক্ষ্মীর স্বভাবত চঞ্চল প্রকৃতির। রাজা বিক্রম লক্ষ্মীর কথা শুনে বিচার করে বুঝলে যে বহুমূত্র ব্যতীত লক্ষ্মীর অনুপযুক্ত ব্যবহারের অন্য কোনো দোষ তার (রাজার) নেই। ভূপতিকে ত্যাগের পূর্বে লক্ষ্মীর নিকট থেকে একটি বর প্রার্থনা করলেন। দেবী লক্ষ্মী ও রাজাকে তাঁর অন্যত্র গমনের নিষেধ ভিন্ন প্রার্থনা করতে বললেন । রাজা দেবী লক্ষ্মীর কথামতো সেই বরের প্রার্থনার না করে তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য সাধনের বর প্রার্থনা করলেন। দেবী লক্ষ্মী রাজার বর প্রার্থনা শুনে তার প্রত্যুত্তরে বললেন লক্ষ্মী নদী নীচগা, বিদ্যুতের ন্যায় অস্থির চঞ্চল প্রকৃতির হলেও তিনি নারায়ণের প্রিয়তমা হয়ে চিরকাল অবস্থান করেন। নারায়ণের প্রিয়তমার ন্যায়

রাজাবিক্রমাদিত্যের কাছে দেবী লক্ষ্মী চিরতরে অবস্থান করলেন। ধনসম্পদ অপার্থিব বস্তু এবং তা ক্ষণস্থায়ী। ধনের অর্জন করা যেমন কঠিন তার চেয়েও বেশি কঠিন উপার্জিত ধনের সৎ পাত্রে দান ও সঞ্চয়। কবি বিদ্যাপতি সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে অর্থের তথাপোযুক্ত ব্যবহারের নিমিত্ত যে সাবধান বার্তার অবতারণা করেছেন তা সত্যি কৌতুকপূর্ণ। এখানে কবি দেবী লক্ষ্মীর মুখ নিঃসৃত বাণী দ্বারা বাক্‌চতুরালির মাধ্যমে সমাজের প্রতি সাবধানতার বার্তা প্রতিবেদন করেছেন। তিনি বাক্‌চতুরালির দ্বারা কৌতুকপূর্ণ যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন সেটি **পুন** (Pun) জাতীয় হাস্যরসের অনুরূপ।

**১:৭ ভোজপ্রবন্ধ**

কবি বল্লালবিরচিত *ভোজপ্রবন্ধের* প্রত্যেকটি গল্প স্বতন্ত্র কাহিনীকে কেন্দ্র করে উপস্থাপন করেছেন। *ভোজপ্রবন্ধের* প্রধান চরিত্র ধারাধিপতি ভোজ যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক এবং কবিরূপে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর দানশীলতা, বিদ্যানুরাগ, কাব্যপ্রিয়তা প্রকাশের নিমিত্ত একাধিক সংক্ষিপ্ত গল্পের উপস্থাপন করেছেন। *ভোজপ্রবন্ধের* অন্তর্গত আখ্যান গুলিতে সরস মন্তব্য, তীক্ষ্ণবিদ্রূপ ও হাস্যরসাত্মক ঘটনার নিদর্শন লক্ষিত হয়েছে।

*ভোজস্য রাজ্যপ্রাপ্তি* গল্পটি  হাস্যরসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। রাজামুঞ্জ তপোবনে গমন করলে বুদ্ধি সাগরকে মন্ত্রী করে রাজাভোজ রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন। একদিন রাজাভোজ উদ্যানে যাবার সময় ধারা নগরবাসীর বিপ্র রাজাকে দেখে কোনরূপ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ না করে চোখ বন্ধ করে নিলেন। রাজাভোজের নিকট থেকে চোখ বন্ধের কারণ জানতে চাইলে রাজাকে বিপ্র জানান, রাজাভোজ বৈষ্ণব সেহেতু তিনি তাঁর কোন ক্ষতি করবেন না, সেই দিক দিয়ে বিপ্রের কোন ভয়

নেই। বিপ্র রাজাকে এও জানালেন যে রাজাভোজ কাউকে কোনদিন কিছু দান করেন না তাই তিনি (রাজা) কৃপণ ব্যক্তি। রাজা ভোজের ন্যায় কৃপণ ব্যক্তির মুখ সকালবেলায় দর্শন করা উচিত নয়। কারণ শাস্ত্রে কথিত আছে প্রয়োগ বিদ্যাহীনের বিদ্যার্জন, কৃপণের ধনার্জন, ভীরুজনের বাহুবল, এই তিনটি পৃথিবীতে বিফল। বিপ্র রাজাকে জানান যে কৃপণ রাজা এবং সেই রাজার আশ্রিত জন মহাপাতক রূপে চিহ্নিত হন। যে ব্যক্তি দাতা নয় সেই ব্যক্তির মধ্যে কোনরূপ উদারতা পরিলক্ষিত হয় না। পৃথিবীতে কেউ দীর্ঘায়ু অধিকারী নন। এই নশ্বর শরীর কেবলমাত্র যশের দ্বারাই অবিনশ্বর হয়ে থাকে। রাজাভোজ বিপ্রের এই রূপ কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন এবং বললেন- জগতে সর্বদা প্রিয়বাদী জন সুলভ কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর তথ্যের বক্তা ও শ্রোতার জগতে দুর্লভ-

সুলভা পুরুষা লোকে সততং প্রিয়বাদিনঃ।

অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।।[২২]

রাজাভোজ বিপ্রের কথোপকথনের মধ্যে তথাকথিত কৃপণ, মহাপাতক, যশই অবিনশ্বর দেহের একমাত্র উপায়, সত্য কথার বক্তা ও শ্রোতার পৃথিবীতে দুর্লভ ইত্যাদি শাশ্বত সত্যের বিষয়গুলির উদঘাটন করা হয়েছে। রাজার প্রতি বিপ্রের উক্তির মাধ্যমে লঘু ও সরস হাস্যরসের প্রতিফলন লক্ষিত হয়েছে। যেখানে রাজাভোজের উদ্দেশ্যে বিপ্র বলেছেন- রাজাভোজ বৈষ্ণব, রাজাকে সত্য কথা বললেও রাজা বিপ্রের কোন ক্ষতি করবেন না, সেই দিক দিয়ে বিপ্রের কোন ভয় নেই। বিপ্রের এই উক্তির মাধ্যমে বুদ্ধির চাতুর্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানেই যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে তা হলো **উইটের** (Wit) অনুরূপ। এই উক্তির মাধ্যমে তথাকথিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের জন্য ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

*রাজসভায়াং কালিদাসস্য আগমনম্* নামক গল্পে কবি রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় জীবনধারণকারী পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। ভোজের রাজসভায় বিভিন্ন শাস্ত্রে নিষ্ণাত বররুচি, বাণ, ময়ূর, রেফণ, হরি, শঙ্কর, কলিঙ্গ, কর্পূর, বিনায়ক মদন, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল প্রভৃতি কবিদ্বারা তাঁর সভা অলঙ্কৃত হয়েছিলো। এমন সময় নগরপাল এসে রাজাভোজকে সংবাদ দেন কোন এক বিদ্বান রাজদ্বারে রাজাভোজের জন্য অপেক্ষা করছেন। সেই বিদ্বান ব্যক্তির নিকট রাজা জানতে চাইলেন যে তিনি কিসের জন্য এসেছেন। রাজাভোজ জানতে পারেন যে রাজার নিমিত্ত সেই বিদ্বান ব্যক্তি এসেছেন । বিদ্বান ব্যক্তি রাজাভোজের নিমিত্ত যে কবিতা লিখেছিলেন তা রাজাভোজকে শোনান এবং রাজা খুশী হয়ে বিদ্বান ব্যক্তিকে বারোলাখ মুদ্রা দান করেন। রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা রাজাভোজকে মূর্খব্যক্তি বলে সম্বোধন করলেন । এই রাজার সেবা করে কি হবে? রাজাভোজের রাজসভায় আগত সেই কবির প্রতি নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করে অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তিরা বললেন-

অসৌ চ কেবলং গ্রামং কবিঃ শঙ্করঃ, কিমস্য প্রাগল্ভম্।[২৩]

এই গল্পে কোলাহলের মধ্যে বিদ্বান রাজপুরুষেরা লক্ষ্য করলেন সোনার মুকুট ধারণ করে, সুন্দর বস্ত্র পরিহিত, রাজকুমারের ন্যায় সুদৃশ্য সমস্ত কস্তুরী শরীরে লেপন করে, নবীন পুষ্প মস্তকে ধারণ করে, চন্দনের অঙ্গরাজ লেপন করে, কবিতায় যেন তাঁর দেহকে ধারণ করে আছে এমন শৃঙ্গার রসের প্রবাহের ন্যায় সাক্ষাৎ মহেন্দ্র স্বরূপ বিদ্বান ব্যক্তি রাজাভোজের কথা জানতে চাইলেন। রাজাভোজ আছে একথা জেনে মৃগরাজ রূপ বিদ্বান ব্যক্তি ভোজের রাজসভায় উপস্থিত প্রত্যেক বিদ্বান ব্যক্তিকে একলাখ করে মুদ্রা দান করলেন। এরপর সভায় উপস্থিত অন্যান্য বিদ্বান ব্যাক্তিদের উদ্দেশ্যে আগত কবি বললেন শঙ্কর নামক কবিকে রাজাভোজ বারোলাখ মুদ্রা দান করেছিলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য আপনাদের (বিদ্বান রাজপুরুষদের) বোধগম্য হয়নি-

অভিপ্রায় প্রারম্ভ রাঞ্জো নৈব বুদ্ধঃ।[২৪]

এর উদ্যোগে বিদ্বান ব্যাক্তিদের মৃগরাজ বললেন রাজাভোজ শঙ্কর নামক কবিকে একলাখ মুদ্রা দিয়ে পূজিত করেছেন এবং শঙ্করের যে যে একাদশ রূপ বর্তমান তাঁদের প্রত্যেককে রাজা একলাখ মুদ্রা দিয়ে পূজা করেছেন। এই কথা শুনে রাজসভায় উপস্থিত অন্যান্য বিদ্বান রাজপুরুষেরা চমৎকৃত হলেন এবং রাজাভোজের প্রতি ভালো ধারণা অবসান ঘটালেন মৃগরাজ রূপ কবি কালিদাস। রাজাভোজ শঙ্কর নামক কবিকে বারোলাখ মুদ্রা দান করায় রাজাভোজের অনুশ্রিত অন্যান্য বিদ্বান রাজপুরুষেরা রাজাকে অজ্ঞাত বলে মনে করলেন। যে সকল কবি রাজাভোজের পৃষ্ঠপোষকতায় জীবন ধারণ করেছিলেন সেই সকল রাজপুরুষেরা অজ্ঞ রাজার সেবা করে কি হবে এরূপ মন্তব্য করেছিলেন। বিদ্যান ব্যক্তিদের অন্তর্কলহে প্রতি বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় কবি কালিদাসের উক্তির মাধ্যমে। সেখানে তিনি বলেছেন বিদ্বজ্জনেরা রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় জীবন ধারণ করলেও রাজার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝতে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। বিদ্যা অর্জনের প্রতি কটাক্ষ উক্তির মাধ্যমে কবি বল্লালচার্য **স্যাটায়ার** (Satire) ধর্মী হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

*পরবর্তী কালিদাসস্য কলঙ্কনিবারণম্* কথাতেও হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির বর্ণিত গল্পে রাজাভোজ কালিদাসকে গণিকাগৃহে প্রবেশ করতে দেখলেন। তাঁকে (কবি কালিদাসকে) উদ্দেশ্য করে রাজাভোজ বললেন- ওহে কবিরাজ চলনে, বসনে, স্বপ্নে, এবং জাগরণে রাজার মন কবি কালিদাসের থেকে কখনোই বিচ্যুত হয় না। রাজাভোজের নিকট থেকে এই কথা শ্রবণ করে কবি কালিদাসের লজ্জায় মুখ নত করলেন। রাজাভোজ তাঁর মুখ উত্তোলন করে পুনরায় বললেন- তিনি বিলাসকে ধন্য বলে মনে করেন কারণ এই বিলাসের দ্বারা কালিদাসকে পক্ষীর ন্যায় নিবন্ধ করেছেন। রাজাভোজের উক্তির মধ্যে দিয়ে বিদ্বান ব্যাক্তিদের বিলাসপ্রিয়তা,

রূপ ও গুণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তথাকথিত সমাজে গণিকা গৃহের প্রতি বিদ্বান ব্যক্তিদের আসক্তিকে এবং বিদ্বান ব্যাক্তিদের চরিত্রকে বিদ্রূপাত্মক বাক্যবাণে জর্জরিত করে **স্যাটায়ার**রূপ (Satire) হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

*ভোজস্য কাব্যানুরাগঃ কতিপয়কথাঃ* এই গল্পে কৌতুকময় হাস্যরসের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্ষা ঋতুর আগমন ঘটলে ভোজের রাজদরবারে বাসুদেব নামে কবির আগমন ঘটল। রাজাভোজ বাসুদেব কবির প্রতি সন্তুষ্ট হয় তাঁকে লক্ষ মুদ্রা দান করলেন। রাজাকে নিরন্তর দান করতে দেখে মহামন্ত্রী মুখে কিছু বলতে না পেরে রাজাকে সাবধান করার জন্য রাজাভোজের শয়নগৃহে দেওয়ালে স্পষ্ট অক্ষরে লিখলেন যে-

আপদার্থং ধনং রক্ষেত্ ।[২৫]

অর্থাৎ আপদ কালের জন্য ধনের রক্ষা প্রয়োজন। রাজা ও সেই কথার প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় লাইনে লিখলেন শ্রীমতি আপদকালীন আগমন ঘটে না। রাজাভোজের এই উত্তরে মন্ত্রী পরেরদিন দেওয়ালের লিখলেন-

সাং চেদ্গতা লক্ষ্মীঃ? [২৬]

অর্থাৎ লক্ষ্মী চলে গেলে কি হবে? মন্ত্রীর কথার উত্তরে রাজাভোজ দেওয়ালে পুনরায় লিখলেন-

সঞ্চিতার্থ বিনশ্যতি।[২৭]

রাজার এই উক্তি দেখে মন্ত্রী নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাজাভোজ ও মন্ত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পণ্ডিত  বল্লাল সেন সঞ্চিত অর্থের সৎ পাত্রে দানের কথা বলতে চেয়েছেন। নিরন্তর দান করতে দেখে মন্ত্রীর আজকে সাবধান বার্তা প্রদান করেন কবিতার মাধ্যমে সেই সাবধান বার্তা বুঝতে পেরে তিনি তাঁর সঞ্চিত অর্থ সৎ পাত্রে দান

করছেন অর্থাৎ বিদ্বান ব্যাক্তিদের দান করছেন। তাতে তাঁর যশের প্রাপ্তি ঘটবে। রাজাভোজ মন্ত্রীর প্রত্যুত্তরে যে যুক্তি বলেছিলেন সেই উক্তির মধ্যে চাতুর্যপূর্ণ, কৌতুকময় হাস্যরস বিদ্যমান। এই জাতীয় হাস্যরস **উইট** (Wit) হাস্যরসের অনুরূপ।

**উল্লেখপঞ্জি**


১. *পঞ্চতন্ত্র*

২. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা ৩/১০৫

৩. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা ৩/১০৬

৪. *তদেব*

৫. *তদেব*

৬. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা ৫/৪৭

৭. *বেতালপঞ্চবিংশতি*

৮. *তদেব*

৯. *তদেব*

১০. *শুকসপ্ততি*

১১. *তদেব*

১২. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা ৩৯

১৩. *তদেব*

১৪. *হিতোপদেশ, মিত্রলাভ*

১৫. *তদেব*, শ্লোকসংখ্যা-১৯

১৬. *তদেব*

১৭. *তদেব*

১৮ *তদেব, সুহৃদভেদ*

১৯. *তদেব*

২০. *তদেব*

২১. *তদেব*

২২. *ভোজপ্রবন্ধ*, শ্লোকসংখ্যা-৪৭,

২৩. *তদেব*

২৪. *তদেব*

২৫. *তদেব*

২৬. *তদেব*

২৭. *তদেব*

# উপসংহার

আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম - নির্বাচিত সংস্কৃত 'গল্পসাহিত্যে' হাস্যরস : একটি সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ। গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে সামগ্রিকভাবে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় ভূমিকা অংশে  সংস্কৃত সাহিত্যে 'গল্প' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ রূপে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে যেমন- আখ্যান, আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ, কথা, গাথা, কথানক, সংবাদ ইত্যাদি। যদিও সংস্কৃত সাহিত্যের তত্ত্বগ্রন্থে 'গল্প' শব্দটির প্রয়োগ ছিল না। তথাপি 'গল্প' শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্যে পারিভাষিক অর্থে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে এছাড়া আগম গ্রন্থগুলিতে, *বাল্মীকিরামায়ণে, বৈয়াসিকমহাভারতে,* মহাপুরাণে, জাতকে এবং অবদান সাহিত্যে গল্পসাহিত্যের নিদর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এই বৈদিক সাহিত্যের সূত্র ধরে পরবর্তী আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে নীতিমূলক মনোরম গল্পসাহিত্যের উদ্ভব হয়। গল্পগুলি নীতিমূলক হলেও সেই সমস্ত গল্পে হাস্যরসের নিদর্শন পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাস্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের তত্ত্বগ্রন্থে আচার্য ভরতকৃত আটটি রসের মতান্তরে নয়টি রসের ভেদের মধ্যে (শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ইত্যাদি) হাস্যরস উল্লেখযোগ্য। হাস্যরস আটটি রসের মধ্যে অন্যতম হলেও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে হাস্যরসের উপস্থিতি দ্বিতীয় স্থানে। এই প্রসঙ্গে ভাব ও রসের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া হাস্যরসের স্বরূপ, হাস্যরসের স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাব প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। তত্ত্বগ্রন্থে মূলত আশ্রয়ভেদে এবং প্রকৃতি বা পাত্রগতভেদে হাস্যরসকে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মতানুসারে হাস্যরসের ভেদ প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। হাস্যরস সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক কারণ স্বরূপে অসঙ্গগতি, কৌতূহল এবং অনৌচিত্য ইত্যাদি বিষয়েকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যাতে প্রাচ্যের আলঙ্কারিকগণের এবং প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণের মতের মধ্যে সাযুজ্য দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রহসন, ভাণ, বীথীর তেরোটি অঙ্গের মধ্যে প্রপঞ্চ, ছল, বাক্‌কেলি, নালিকা, ব্যাহার ইত্যাদি অঙ্গে, কৌশিকী বৃত্তির চারটি অঙ্গের মধ্যে নর্মে, উৎপ্রাসন নামক নাট্যালঙ্কারে, পতাকা স্থানের মধ্যে হাস্যরসের নিদর্শন সমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা প্রচলিত আছে যেমন- **কমেডি** (Comedy), **হিউমার** (Humour), **উইট** (Wit), **ফান** (Fun), **পুন** (Pun), **স্যাটায়ার** (Satire), **ল্যামপূণ বা প্যারোডি বা বারলেসকিউ** (Lampoon or Parody or Burlesque) ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচ্যের  হাস্যরসের সঙ্গে প্রতীচ্যের হাস্যরসের মধ্যে ভাবগত এবং সাদৃশ্যগত সাযুজ্য হেতু উভয়ের মধ্যে মেলবন্ধন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে গল্পসাহিত্য বিষয়ক আলোচনা হয়েছে। এবং সংস্কৃত তত্ত্বগ্রন্থে গল্পসাহিত্যের স্থান বিবেচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত *শব্দকোষে* এবং ইংরেজি *শব্দকোষে* আখ্যান, আখ্যায়িকা, আখ্যানম্, কথা, কথানকম্ ইত্যাদি শব্দের আভিধানগত অর্থকে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে নীতিমূলক গল্পসাহিত্যকে বিভিন্ন নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং গল্পসাহিত্যের নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও বিশ্বসাহিত্যে সংস্কৃত নীতিমূলক গল্পসাহিত্যের ব্যাপকতা প্রসঙ্গে পর্যালোচিত হয়েছে। এই নীতিমূলক গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের উৎস রূপে প্রাচীন পণ্ডিতগণ বৈদিক সাহিত্যকে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদে এবং *বাল্মীকিরামায়ণে, বৈয়াসিকমহাভারতে,* বৌদ্ধজাতকে, পালিজাতকে হাস্যরসের  নিদর্শন অনুসন্ধান করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের অন্তর্গত নির্বাচিত কয়েকটি গল্পসাহিত্য প্রসঙ্গে

যেমন- *পঞ্চতন্ত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, হিতোপদেশ, পুরুষপরীক্ষা, ভোজপ্রবন্ধ* ইত্যাদি গ্রন্থবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাচিত গল্পসাহিত্য গুলিতে তৎকালীন সময়ের সামাজিক অবস্থা এবং সেই গল্পসাহিত্যে সমাজের প্রভাবকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে নির্বাচিত সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে যেসকল গল্পে হাস্যরস বিদ্যমান রয়েছে সেই বিষয়কে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের তত্ত্বগত দিক দিয়ে আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যে হাস্যরসের বিভিন্ন ধারা সেইসমস্ত নির্বাচিত গল্পগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই বিষয়টি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে আচার্য ভরত এবং তৎপরবর্তী আলঙ্কারিকগণ তত্ত্বগত দিক দিয়ে হাস্যরসকে ব্যাখ্যা করলেও সংস্কৃত সাহিত্যে যে ভাবে হাস্যরসের প্রয়োগ দেখা যায় সেই সমস্ত দিকগুলি সংস্কৃত তত্ত্বগ্রন্থে স্থান পায়নি। সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্য কাব্যের অন্তর্গত প্রহসনের মধ্যে হাস্যরসকে অঙ্গীরস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এবং আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে বহু প্রহসনে হাস্যরসের উপস্থিতি লক্ষণীয়। শুধু তাই নয় দৃশ্যকাব্য ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যধারায় হাস্যরসের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের যে নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলির তুলনামূলক এবং ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেগুলিকে সংস্কৃত সাহিত্যের তত্ত্বগত দিক দিয়ে সেই ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে সেই অনালোচিত বিষয়টিকে অনুসন্ধান করা হয়েছে। গল্পসাহিত্য ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য হাস্যরসের ধারাগুলির প্রতিফলন সম্পর্কে নবীন গবেষকদের নিকট আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও আগামী গবেষকগণ সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে প্রতিফলিত হাস্যরসের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য হাস্যরসের ধারাগুলির একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে পারেন।

# পরিশীলিত গ্রন্থসূচী

## আকর গ্রন্থসমূহ:


*পঞ্চতন্ত্র* (বিষ্ণুশর্মাপ্রণীত), (সম্পা.) এম. আর. কালে, দিল্লী: এম. এল. বি.ডি. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬।

*পঞ্চতন্ত্র* (বিষ্ণুশর্মাপ্রণীত), (সম্পা.) জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬।

*পুরুষপরীক্ষা* (বিদ্যাপতিপ্রণীত), বাংলা ভাষায় অনূদিত, শ্রীরাধা ডে এণ্ড কোম্পানি।

*বেতালপঞ্চবিংশতি* (জম্ভলদত্তকৃত), (সম্পা.) এন. এস. গোরে, পুণে: জে. এস. মোটর প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৫২।

*ভোজপ্রবন্ধ* (শ্রীবল্লালকবিবিরচিত) বিদ্যোতিনী সংস্কৃত ও হিন্দী টীকাসহিত, (সম্পা.) দেবর্ষি সনাঢ্যশাস্ত্রী, বারাণসী: চৌখাম্বা অমরভারতী প্রকাশন, ১৯৭৯।

*শুকসপ্ততি* (চিন্তামণিভট্টবিরচিত), নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১ (প্রথম সংস্করণ) ।

*সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা* (ক্ষেমাঙ্করবিরচিত), (সম্পা.) সনৎ ভট্টাচার্য, কলকাতা: মিতা বুকস্, ২০১৪।

*হিতোপদেশ* (নারায়ণশর্মাবিরচিত), (সম্পা.) সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩ (চতুর্থ সংস্করণ) ।

**প্রাচীন গ্রন্থসমূহ:**

*অগ্নিপুরাণ* (মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন- বেদব্যাসবিরচিত) (সম্পা.) আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

*উপনিষত্-সংগ্রহ*, (সম্পা.) অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, দিল্লী: মোতীলাল বেনারসীদাস, ১৯৭০।

*ঔচিত্যবিচারচর্চা* (ক্ষেমেন্দ্রবিরচিত) (সম্পা.) ব্রজমোহন ঝা, বারাণসী: ১৯৯২ চতুর্থ সংস্করণ।

*জাতকমালা* (আর্যাশূরবিরচিত), হিন্দী অনুবাদ এবং ভূমিকাদি সহিত (সম্পা.) জগদীশচন্দ্র মিশ্র, বারাণসী: বারাণসী সুরভারতী গ্রন্থমালা, ২০১৭।

*নাটকচন্দ্রিকা* (রূপগোস্বামীপ্রণীত), প্রকাশ হিন্দী ব্যাখ্যাসহিত, (সম্পা.) বাবুলাল শুক্লা, বরোদা: চৌখাম্বা সিরিজ অফিস, ১৯৬৪।

*নাটকলক্ষণ-রত্নকোষ* (সাগরনন্দীবিরচিত) (সম্পা.) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৪ (বঙ্গাব্দ)।

*নাট্যদর্পণ* (রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রবিরচিত), হিন্দী ব্যাখ্যা যুক্ত, (সম্পা.) ডা. নগেন্দ্র, দিল্লী: হিন্দী বিভাগ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

*নাট্যশাস্ত্র* (আচার্যভরতমুনিপ্রণীত), (সম্পা.) আর. এস. নাগর, দিল্লী: পরিমল পাবলিকেশন, ২০০৩।

*নাট্যশাস্ত্র* (আচার্যভরতমুনিপ্রণীত), (সম্পা.) এম. আর. কালে, অভিনব গুপ্তের টীকাসহ, বরোদা: গাইকোয়াড় ওরিয়ান্টাল সিরিজ নং৩৬, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ১৯২৬।

*বক্রোক্তিজীবিত* (কুন্তকপ্রণীত) স্বোপজ্ঞবৃত্তিসহিত, (সম্পা.) সুশীলকুমার দে, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): ফার্মা. কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১।

*ব্যক্তিবিবেক* (মহিমভট্টকৃত) (সম্পা.) রমা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৫।

*মহাভারত* (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসবিরচিত), (সম্পা.) শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ, সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৮ শকাব্দ।

*রামায়ণ* (মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত), সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত (সম্পা.) পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): শ্রীনটবর চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৫সাল (চতুর্থ সংস্করণ) ।

*রসগঙ্গাধর* (পণ্ডিতরাজ জগন্নাথকৃত), (সম্পা.) চিন্ময়ী ভট্টাচার্য, কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯২।

*রসগঙ্গাধর* (পণ্ডিতরাজ জগন্নাথকৃত), (সম্পা.) সন্ধ্যা ভাদুড়ী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯৮ (সংশোধিত সংস্করণ) ।

*সাহিত্যদর্পণ* (বিশ্বনাথকবিরাজকৃত), (সম্পা.) হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাসকৃত *কুসুমপ্রতিমা* টীকাযুক্ত, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, ১৯৭৫ (পঞ্চম সংস্করণ) ।

*সাহিত্যদর্পণ* (বিশ্বনাথকবিরাজকৃত), বঙ্গানুবাদ তথা শ্রীরামচন্দ্র তর্কবাগীশ-কৃত টীকাসহ, (সম্পা.) বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।

## ইংরেজি গ্রন্থসমূহঃ


Abrams, A. H. *A Glossary of Literary Terms*, Delhi: Macmillan, 2006, pp-159.

Albert, E. *A History of English Literature*, London: George G. Harrap & CO.PTD, 1923, pp-620.

Apte, V. S. *The practice Sanskrit English Dictionary*, Delhi: Motilal Banarsidas Private Limited, 1965.

Butcher, S. H. *Aristotle's theory of poetry and Fine Arts with a Critical Text and Translations of The Poetics*, London: Macmillan and CO. Limited,1932, pp-224.

Chattopadhyay, R. *20th Century Sanskrit Literature: A Glimpse into Tradition and Innovation*, Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2009.

Chattopadhyay, R. *Modern Sanskrit Dramas of Bengal: 20th Century*, *A. D.,* Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1992.

Cuddon, J. A. *The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory,* London: Penguin Books, 1999.

Dasgupta, S. N & S. K. Dey. *A History Sanskrit Literature classical period* vol. 1, Kolkata: University of Calcutta,1947.

De, S. K. *Aspects of Sanskrit Literature*, Calcutta: Firma KLM Private Limited, 1976, pp-315.

Drever, J. *Psychology of Everyday life*, London: Methuen & CO. PTD, 1945, pp-168.

Gantar, J. *The Pleasure of Fools Essays in the Ethics of Laughter,* London: McGill-Queen's University Press, 2005, pp-185.

Ghosh, M. *The Nāṭyaśāstra*, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1951.

Hariyappa, H. L. *Rigvedic Legends through the ages*, Poona (now Pune), Bombay: University Press, 1953, pp-330.

Hazlitt, W. *Lecture on the English Comic Writers*, New York: Wiley and Putnam, 1845, pp-257.

Henri, B. *Laughter an Essay on the Meaning of the Comic*, Translated by Cloudesley Brereton & Fred Rothwell, London: The Macmillan Company, 1914.

Hudson, W. H. *An Introduction to the study of Literature*, London: George G. Harrap & Company, 1913, pp-471.

Jones, W. *Theory and Practice of Psychology*, London: Macmillan, 1934, pp-308.

Kane, P.V. *History of Sanskrit Poetics*, Delhi: Motilal Banarsidas Private Limited, 1971.

Keith, A. B. *A History of Sanskrit Literature*, London: Oxford University Press, 1920.

Lal, M (Ed.). *The Amara-Kosh of Shri Amara Sinha*, Benares: Master Khelarilal & SONS., 1937.

Leacock, S. *Humour and Humanity an Introduction to the Study of Humour*, London: Thornton Butterworth Ltd, 193, pp-251.

Macdonell, A. *A History of Sanskrit Literature*, Delhi-6: Motilal Banarsidas Private Limited, 1962.

Macdonell, A. *India's Past*, Oxford: At the Clarendon press, 1927, pp-275.

Macdonell, A. & A. B. Keith. *Vedic Index of names and Subjects*, Delhi: Motilal Banarsidas Private Limited,1912.

McDougall, W. *The Energy of Men A study of fundamentals of Dynamic Psychology*, London: Methun & Co. Ltd, 1923, pp-418.

Mason, W. A. *History of the Art of Writing*, California: The Macmillan Company, 1920.

Mishra, K. P. *Aesthetic Philosophy of Abhinavgupta*, Varanasi: Kala Prakashan, 2006.

Monier, W. *A Sanskrit English Dictionary*, Delhi: Motilal Banarsidas, 1899, pp-1378.

Mukherji, R. *Literature Criticism in Ancient India*, Calcutta: Sanskrit Pustak Bhander, 1966, pp-573.

Mukherji, R. *Imagery in Poetry: An Indian Approach*, Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1972, pp-168.

Müller, M. *A History of Ancient Sanskrit Literature*, London: Williams and Norgate, 14 Henrietta Street Covent Garden, 1860.

Nagar, R. S. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni*, Delhi: Parimal Publication, 2009, page-400.

Palmer, D. J. *Comedy Development in Criticism,* United Kingdom: Macmillan Education United Kingdom, 1984.

Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy*, vol. 1, London: The Macmillan Company, 1923, pp-684.

Raychaudhuri, J & I. Habib. *The Cambridge Economic History of India*, Vol. 1, Hyderabad: Orient Longman limited, 1984.

Sastri, G. *A Concise History of Classical Sanskrit Literature*, Calcutta: P. C. Roy at Sri Gouranga Press Private Ltd., 1960.

Sen Gupta, S. C. *Shakespearean Comedy*, London: Geoffrey Cumberlege Oxford University press, 1950.

Sharma, M. M. *The Dhvani Theory in Sanskrit Poetics*, Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office,1968, pp-288.

Shastri, M. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, Varanasi: Banaras Hindu University, 1971, pp-838.

Stott, A. *Comedy the New Critical Idiom*, London: Routledge, 2004, pp-176.

Sully, J. *An Essay on Laughter: it's forms, its causes, its development and its value*, London: Long mass, Green & Co., 1902, pp-432.

Thackeray, W. M. *The English Humourists of the Eighteenth*, London: Smith, Elder & Company, 1853, pp-322.

*TheCarlyleEncyclopaedia* (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Carlyle1)

Tolstoy, L. *What Is Art*, Funk & Wagnalls Company, New York: 1904.

Winternitz, M. *A History of Indian Literature,* Vol. 1, Kolkata: University of Calcutta, 1927

**বাংলা গ্রন্থসমূহ:**


কাঞ্জিলাল, দিলীপকুমার. *সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস,* কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): সংস্কৃতকলেজ, ১৩৭১, পৃষ্ঠা-২৮৬।

কুমারনন্দী, সুধীর. *নন্দনতত্ত্ব,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৯ ডিসেম্বর।

খাস্তগীর, আশিস. *বাংলাগদ্যে নীতিশিক্ষা,* কলকাতা: পুস্তকবিপণি, ২০০৪ নভেম্বর (প্রথম প্রকাশ) ।

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ. *সাহিত্যে ছোটগল্প,* কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৪৬৩, ৭ই শ্রাবণ, পৃষ্ঠা-৪৫৭।

ঘোষ, অজিত কুমার. *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা,* কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৬৮।

চট্টোপাধ্যায়, ঋতা. *আধুনিক সংস্কৃত কাব্য: বাঙালী মনীষা শতবর্ষের আলোকে,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৮।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *হাস্যকৌতুক,* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬১সাল।

দাস, দেবকুমার. *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* কোলকাতা (কলকাতা): ১৪০৪।

বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ. *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৬১৫।

বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র. *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্য,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ), পৃষ্ঠা-২৫৬।

বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র. নারায়ণ ভট্টাচার্য, *সাহিত্যের ভূমিকা*, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য. *কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা*, কলকাতা: গীতা প্রিন্টার্স, ১৪০৭।

ব্যানার্জি, তারাশঙ্কর. *শুকসারীকথা*, কোলকাতা (অধুনা কলকাতা): শশধর প্রকাশনী, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্রনাথ. *হাস্যরসের মালমশলা*, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৮৯।

ভট্টাচার্য, বিমানচন্দ্র. *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*, কলকাতা: বুক ওয়ার্ল্ড, ১৯৫৮ সেপ্টেম্বর (প্রথম প্রকাশ) ।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী. *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৬০।

মজুমদার, মোহিতলাল. *সাহিত্য বিতান*, কলকাতা: শ্যামসুন্দর মাইতি প্রকাশক, ১৩৫৬ বৈশাখ (প্রথম প্রকাশ) ।

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ. *শতাব্দীর শিশুসাহিত্য*, কলকাতা: প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮১৮, পৃষ্ঠা-২৪৮।

মিশ্র, অশোককুমার. *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস*, কলকাতা: বামা পুস্তকালয়, ২০০৫, ১৫ই আগস্ট (প্রথম প্রকাশ), পৃষ্ঠা-১৩২।

মিশ্র, গোপালচন্দ্র. *সংস্কৃত সাহিত্যের সমোলচনা: বিবিধ প্রসঙ্গ*, কোলকাতা (কলকাতা): সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩, পৃষ্ঠা-২৩১।

মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী. *রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে চরিত্র ব্যাখ্যান*, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): পুস্তক বিপণি, ১৩৮৭।

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল. *হাসির গান*, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৩২সাল।

শাস্ত্রী, অশোক নাথ. *রস ও ভাব*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ (প্রথম প্রকাশ)।

শাস্ত্রী, শিবশংকর. বিনয়, সরকার. *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের রূপরেখা*, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): গিরিশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৯৬২ (প্রথম প্রকাশ), পৃষ্ঠা-১৪৪।

সম্রাট, দত্ত. *আখ্যান ব্যাখ্যান ও গদ্য চর্চা*, কলকাতা: অজন্তা প্রিন্টার্স, ২০১৭ (প্রথম প্রকাশ) ।

সম্রাট, দত্ত. *বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা: অজন্তা প্রিন্টার্স, ২০১০।

সেন, সুকুমার. *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৩৪, পৃষ্ঠা-১০৮।

সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র. *হাস্যরসিক পরশুরাম*, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): এ. মুখার্জী এণ্ড কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৬সাল।